
কোরআন ,পৃথিবী এবং বিজ্ঞান
সংঘাত না সমন্বয়...
এফ জেড করিম

কোরআন , পৃথিবী এবং বিজ্ঞান
সংঘাত নাকি সমন্বয়...

এফ জেড করিম

- সকল সংশয় মাথায় নিয়ে নির্মোহ একটি অনুসন্ধান

প্রথম সংস্করণ – *২০১৪ , ফেব্রুয়ারি ১৫*

বইটি সম্পূর্ণ **অ**ভ্রতে টাইপ করা।

যথাস্থানে “তাঁর” বসানোর চেষ্টা করা হয়েছে –

স্বাভাবিকভাবেই ত্রুটি থাকলে ক্ষমাপার্থী।

প্রচ্ছদ: এফ জেড করিম।

মুল্যঃআপাতত নশ্বর পৃথিবীতে নেবো না , আখিরাতে কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেবো।

- এই বইয়ের প্রতিটা লিখা – সম্পূর্ণ কপিরাইট মুক্ত।যে কেউ , এই লিখা কপি করতে পারবে – ব্লগেও দেওয়া যাবে।এতে লেখকের কোন আপত্তি নেই। পারলে –সকলকে জানার সুযোগ করে দিন। কারণ ইসলাম বলে- প্রচার কর যদি একটি আয়াতও হয়।নিজে বোঝার পর , মানুষকেও বোঝান।কারণ , আমরা চাইনা কেউ বিপথে যাক।**এই বইয়ের প্রতিটা লেখাই মৌলিক- ৩৬৯৭২ শব্দ নিজ হাতে লেখা।**

উৎসর্গ -

- **ফারাবী** ভাইকে , যার নাম শুনলে নাস্তিকরা ভয়ে দুইবার ক্যোঁৎ করে ঢোক গিলে...যার নাম শুনিয়ে নাস্তিকরা তাদের বাচ্চা-কাচ্চাদের ঘুম পাড়ায়!যিনি তাঁর অনলাইন কী-বোর্ড সর্বদাই সচল রেখেছেন – নাস্তিকতা নামক বিষবাষ্পকে সরিয়ে দিতে...আমরাও সেই বিষবাষ্প দূর করতে – তাঁর সহযোদ্ধা হতে পেরে গর্বিত।
- আর **ডা: মাহমুদ মাহি** ভাইকে , যিনি সমকামিতার বিরুদ্ধে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন।যার পাশে আমিও থাকতে পেরে গর্বিত।
- **এসএম রায়হান** ভাই , যিনি দীর্ঘদিন ধরে – বিবর্তনবিদ্যা নামক রূপকথার অসারতা তুলে ধরছেন।ইসলামের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে , সেই রূপকথার স্বঘোষিত রাজপুত্রদের ঘুম ভাঙ্গানোর চেষ্টা করছেন।
- সেইসব সংশয়ী কিংবা নাস্তিকদের যাদের এই বই পড়ে আবারও বোধোদয় হবে ...

সূচিপত্র

অধ্যায় ৩

আরও যুক্তি , আরও প্রমাণ

অধ্যায় চার

আরও কিছু প্রমাণ

অধ্যায় পাঁচ

অন্য ধর্মগ্রন্থ কি বলে...

অধ্যায় ছয়

কিছু প্রচলিত প্রশ্নের উত্তর

অধ্যায় ৭

অধ্যায় ৮

অধ্যায় ৯

অধ্যায় ১০

অধ্যায় ১১

অধ্যায় ১২

অধ্যায় ১৩

অধ্যায় ১৪

মুখবন্ধ

কুরআন প্রায় ১৫০০ বছর আগের একটি বই।মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের প্রধান বই।কুরআনে একটা ওপেন চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে – যে নিশ্চয় কুরআন সত্য মিথ্যার ফয়সালা।এই মহা-গ্রন্থে কোন ভুল নেই– দাবী করা হয়েছে।কিন্তু অনেকেই দাবী করছেন – এখানে নাকি পৃথিবীকে সমতল বলা হয়েছে।উনাদের দাবীর সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে আমি বারেবারে কুরআন পড়েছি।এরপর – দেখেছি বলা হয়েছে নাকি – কুরআনের আলোকে পৃথিবী স্ফেরিক্যাল নাকি সমতল।আবার স্থির নাকি ঘূর্ণায়মান।এরপর যা দেখেছি , তা হল – হ্যাঁ সত্যি কথাটাই বলা হয়েছে।ইসলাম-বিদ্বেষীরা ভুল ব্যাখ্যা করে– যে পৃথিবীকে সমতল বানানোর চেষ্টা করছে– তাদের যুক্তি অত্যন্ত ভুল ধারনার উপরে প্রতিষ্ঠিত।আমার পুরো– গবেষণা প্রবন্ধে আমি তাইই বারেবারে দেখিয়েছি।

কুরআনে বলা হয়েছে – সূরা আনকাবুতের , ৪৩ নং আয়াতের -

- এ সকল উদাহরণ আমি মানুষের জন্যে দেই; কিন্তু জ্ঞানীরাই তা বোঝে।

এখানে , আমাদের জ্ঞানের অভাবই আমাদের ভুল পথে চালিত করছে।এই জ্ঞান ক্যালটেকের কিংবা হার্ভার্ডের সবচাইতে সেরা সার্টিফিকেট ধারীর জ্ঞান নয়।আসলে – এখানে জ্ঞানের অভাব বলতে – আমাদের বদ্ধ মানসিকতার পরিচায়কতা এবং ধর্মগ্রন্থ অনুধাবন করার ক্ষমতা না থাকাকে।আমরা কুরআনের কথা বুঝতে চাই না।সোজা চোখে যেটা সত্যি মনে হয়– জ্ঞান লাভের পর অনেক সময়ই মিথ্যা হয়ে যায়।এরকম নিদর্শন আপনি দেখবেন– পাহাড়-পর্বতকে পেরেক , ভূমিকে বিছানা , আবু দারের সূর্যের সিজদা – এইগুলির অর্থ আপনি একমাত্র বুঝতে পারবেন – এ বিষয়ে জ্ঞান লাভের পর নতুবা নয়।

যারা অজ্ঞানতাবশত এরকম করে তাদের সম্পর্কে কুরআনের সূরা আল হজ্জ এর ২২ নং আয়াতে উল্লেখ আছে -

আর মানুষদের মধ্যে এমনও আছে যে কোনো জ্ঞান না রেখেই আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতর্ক করে, আর সে অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানকে, --

এছাড়াও , এই নিবন্ধের মূল কারণ হল –

কুরআনে অসংখ্য অসংখ্য মিরাকল আছে।বিগ ব্যাং থেকে শুরু করে– অনেক কিছু।যখন নাস্তিকরা এইসব মিরাকল দেখে সত্যি প্রমাণিত হয়ে যেতে।তখন তারা তাদের শেষ অস্ত্র হিসেবে বের করে– পৃথিবীকে নাকি সমতল বলা হয়েছে।আমি কয়েকটা বই পড়তে গিয়ে দেখেছি – যখনই বিগ ব্যাং – এইসবের কথা উঠে তখন তারা বলে – আচ্ছা ওইটা বিশ্বাস করবো – কিন্তু কুরআনে নাকি পৃথিবীকে সমতল বলা হয়েছে।এরপর , ইনিয়ে বিনিয়ে কিছু আয়াত হাজির করে– যেগুলোর জবাব ভালো করে বারেবারে দেওয়া হয়েছে।এরপরও , আরও বিস্তারিত জানতে মেইল করতে পারেন- কিংবা ব্লগে আসতে পারেন।দীর্ঘদিন ধরে আস্তিকদের নির্লিপ্ততা এদের শক্ত অবস্থান দিয়েছে।এছাড়া , ধর্মের কথা বলতে গেলেই রাজনীতি টেনে এনে – বারেবারে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে।অনেক ব্লগে দেখবেন – আস্তিকরা গোপনে ব্যানড হয়ে বসে আছে।তবু সত্যি সত্যিই।মিথ্যার মেঘ আড়াল করে সত্য একদিন দেখা দেবেই।কারণ কুরআনেই আছে–

- বলুন: সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।(১৭/৮১)

কুরআনে অসংখ্য চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে– আমিও সেই কুরআন অনুসারে দিতে পারি –

আপনি যদি কুরআনের একটা আয়াতেও দেখাতে পারেন যে ডিরেক্টলি বলা হচ্ছে–

পৃথিবী সমতল – পৃথিবী আর সমতল এই শব্দ দুটি যদি একসাথে একবারও দেখাতে পারেন– তাহলে আমি এই মুহূর্তে নাস্তিক হয়ে যাবো।ইটস অ্যা ওয়ান মিলিওন ডলার চ্যালেঞ্জ।

চিন্তা করুন , ৬৬৬৬ আয়াত যেখানে একবারও বলা হয় নাই– যে পৃথিবী সমতল।

এরপর , আবার ১০ লক্ষ হাদিস- একবারও বলা হয় নাই পৃথিবী সমতল।

আমি খুব ভালো করেই জানি আপনি পারবেন না।বরং বারেবারে , স্ফেরিক্যাল এবং ঘূর্ণায়মানের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।যা নিচেই উল্লেখ করা হল –

কুরআন নিজেই বলছে –

- তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিতনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশে তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলেন: আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এই সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বোধশক্তি সম্পন্নেরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। (৩:৭)

বুঝে নিন - "তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক"।

যেগুলি সম্পর্কে আল্লাহ্ ছাড়া কেউই শতভাগ জানেন না।তবে– একমাত্র জ্ঞানীরাই সেগুলো সম্পর্কে বোঝে।আর কেউ না।বোধ শক্তি সম্পন্নরা ছাড়া আর কেউই বোঝে না।

যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিতনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশে তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর।হ্যাঁ , কথা আসলেই ঠিক।অন্তরের কুটিলতা নিয়ে কুরআন ব্যাখ্যা করতে তারা রূপক আয়াতগুলির অপব্যাখ্যা করতে থাকে।আর জনগণকে সবসময় বিভ্রান্তির মধ্যে রাখতে চায়।কিছু , দুর্বল বিশ্বাসের মানুষ এতে প্রতারিত হয়।তারা যেন , সঠিক পথে ফিরে আসে – সে জন্যেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।কোন ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে– জানানোর অনুরোধ রইল।পরবর্তী এডিশনে ঠিক করে দেয়া হবে।

এফ জেড করিম



২০১৩ , নভেম্বর।

লেখকঃএকজন অতি সাধারণ অপ্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ছাত্র এফ জেড করিম।

ইমেইলঃ fzkarimbd@gmail.com

ফেসবুক: www.facebook.com/fzkarimbd

ব্লগ – www.shodalap.com/fz-karim

২০১৩ , অক্টোবর – ৩১

অপ্রাসঙ্গিক কিছু কথা (এটি বইয়ের কোন বিষয়বস্তু না- ইচ্ছে করলে এভয়েড করতে পারেন।)

- যারা বক্তব্য শোনে এবং তার ভালগুলোর অনুসরণ করে -- এরাই তারা যাদের আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেছেন, আর এরাই স্বয়ং বোধশক্তিসম্পন্ন।(৩৯:১৮)

এখানেও ঠিক একই কথা।কুরআন বলছে– অন্ধ হয়ে যাবেন না।

যে যেই মতবাদ আনবে – তা শুনতে বলা হয়েছে।

এবং অবশেষে বলা হয়েছে– অনুসরণ করতে... যেটা ভালো।

নিম্নে , উত্থাপিত যুক্তিগুলোও আপনাকে ভালোভাবে শুনতে হবে– এরপর , যদি আপনার মনে হয় , হ্যাঁ , এটাই ঠিক।তাহলেই , আপনি সত্যের অনুসরণ করবেন।

- যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে। (১৭:৩৬)

যে বিষয়ে আপনার কিংবা আমার জ্ঞান নেই– সেটা বিশ্বাস করে কখনই ভুল পথে পরিচালিত হতে কুরআন মানা করছে।আমি অনেক নাস্তিককেই জিজ্ঞেস করেছি– আচ্ছা তুমি কি প্রমাণ করতে পারবে – স্রস্টা নেই।উত্তর , পাই না।স্টিফেনের বিষয়ে অগাধ আস্থা দেখে আমি বলি – ও আচ্ছা – আপনাকে হকিং সাহেবের একটা উক্তি বলি –

“ It is all right to make mistakes , nothing is perfect because with perfection we would not exist “

- যেখানে হকিং সাহেব নিজেই বলছেন – ভুল আমি করতেই পারি !! সেখানে আপনি কিভাবে মেনে নেন যে তিনি অভ্রান্ত , পারফেক্ট এন্ড ১০০% রাইট।মহান বিজ্ঞানীরা ভুল করেছেন– এমন দৃষ্টান্ত ভুরিভুরি।মানুষ ভুলের মধ্যেই শিখে।তাঁরাও শিখেছেন।আইনস্টাইন সম্পর্কে একবার একটা নিবন্ধ পড়েছিলাম– যেখানে তিনি ২৩টা ভুল করেছিলেন।এর মধ্যে একবার তিনি বলেছিলেন– মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল হতেই পারেনা।আর মানুষ যখন নিজের জগত দিয়ে স্রস্টাকে ব্যাখ্যা করতে আসে – তখনি বাঁধে বিপত্তি।হকিং সাহেবের অনেকগুলির মধ্যে একটি ভাষ্য মতে– উনি বলছেন যে –মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময় থেকেই তো সময়ের শুরু।এর আগে সময় এবং স্পেস কিছুই ছিল না – তাই স্রস্টাও নেই।তিনি খাঁটি পদার্থবিদ্যা দিয়ে সব বিচার করেছেন– হ্যাঁ , অতি বাস্তব ঘটনা।সময় এবং স্পেস না থাকলে আবার কিছু থাকে কি?কিন্তু , মানুষ যেটাতে ভুল করে সেটা হল– স্রস্টা অর্থাৎ আল্লাহ্ তো সময় এবং স্থানের মধ্যেই থাকেন না – এই দুই জিনিস-তো শুধু তাঁরই সৃষ্টি!তাঁর সৃষ্টিতে তাকে থাকতে হবে কেন? তিনি তো , যাবতীয় বাধা থেকে মুক্ত।

এরকম আরও , ব্যাপার স্যাপার।

আরও একটা মজার ব্যাপার আপনাদের সামনে না এনে পারছি না– আমি যখন প্রবীর ঘোষের “ আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না” - বইটা পড়ছিলাম।তখন , ভালোই লাগছিল।নির্দোষ বিনোদনের মধ্যেও একটা মজা আছে–

যাই হোক – ঐ বইটি , অত্যন্ত বিখ্যাত বই।বিশেষ করে বাংলা নাস্তিক সম্প্রদায়ের কাছে– আপনি যদি ঐ বইটি পড়েন – তাহলে দেখবেন , বাংলা মুক্তমনারা হুবহু কথাটাই লিখে রেখেছে।প্রবীর ঘোষ তাদের কাছে গুরু-গোত্রীয়।বিশ্বাস করুন– বাংলা মুক্তমনারা উনার কথাগুলোর চর্বিত চর্বণ করেছে মাত্রই।আর কিছুই নয়...বিশ্বাস না হলে আপনি– প্রবীর ঘোষের বইগুলো পড়ে দেখেন...

যাই হোক , বইটিতে ১৪৩ পৃষ্ঠায় – প্রবীর ঘোষ যিনি নাস্তিক সম্প্রদায়ের গুরুদের গুরু বলে পরিচিত বলেছেন–

স্টিফেন হকিং বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী হলেও মাঝে-মধ্যে বিজ্ঞানকে সরিয়ে রেখে ঈশ্বরকে কাছে টেনে নেন। দ্বিতীয় বিয়েটাও সেরেছেন চার্চে গিয়ে ঈশ্বর ও ঈশ্বর পুত্রকে সাক্ষী রেখে। তাঁদের আশীর্বাদ প্রার্থণা করে। বাঁচোয়া, হকিংকে বিজ্ঞানীরা ও শিক্ষিত সমাজ শ্রদ্ধা করেন তাঁর বিজ্ঞান চর্চার জন্য, ঈশ্বর ও ধর্ম চর্চার জন্য নয়!

হকিং তাঁর 'এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম' গ্রন্থে লিখেছেন, "ভগবান আমাদের মত প্রাণী সৃষ্টি করবেন বলেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এভাবে করতে বাধ্য হয়েছিলেন।"

না, হকিং বা ঈশ্বর বিশ্বাসী কোনও বিজ্ঞানীর অন্ধ বিশ্বাসই প্রমাণ করে না—ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। শুধু এটুকুই প্রমাণ করে, তাঁরা বিজ্ঞানী হলেও মাঝে-মধ্যে অন্ধ-বিশ্বাসে নতজানু।

“ স্টিফেন হকিং বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী হলেও মাঝে মধ্যে বিজ্ঞানকে সরিয়ে রেখে , ঈশ্বরকে কাছে টেনে নেন।দ্বিতীয় বিয়েটাও সেরেছেন চার্চে গিয়ে ঈশ্বর ও ঈশ্বর পুত্রকে সাক্ষী রেখে। তাঁদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে।বাঁচোয়া , হকিংকে বিজ্ঞানীরা ও শিক্ষিত সমাজ শ্রদ্ধা করেন তাঁর বিজ্ঞান চর্চার জন্যে , ঈশ্বর ও ধর্ম চর্চার জন্যে নয়!

হকিং তাঁর “ এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম” গ্রন্থে লিখেছেন , “ ভগবান আমাদের মত প্রাণী সৃষ্টি করবেন বলেই বিশ্ব সৃষ্টি এভাবেই করতে বাধ্য হয়েছিলেন।“

না , হকিং বা ঈশ্বর বিশ্বাসী কোনও বিজ্ঞানীর অন্ধ বিশ্বাসই প্রমাণ করে না– ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্ব আছে।শুধু এইটুকুই প্রমাণ করে , তাঁরা বিজ্ঞানী হলেও মাঝে মধ্যে অন্ধ বিশ্বাসে নতজানু।“

বন্ধুগণ , বইটি লিখা ১৯৯৫ সালে।হকিং তখনও আস্তিক ছিলেন।তখনও তিনি নোবেল বিজয়ী– বেস্টসেলার বই কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস যেটা কিনা গড়ে সারা পৃথিবীর ৭৩৫ জনের ১ জন পড়েছিলেন।(কিছু নাস্তিক বলে– আমি শুধু ঐ বই পড়ে নাস্তিক!মুখ টিপে হাসা ছাড়া আর কিছুই করতে পারি না।)

তাঁকে আস্তিক বলে নিউক্লিয়ার বোমা মেরে নাস্তিক সম্প্রদায় উড়িয়ে দিচ্ছে।

দুই বিয়ে করার কথা বলে – ব্যক্তি আক্রমণ(মতের মিল না থাকায় – চরিত্র নিয়ে কটু আক্রমণ)।অত্যন্ত কম বোঝেন – বলে বলেছেন – অন্ধ বিশ্বাসী (যাক প্রবীর ঘোষ যে উনার চেয়ে বেশি বুঝতেন সেটা বোঝা গেলো!)।

দেখুন , প্রবীর ঘোষের ধৃষ্টতা।

শুধু হকিং কেন – কোন আস্তিক বিজ্ঞানীকেই উনি দিগম্বর করতে দ্বিধা-বোধ করেননি।নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানীদের যুক্তি বলে , তিনি বারেবারে বুঝিয়ে দিয়েছেন – দ্যাখ ব্যাটা – কোথায় হকিং , পল ডেভিস , ক্যাফাটস , টিপ্লার , স্টিফেন ভাইনবারগ আর কোথায় প্রবীর ! নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীদের চেয়ে তাঁর মনন যে কতটা উচ্চতর তা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

(উপরাংশ লেখার অর্থ হচ্ছে – সমালোচনা করবার অধিকার শুধু প্রবীরদের নয় – আস্তিকদেরও আছে।ক্ষেত্র-বিশেষে – আমাদের নাস্তিক ভাইরা এটা ভুলে যান – এজন্যেই এই অংশ লিখেছি।প্রবীরের সমালোচনা তার উদাহরণ।)

আর , এখন যখন গ্র্যান্ড ডিজাইন লিখে তাঁর মতের পরিবর্তন করে বলছেন– স্রস্টা নেই।অন্তত স্রস্টা ছাড়াই ব্যাখ্যা করা যায়! (খেয়াল করবেন , উনি বলেন - ব্যাখ্যা করা যায় কিন্তু বলেন না- প্রমাণ করা যায়– অবশ্য সে সাহস করা কঠিন – কারণ , এখনও তাঁকে এম তত্ত্ব এর মত অধুনা তত্ত্ব নিয়ে কাজ করা হচ্ছে , এর উপর উনি বিভিন্ন তাত্ত্বিক মডেল দিয়ে– ঐ সিদ্ধান্তে এসেছেন – পুরো ব্যাপারটাই বৈজ্ঞানিক তাত্ত্বিক মডেল!প্রমাণিত মডেল নয়।)

এখন , তিনি নাস্তিক সমাজের মধ্যমণি।তাঁর কথার বিরুদ্ধে কথা বলাই – অবৈজ্ঞানিক মূর্খ মানুষের কাজ।

উনারা মতের সাথে অমিল হলে ছুঁড়ে ফেলেন , মিল হলে গলা জড়িয়ে ধরেন– এখন যেমন , স্টিফেন হকিং কে ধরেছেন।কিন্তু , এর আগেই , চরিত্রহীন লম্পট , বোকাটে অন্ধ বিশ্বাসী বলে গালিও দিয়েছেন।

এর উপর তারা আবার একটা শব্দের জন্ম দিয়েছেন – নাম , ছদ্ম-বিজ্ঞান!!!(অবশ্য ইংরেজিতে সুডো সাইন্স বলে একটা কথা আছে!)

হ্যাঁ , বিরাট ভাষাজ্ঞানী বটে।প্রবীর ঘোষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে – বলেছে বুঝাই যাচ্ছে।তাদের মতের অমিল হলেই – সে ছদ্ম-বিজ্ঞানী।আর কিছুই দেখার দরকার নেই...

আধুনিক যুগে যে শব্দটা বেশি ব্যবহার করা হয় – তা হল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী যিনি খ্রিস্টান থেকে মুসলিম হয়েছেন - মরিস বুকাইলির বিরুদ্ধে।ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ।শুধু এর ছদ্ম বিজ্ঞানী বলেই ক্ষান্ত – কেন ? এই কথাটি আর বলতে যান না – কেন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন।মরিস বুকাইলি কি বলেছেন –

তিনি ফেরাউন নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখলেন – ফেরাউনের মৃতদেহ আশ্চর্য ভাবে সংরক্ষণ হয়ে আছে।যেটা হবার কথাও না – কিন্তু সেই আশ্চর্য বিষয়টা ঘটেছে।কিন্তু , আরও অবিশ্বাসের ব্যাপার তিনি দেখলেন– কুরআন এ সূরা ইউনুস এ ৯২ নং আয়াতে কুরআন চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে বলছে– আল্লাহ্ বলছেন – আমি ফেরাউনের দেহকে আজীবন সংরক্ষণ করে রাখবো – যদিও সে পানিতে ডুবে গিয়েছিলো।

মরিস বুকাইলি এই জিনিস দেখে সাথে সাথে ঈমান এনে ফেললেন।তিনি ভালো করে বুঝবার জন্যে সেই ৫৫ বছর বয়সে আরবি শিখলেন – সব গুলো ধর্ম গ্রন্থ পড়লেন – অবশেষে লিখলেন – কুরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান এবং বাইবেল – নিয়ে বই – যেখানে তিনি সবিস্তারে ঘোষণা দিলেন – যে , কুরআনই সঠিক।

আপনি সারাজীবন মুক্তমনাতে থাকলেও দেখবেন না – এই আয়াতগুলি উল্লেখ করা হচ্ছে – জীবনেও না।

সূরা ইউনুস – ৯০

আর ইসরাইলের বংশধরদের আমরা সমুদ্র পার করালাম, আর ফিরআউন ও তার সৈন্যদল তাদের ধাওয়া করল নির্যাতন ও উৎপীড়নের জন্য! শেষে যখন ডুবে যাওয়া তাকে পাকড়াল সে বললে -- "আমি ঈমান আনছি যে ইসরাইলের বংশধরেরা যাঁর প্রতি বিশ্বাস করে তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, আর আমি হচ্ছি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।''

সূরা ইউনুস ৯১

"আহা, এখন! আর একটু আগেই তুমি তো অবাধ্যতা করছিলে আর তুমি ছিলে অশান্তি সৃষ্টিকারীদের মধ্যেকার।'

সূরা ইউনুস ৯২

তবে আজকের দিনে আমরা উদ্ধার করব তোমার দেহ, যেন তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক। কিন্তু মানুষের মধ্যের অনেকেই আমাদের নিদর্শন সম্বন্ধে অবশ্যই বেখেয়াল।

পৃথিবীর কোন মুক্তমনা কিংবা নাস্তিকও এর জবাব দিতে পারবে না – কিভাবে এই মিরাকল হল।জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।

এ বিষয়ে – মরিস বুকাইলির , " বাইবেল , কুরআন এন্ড সাইন্স" বইয়ের ১৫৭ পেজ(ইংরেজি ভার্শন) এ দেখতে পারেন – বিজ্ঞানীরা একমত হয়েছেন যে – এই মমি – টি পানিতে ডুবে যাবার পর উদ্ধার করে লাশটাকে মমি করা হয়েছিলো।দীর্ঘদিন ধরে – অরক্ষিত অবস্থানে থেকেও – অলৌকিকভাবে মমিটি এখনো আগের মত টিকে আছে।এতোটাই অরক্ষিতভাবে– শত শত বছর ধরে এই মমিটি টিকে আছে – যা কল্পনাতীত।অন্যান্য ক্ষেত্রে – এরকম প্রতিকূল পরিবেশে – মমি কখনই টিকতে পারে না।ব্যাপারটা বর্ণনা – করা হয়েছে – ১৫৭ পৃষ্ঠায়!

হ্যাঁ আগের কোথায় আসি –

কিছুদিন আগে হকিং সাহেব তাঁর মতবাদ পরিবর্তন করেছেন – আবার তিনি যে তাঁর পুরাতন মতবাদে ফিরে যাবেন না – তার গ্যারান্টি কি আপনি দিবেন!! তাহলে তাঁর কোন বই না পড়েই , না বুঝেই নামের গুরুত্ব দিয়ে কেন বিচার করবেন।তাঁর বইগুলো পড়ুন – তারপর পছন্দ হলে মেনে নিন(অনেক নাস্তিক সেটা করলেও , ৮০% নাস্তিককেই দেখেছি শুধু নামের গুরুত্ব দিয়েই তাঁর কথা বিশ্বাস করে ফেলেন- যারা পড়ে মনে করেছেন যৌক্তিক তাঁদের ব্যাপারে আমার কোন আপত্তি নেই।কিন্তু যারা শুনে বিশ্বাস করছেন – তাঁদের মনে রাখতে হবে – এরা প্রবীর ঘোষেরই শিষ্য , মতের অমিল হলে যারা হকিংকে ভুয়া বলতেও সময় নেয় না)।তবে তিনি যে দ্রুতই তাঁর মত পরিবর্তন করেন– সেটাও খেয়াল করবেন।

এককালের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্ক টিপ্লার আপেক্ষিকতা বিষয়ে পড়ান যুক্তরাষ্ট্রে।পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করে ডক্টরেট করবার পরও জ্যোতি-পদার্থবিদ্যা নিয়ে বারক্লে এবং অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করেছেন–

তিনি একটি বিখ্যাত বইও লিখেছেন – “ The Physics of Immortality”

তাতে টিপলার লিখেছেন –

“ বিশ বছর আগেও যখন আমার কেরিয়ার শুরু করেছিলাম জ্যোতি পদার্থবিদ হিসেবে , তখন ছিলাম কট্টর নাস্তিক।তখন স্বপ্নেও ভাবিনি একদিন এমন কোন বই লিখবো যার বিষয়বস্তু হবে ধর্মতত্ত্বের মূল দাবীগুলোর সত্যতা প্রমাণ।“

দেখুন অবস্থাটা!! মত পরিবর্তনের এ কি ধারা – আমার ধারনা হকিংকে যদি আরও তিনশ বছর বাঁচবার ক্ষমতা দেওয়া হয়– তাহলে তিনি তিরিশ বছর অন্তর অন্তর মত বদলাতেন।যেমনটা বদলেছেন– গ্র্যান্ড ডিজাইনে।

তাই বলা হয়েছে – কুরআনে যা করবেন , বুঝে শুনেই করবেন।আর যে বিষয়ে জ্ঞান নেই– সে বিষয়ের ফাঁদে পড়তে নেই।

এমন যখন অবস্থা – তখন , আবার মনে পড়ে গেলো এক বিখ্যাত ইসলামিক স্কলারের একটা যুক্তি–

সেই স্কলার বলছেন – এক নাস্তিককে।আমি এখন আল্লাহ্ র মত অনুযায়ী চলছি , আর তুমি চলছো না!!

আচ্ছা ধরে নিলাম – আল্লাহ্ নেই!!

তাহলে কি হবে – আমিও বেঁচে যাবো , তুমিও বেঁচে যাবে।

আর যদি ধরে নেই – আল্লাহ্‌ আছে।

তাহলে কি হবে – আমি বেঁচে যাবো , কিন্তু , তুমি ধরা খেয়ে যাবে!!

আমি দুইদিক থেকেই সেফ , আর তুমি একদিক থেকে!!

যাক , এটা একটা যুক্তি হতে পারে।তবে নিশ্চয়ই , এর কারণে আমরা– আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করি না।আমরা করি – নিদর্শন দেখে।

বিজ্ঞানী বলতে কেন – এখন শুধুই নাস্তিকের কথা বলে যায়।পৃথিবীতে এখনো হাজার হাজার আস্তিক বিজ্ঞানী রয়েছেন– এদের কথা বলতে তাদের যত কুণ্ঠা।আমি শতভাগ নিশ্চিত– হকিং যদি এখন ফাইন টিউনিং বলে একটা বই লিখে আস্তিক হয়ে যান – তাহলে , প্রবীর ঘোষরা সাথে সাথে আবার লম্পট , অন্ধ বলে তকমা এঁটে দেবে , আগে যেমনটা দিয়েছিলো।

এদের নগ্ন মুখোশ কি আপনাদের সামনে আর খোলা উচিত– নাইবা খুললাম? এ বিষয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা ইচ্ছে আছে – এখন প্রাসঙ্গিকতায় ফিরে যাই।

এছাড়া সেই বইটা পুরোপুরি পড়ে আমি একটা বিরাট জিনিস বুঝতে পেরেছি– তা হল – ধর্ম সম্পর্কে উনার জ্ঞান একটু কমই বললে ভুল হবে বলতে হবে বেশ কম।বিশেষ করে – ইসলাম।উনি তাঁর বইয়ে মাত্র কয়েকটা আয়াত উল্লেখ করছেন।যার মধ্যে অর্ধেকেরই রেফারেন্স ভুল(চ্যালেঞ্জ- দরকার হলে প্রমাণ করে দেবো)।এরপর আবার অনুবাদ নিয়ে সমস্যা।তিনি সুবিধাজনক অংশ কেটে নিয়েছেন– বাকীটুকু উল্লেখ করেননি।তিনি কার অনুবাদ গ্রহণ করেছেন– সেটাও এক মহা-বিস্ময়ের ব্যাপার।মুহিউদ্দিন কিংবা জহুরুল হক - কারোটাই না।(মনে হল– উনি নিজেই অনুবাদক বনে গেছেন)।আমি জানি- তিনি যদি কুরআন একবার পুরোপুরি পড়তেন– তাহলেই উনার ভ্রান্ত ধারনা দূর হয়ে যেত।কিন্তু , তিনি কি তা করবেন ?

পুরো বইটাতে , তিনি এক ধোঁয়া বারবার উড়িয়েছেন– সেটা হল – সাইলেন্স অফ গড।কেন স্রস্টা নীরব??এইটাই তাঁর যুক্তির মূল ভিত।সে সম্পর্কে কুরআন যা বলেছে– সে সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে।

কুরআন বলে –

আর তারা ভেবেছিল যে কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে না, সেজন্য তারা হল অন্ধ আর বধির, এরপর আল্লাহ্ তাদের দিকে ফিরলেন। তারপরেও তাদের অনেকে অন্ধ ও বধির হল।**আর তারা যা করে আল্লাহ্ তার দর্শক**।(৫:৭১)

স্পষ্টই বলা হচ্ছে – এখন তিনি দর্শক ভূমিকায় রয়েছেন। আর এটাই সাইলেন্স অফ গড... প্রবীর সাহেব যেটা বুঝতে বারেবারে ভুল করেছেন।তাঁর সেই এক কথা স্রস্টা কেন – সক্রিয় নয়!!

সৃষ্টির পক্ষে কখনও তাঁর স্রস্টাকে বুঝা সম্ভব নয়।কারণ , স্রস্টার জগত , আর সৃষ্টির জগত দুইটিই ভিন্ন।ভালো করে বুঝতে চাইলে – কল্পনা করুন – আপনি একটা রোবট সৃষ্টি করলেন।রোবটটিকে চিন্তার ক্ষমতা দিলেন।রোবটকে যুক্তির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।এখন আপনি রোবটকে বললেন – বুঝেছো রোবট আমার দেহের ৬০-৭০ শতাংশই পানি দিয়ে তৈরি।রোবট যুক্তির ডানা মেলে ধরে বলবে – ইহা কখনই সম্ভব নয়।সার্কিটের জন্যে পানি ক্ষতিকর।পানি থাকা কখনই জরুরী নয়।

ওহে , রোবট আমার কোন সার্কিট নেই।

রোবট যুক্তি দিয়ে বলবে – ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি ছাড়া কোন কাজই সম্ভব নয়।

ওহে , রোবট আমার কাজ করতে বিদ্যুতের কোন প্রয়োজন নেই।

যুক্তিবাদী রোবট – ঠাকুরমার ঝুলি বুঝিয়া লইলাম।বিদ্যুৎ ছাড়া যে কোন কিছুই সম্ভব না – তা আমার পাশের ডাস্টবিন ক্লিনার রোবটও জানে...

দেখুন , রোবটকে যুক্তি দিয়ে হারানো যাচ্ছে না।কারণ , তার চিন্তার এবং দেখার জগত সীমিত।সে কখনই কল্পনা করতে পারবে না – বিদ্যুৎ ছাড়া কিছু চলে নাকি।এক মনিষীর কথা মনে পড়ে গেলো –

তুমি মূর্খের সাথে তর্ক করো না , কারণ মূর্খ তোমাকে মূর্খের পর্যায়ে নামিয়ে এনে তর্কে হারিয়ে দেবে।

এইখানেও , রোবটকে বুঝানো যাচ্ছে না।

এই পর্যায়ে মানুষ যা করতে পারে তাহলো বিশ্বাসের জন্যে –পর্দার আড়াল থেকে বের হয়ে এসে – সব দেখিয়ে দেওয়া।দেখানো যে , দ্যাখ ব্যাটা – আমাকে দ্যাখ।

আমাদের ক্ষেত্রে এই যুক্তিটা বোঝানো যায় যে - রোবট হচ্ছে মানুষ– এবং মানুষ হচ্ছে আল্লাহ্(যুক্তির খাতিরে)।কিন্তু , রোবট যেমন মানুষকে বুঝতে পারেনা , মানুষও তেমনি স্রস্টাকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে না–

এজন্যেই আল্লাহ্ বলেছেন –

যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে। (১৭:৩৬)

আমাদেরকেও যে বিষয়ে জ্ঞান নেই সে বিষয় থেকে দূরে থাকতে বলা হচ্ছে।স্রস্টাও তেমন একটা বিষয়।শত যুক্তি দিয়েও বোঝা কঠিন।

এখন কথার পিঠে কথা আসতেই পারে–

আচ্ছা , তাহলে মানুষের মত রোবটকে বিশ্বাস করাবার জন্যে কেন স্রস্টা নিজে সব দেখিয়ে দেন না–

এর প্রশ্ন তিনি তাঁর বানী দিয়ে দিয়েছেন–

- সুতরাং মানুষের বেলা -- যখন তার প্রভু তাকে পরীক্ষা করেন(৮৯:১৫)

আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্র-বিন্দু থেকে, এভাবে যে, তাকে পরীক্ষা করব অতঃপর তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টি-শক্তিসম্পন্ন।(৭৬:২)[1]

হ্যাঁ , আমাদের প্রভু আমাদের পরীক্ষা করছেন[2]।তিনি দেখা দিবেন না।যেমনটি হয়– পরীক্ষার হলে ছাত্রকে বই দেখতে দেওয়া হয়না।পরীক্ষা যত কঠিনই হোকনা কেন , বই দেওয়া বা কোন কিছু বলে দেওয়ার কাজ শিক্ষক করেননা।

আল্লাহ্ ও বিশ্বাস অবিশ্বাসের উপকরণ দিয়ে পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন।মানুষকে নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দিয়েছেন।এখন মানুষের ব্যাপার , মানুষ কি সিদ্ধান্ত নিবে।(কিছু মানুষ আছে– যারা এটা প্রশ্ন করতে ভালোবাসে যে – আল্লাহ যদি আমাদের সৃষ্টি করেই থাকে – তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে ? এটা এত্ত বোকাটে একটা প্রশ্ন যে– আপনি হেসে খেলেই উড়িয়ে দিতে পারেন।প্রথমে এটা সিউর হতে হবে যে– আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছে।এরপর – আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে?যুক্তির খাতিরে ধরলাম – বড় আল্লাহ!বড় আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে?উত্তর যুক্তির খাতিরে - আরও বড় আল্লাহ। এরপর ? আরও বড় বড় আল্লাহ ... এভাবে চলতে থাকুক।বাস্তব-ভাবেই– এটা অনন্তকাল চলবে না।একটা সময়

[1] মানুষ যখন গর্ভাবস্থায় থাকে তখন প্রথমে অর্জন করে শ্রবণ শক্তি , আর পরবর্তীতে দৃষ্টি শক্তি। এই মহাসত্যটাই ১৪০০ বছর আগে কুরআন বর্ণনা করেছে।

[2] জহুরুল হকের অনুবাদে " পরীক্ষা " শব্দটি ১৩৫বার , এবং ৪৩ আয়াতে এসেছে।

থামতে বাধ্য হবে।কারণ , শূন্যের আগে কিছু থাকবে না।আপনি উত্তর দিবেন– যেখানে তোমার আরও আরও আরও বড় আল্লাহ থামবে – সেই আল্লাহকেই আমরা বিশ্বাস করি।কারণ , শুরু হতেই হবে এক-জায়গা থেকে।)

তবে , তিনি তাঁর একটা গ্রন্থ পাঠিয়ে দিয়েছেন– নাম কুরআন।এবং মানুষকে কুরআন বুঝার ক্ষমতা দিয়েছেন - এখন মানুষের বিশ্লেষণ করার পালা।যদি এই কুরআন অলৌকিক হয়– তাহলে আল্লাহ্ সত্যও।ভুল হলে – সবই ভুল।

কুরআনে বলা হয়েছে -

- আর তারা ভেবেছিল যে কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে না, সেজন্য তারা হল অন্ধ আর বধির, এরপর আল্লাহ্ তাদের দিকে ফিরলেন। তারপরেও তাদের অনেকে অন্ধ ও বধির হল। আর তারা যা করে আল্লাহ্ তার দর্শক। (৫:৭১)

আর তারা যা করে আল্লাহ্ তার দর্শক। - আল্লাহ্ পরীক্ষার জন্যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন– এবং তাঁর ধর্মগ্রন্থগুলি পাঠিয়েছেন যাতে মানুষ বুঝতে পারে।আর যারা – এখনও এইগুলি অস্বীকার করছে – তাদের জন্যে আল্লাহ্ দর্শক ভূমিকা নিয়েছেন।পরীক্ষা চলুক – খাতা কাটা হবে – হাশরের ময়দানে – এরপর রেজাল্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা।খারাপ করলে শাস্তি – আর যে যত ভালো করবে – সেই সেরা।

আর মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন –

- হে মানুষ, তোমরা আল্লাহর গলগ্রহ। আর আল্লাহ; তিনি অভাব-মুক্ত, প্রশংসিত। (৩৫:১৫)

গলগ্রহ শব্দটার অর্থ নতুন করে বুঝাতে হবে না আশা করি।আমাদের আল্লাহ্‌র কাছে কোন মূল্যই নেই– তিনি আমাদের অনুগ্রহ করে সৃষ্টি করেছেন – তাঁর ইবাদত করবার জন্যে।

এজন্যে তিনি সতর্ককারী অর্থাৎ রসূলদের পাঠিয়েছেন –

- আমি আপনাকে সত্য-ধর্মসহ পাঠিয়েছি সংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে। এমন কোন সম্প্রদায় নেই যাতে সতর্ককারী আসেনি।(৩৫:২৪)

এখানে বলা হচ্ছে – পৃথিবীতে এমন-কোন সম্প্রদায় নেই – যেখানে তিনি রসূলদের পাঠাননি।শুধু কুরআনেই প্রায়– ২৫ ধরমের ২৫ জন নবীর কথাই বলা হয়েছে।আরও বলা হয়েছে– অনেকের কথাতো বলাই হয়নি।

এই হচ্ছে , বিশ্বাসের সারমর্ম।

এছাড়া স্রস্টার অস্তিত্ব নিয়ে অনেক কথাই আছে–

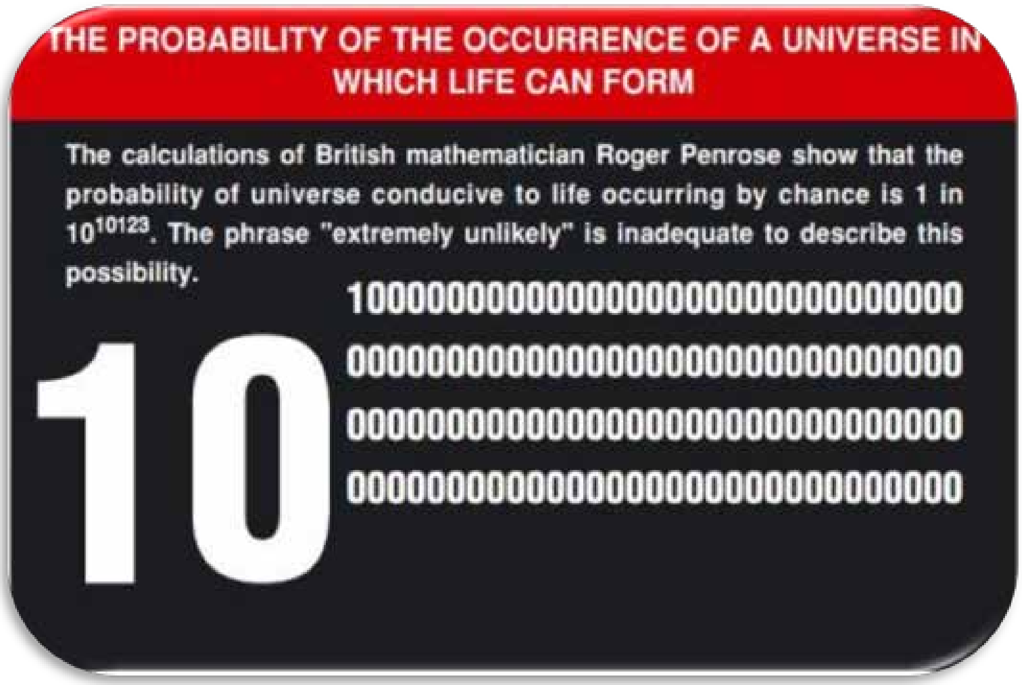
এই অঙ্কটি করেছেন – সেই পেনরোজ , যার নাম কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বইতে প্রায় ১৯ বার এসেছে।জয়েন্ট পেপার জমা দেওয়া থেকে শুরু করে – তাঁর সাথে অনেক কাজের কথা হকিং বর্ণনা করেছেন[3] –

Over the years my principal associates and collaborators were Roger Penrose – ACKNOWLEDGMENTS অধ্যায়ে

সেই তিনিই বললেন – যে স্রস্টার অস্তিত্ব আছে ...

[3] Roger Penrose and I showed that Einstein's general theory of relativity implied that the universe must have a beginning and, possibly, an end.(কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের স্পেস এন্ড টাইম চ্যাপ্টারের শেষ লাইনে)

*The final result was a joint paper by
Penrose and myself in 1970, which at last proved that there must have been a big bang singularity provided
only that general relativity is correct and the universe contains as much matter as we observe – চ্যাপ্টার ৩ এর শেষাংশে
*Over the years my principal associates and collaborators were Roger Penrose (একনলেজমেন্ট – এর শুরুতেই)



প্রাণের বিকাশের উপযোগী হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত(বাহ্যিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই) ভাবে– সুসংহত এই মহাবিশ্বের গঠনের সম্ভাবনা হচ্ছে[4] –

$১০^{১০১২৩}$।অর্থাৎ ১০ এর উপরে দশহাজার ১২৩টি শূন্য।যেখানে , গণিত বিদ্যায়⁻ $১০^{৫০}$ হলেই সেটাকে চূড়ান্তভাবে সম্ভাবনার ভিত্তিতে অসম্ভব বলা হয়। আর সেখানে $^{-১০১২৩}$ টি শূন্য থাকলে – সেটা অসম্ভবের অসম্ভবের অসম্ভব বললেও কিছুই বলা হয় না। অঙ্কের ভিত্তিতে বারেবারে প্রমাণিত হয়েছে– স্রস্টা আছে , কখনই অপ্রমাণিত হয়নি।স্রস্টা নেই বলতে আপনি কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার খুঁজে পাবেন না , পাবেন বৈজ্ঞানিক মতামত।বাস্তবে এমনই।

একবার একজন নাস্তিককে একটা কমেন্টের উত্তরে বলেছিলাম–

- কারণ বর্তমানের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানি স্টিফেন হকিংতো বলেই দিয়েছেন "ঈশ্বর হল ফেয়ারি টেইল"।

আচ্ছা , আপনি কি আধুনিকের সংজ্ঞা জানেন।মানুষের সভ্যতার মূল রেনেসাঁ শুরু হয়েছে – ১৯০০ সাল থেকে। মাত্র , একশবছর হল – ২০০০ সাল।এটাকে আপনি কিভাবে- বলবেন আধুনিক।১৯০০ সালে লন্ডন স্ট্রিটে দাঁড়িয়ে – একজন মানুষও গলা উঁচিয়ে বলেছিলো – হুহ , আমরা এখন আধুনিক যুগে বসবাস করছি।
আপনি , আজ বলছে ২০১৩ সালে এসে , ১৯০০ সালের ঐ ব্যাটা তো বেকডেটেড গাই।এখন , আমরা কতই না আধুনিক।

ঠিক , একইভাবে ২১১৩ সালে , একজন মানুষ কি বলবে , আমরা তো আধুনিক।সেই প্রাচীন কাল – ২০১৩ সালের কথা বলে কি লাভরে ভাই!!!

4
Roger Penrose, The Emperor's New Mind,
অ্যান্ড - Michael Denton, Nature's Destiny,

৩১১৩ সালে কি হবে ??? কাউকে, ২০১৩ সালের কথা বলা হলে -আরে ভাই প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা বলে কি লাভ!!!ওইটা ছিলো , অন্ধকার যুগ।মানুষ সে সময়ে দাস প্রথাকে সামান্য ইম্প্রভাইজড করে ঘরে ঘরে কাজের বুয়া , কাজের মেয়ে রেখেছিলো

এই হচ্ছে আধুনিক যুগ – বিজ্ঞানীরা কোন অভ্রান্ত কিছু নয়।বিজ্ঞানীরা সর্বদা ভুল করেছেন।ভুলের মাধ্যমে , সত্য জেনেছেন।যে বৈজ্ঞানিক , ১০০ বছর পর্যন্ত – সদর্পে চলা ফেরা করেছে , সেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়েছে , পরবর্তীতে।
আপনি ইন্টারনেটে সার্চ দিয়ে দেখতে পারেন – বৈজ্ঞানিকদের ভুলের বাহার।
আপনি জানেন – আইনেস্টাইন বলেছিলেন – মহাবিশ্ব স্থিতিশীল , সম্প্রসারণশীল নয় !!!
কিন্তু , আইনেস্টাইন ভুল ছিলেন।আইনেস্টাইনের ২৩ টা ভুলের কথা উল্লেখ রয়েছে – লিঙ্ক
গালিলিও ১৫০০ সালের দিকে পিসার হেলানো টাওয়ারের উপর থেকে ভারি বস্তু , আর হাল্কা বস্তু ফেলে – সবার সামনে হাতে নাতে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে – ভারি বস্তু আগে পড়ে , আর হাল্কা বস্তু পরে পড়ে!!এই তত্ত্ব শত বছরেও ভুল প্রমাণিত হয়নাই ...!!আপনি যদি – সেই সময়ে থাকতেন , তাহলে কি বলতেন – আরে ভাই দুনিয়ার সেরা বিজ্ঞানী বলেছেন – না মেনে যাই কোথায়...গালিলিয় এর কথার উপরে কথা বলা সম্ভব ছিলো না।কিন্তু , সময় বদলেছে।
নিউটন অঙ্ক কষে বের করে ফেলেছিলেন – ২০৬০ সালে পৃথিবী ধ্বংস হবে!!!– এখন আমি এই ইমোটি ব্যাবহার করছি।কিন্তু , আপনি কি সেই সময়ে আধুনিক সেজে বলতে পারতেন না – বর্তমানের সেরা বিজ্ঞানী বলেছেন , তাই সেটি অভ্রান্ত।

আইনেস্টাইন বলেছিলেন – ব্ল্যাকহোল বলে কিছু নাইরে ভাই।চিন্তা করেন , আপনি কি সেই সময়ের আধুনিক সেজে বলতেন না – মহান বিজ্ঞানী বলেছেন – না ফেলে উপায় নেই!!!
আপনি এইবার বলতে পারেন – তাহলে কি বিজ্ঞান আমি অস্বীকার করবো।অবশ্যই নয় , আমরা শুধু অপ্রমাণিত তত্ত্বকে অস্বীকার করবো।হকিন্সের বই কি আপনি পড়েছেন – উনি কিছু জটিল থিওরি দ্বারা মহাবিশ্বকে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন।স্বাভাবিক বিজ্ঞানী মানুষদের কাজই এটি।সকল থিওরি দ্বারা তিনি একটা সিধান্ত দিলেন – ঈশ্বর রূপকথা।
তিনি কিন্তু , – তিনি বিভিন্ন থিওরি দ্বারা ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন।যদিও অনেকে অনেক আর্গুমেন্ট তুলে ধরেছেন – এর বিপক্ষে – লিঙ্ক ১ লিঙ্ক ২ লিঙ্ক ৩
হ্যাঁ , তিনি খাঁটি পদার্থবিদের দৃষ্টিতে সকল কিছু নিরিখ করতে চেয়েছেন।কিন্তু , স্রস্টা এমনই জিনিস যেটা তাঁর সৃষ্টি কখনই অনুধাবন করতে পারবে না।আপনি , ধরুন কোন কিছু সৃষ্টি করলেন – তারপর কি এটা আপনার সমগোত্রীয় কিছু হবে।কস্মিনকালেও নয়।আপনার সৃষ্টির জগত – আপনার জগতের থেকে ১০০% ভিন্ন।যেমন , হকিন্স বলেছেন – বিগ ব্যাং এর আগে সময়ের অস্তিত্বই ছিলো না , তাই কোন কিছু সৃষ্টির প্রশ্নই আসে না।আমাদের পদার্থবিদ্যা অনুযায়ী ইহা অতীব সত্য কথা।কোন কিছু সৃষ্টি করতে সময় লাগবেই।কিন্তু , স্রস্টার জন্যে কি সত্যি।সময়ের স্রস্টাই তো সৃষ্টিকর্তা।তাহলে – কোন কিছু করতে স্রস্টার সময় লাগবে কেন??আমাদের জগতের পদার্থবিদ্যার আইন-কানুন দিয়ে স্রস্টার জগত কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়????উদাহরণ , হিসেবে বলা যেতে পারে – ধরুন , আপনি রোবটের সৃষ্টিকর্তা।রোবটকে কিছু কৃত্রিম ইন্টিলিজেন্স দিলেন।রোবট চালনা করতে বিদ্যুৎ আবশ্যিক।এখন , রোবটরা গবেষণা করে বলল – বিদ্যুৎ ছাড়া স্রস্টাও চলতে পারেন না।রোবটদের ল কিন্তু , তাই বলে – স্রস্টা বিদ্যুৎ ছাড়া চলতে পারবে না।অন্য কিছু কি রোবট চিন্তা করতে পারবে।রোবট আরো চিন্তা করতে পারে – স্রস্টার পক্ষে কখনই পানিতে চলা সম্ভব না।কারণ , পানি লাগলেই স্রস্টার সার্কিট নষ্ট হয়ে যাবে।আসলে , এইগুলি – চিন্তার সীমাবদ্ধতায় ভুল যুক্তি।মানুষের সর্বকালের সেরা প্রযুক্তিগত আবিষ্কার কম্পিউটারকে নিউম্যান – একটি নির্বোধ যন্ত্র বলতে ভ্রু কুঁচকাননি।
মানুষ , তার জগতের আইন-কানুন দিয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মনে হচ্ছে – স্রস্টা নেই।
এজন্যই , কুরআনে বলা হয়েছে – স্রস্টাকে নিয়ে নয় , সৃষ্টিকে নিয়ে গবেষণা কর।কারণ , স্রস্টাকে বোঝার মত ক্ষমতা আল্লাহ্‌ মানুষকে দেননি।
আপনার সৃষ্ট রোবট , কখনই আপনার জগতের বিন্দুমাত্রও বুঝতে পারবে না।এটা চিন্তার সীমাবদ্ধতা।সকল ক্ষেত্রেই একথা

সত্য।সৃষ্টির পক্ষে , স্রস্টাকে বোঝা রীতিমত অসম্ভব কাজ।
মানব আবিষ্কৃত বিজ্ঞান দিয়ে স্রস্টাকে ব্যাখ্যা করা – আমার কাছে হাস্যকর লাগে।উপরিউক্ত , আমি এজন্যে মোটেই ব্যাখ্যা করি না।

কিন্তু পাশাপাশি তিনি এটাও বলে দিয়েছেন — ভুল আমার হতেই পারে...

Stephen W. Hawking – “It is all right to make mistakes; nothing is perfect because with perfection, we would not exist.””

ভদ্রলোকের সাথে আলোচনা চালিয়ে যেতে মন চাইলেও – ভদ্রলোক সামান্য গালিগালাজ করে পালিয়ে গেলেন!

আচ্ছা বাদ দেই - এখানে আপনাদের একটা গল্প বলি –

একটা গ্রামে ১০০ জন মানুষ বাস করে।এদের মধ্যে দুইজন লোক – এফ জেড এর বিরুদ্ধে বলল – সে একজন চোর।কিন্তু , বাকি ৯৮% মানুষ বিশ্বাস করে সে ভালো মানুষ।

এইবার – আপনাদের কাছে প্রশ্ন – এফ জেড চোর – এটা প্রমাণ করবার দায়িত্ব কার।সেই ২ জনের না , ৯৮ জনের।মানসিক অবস্থা ঠিকঠাক থাকলে – বলবেন সেই ২ জনের ঘাড়েই দায়িত্ব পড়বে যে – প্রমাণ কর এফ জেড চোর।৯৮ জনের ঘাড়ে নয়।

ঠিক সেভাবেই – আল্লাহ নেই , এটা প্রমাণ করার দায়িত্ব নাস্তিকদের ঘাড়ে , আমাদের ঘাড়ে নয়।

কিন্তু , মজার বিষয় কি জানেন – প্রবীর ঘোষ থেকে বারট্রান্ড রাসেল – সবাই বলে – এটা আস্তিকের দায়িত্ব।আসলে – তাদের প্রমাণের সামর্থ্য নেই যে – আল্লাহ নেই।কয়েকজন নামজাদা – নাস্তিকের মতামত দিয়েই এরা ক্ষান্ত।অথবা – কোয়ান্টামের জটিল কিছু তত্ত্ব দিয়ে বলা –যে ঈশ্বর নেই।যদিও কথাটা হবে – ঈশ্বর ছাড়া ব্যাখ্যা করা যায়।আসলে – তারা নিজেরাই সন্দিহান।আপনার সামনে – এরকম কোন নাস্তিক পড়লে – বলটা তাঁর পায়ে পাস করে দিয়ে বলবেন – দে , ব্যাটা প্রমাণ কর – এফ জেড চোর।আমাদের ঠেকা নেই।দেখবেন ৯৯% ক্ষেত্রে – সে ইতোমধ্যেই পগার-পার!

যাই হোক আলোচ্য বিষয় থেকে অনেক দুরে সরে যাচ্ছি – আমাদের আলোচ্য বিষয় হল

- কুরআন এর আলোকে পৃথিবী স্থির নাকি ঘূর্ণায়মান , সমতল নাকি – স্ফেয়রিকাল।আমরা সে বিষয়ে ফিরে যাই – আপাতত , স্রস্টা নিয়ে কথাবার্তা বন্ধ থাক।অন্যকোন সময়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

তাহলে চলুন – পরীক্ষা করি এই কুরআনকে।কি বলে কুরআন – সমতল নাকি স্ফিয়ারিক্যাল আবার স্থির নাকি ঘূর্ণায়মান...

তার আগে এই কথাটা মনে রাখবেন –

উদ্দেশ্য -

সেইসব ভ্রান্ত অপব্যাখ্যা দূর করে – সঠিক ব্যাখ্যা হাজির করা।

“তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিতনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশে তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর।(৩:৭)”

প্রথম অধ্যায়

সপক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন

প্রথম অধ্যায়

সপক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন

অনুচ্ছেদ এক

একটি চ্যালেঞ্জ এবং কিছু কথা

কিছু ব্লগারকে বারেবারে দেখা যায় – কুরআনের দৃষ্টিতে পৃথিবীকে সমতল , এবং স্থির দেখানোর জন্যে নাওয়া খাওয়া ছেড়ে ব্লগে লিখে চলেছেন।কুরআনের অনেকগুলি মিরাকল সম্পর্কে জবাব দিতে না পেরে তারা এখন এই পন্থা ধরেছে যে– আরে ভাই ওইগুলি বাদ দিন – কুরআনে-তো বলা হয়েছে – পৃথিবী সমতল।তাই কুরআন অবৈজ্ঞানিক! খুবই মজার ব্যাপার - এককথা দিয়ে বাকি সব কথা উড়িয়ে দেবার এই পন্থা।কিন্তু , তাদের হালে বিশেষ করে পানি পাওয়া যাচ্ছে না– কোন ভাবেই স্ট্রেইট কাট কথা দিয়ে দেখাতে পারছেন না – যে পৃথিবী সমতল এবং স্থির।সাধারণ কথাকে ইনিয়ে বিনিয়ে বলছেন – যে পৃথিবী সমতল।সেইসব ইনিয়ে বিনিয়ে বলা কথার আসল অর্থ নিয়ে আলোচনা করা হল নিচের অংশগুলিতে।

তারা আবার একটা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বসেছেন – যে একবার কুরআনে দেখান যে – পৃথিবী ঘূর্ণায়মান।পৃথিবী শব্দের অর্থ আরদ এবং ঘূর্ণায়মান হচ্ছে ফালাক।এই দুটি শব্দ উনারা পাশাপাশি দেখতে চান। দেখলেই মেনে নিবেন যে– কুরআন বৈজ্ঞানিক সত্য গ্রন্থ(যাক সমতল আর্গুমেন্ট বাদ দিয়েছেন –কারণ এতে হয়তো তাদের সুবিধা হচ্ছে না!)।এটা আসলে – সাধারণ মুসলিমদের অন্য অভ্রান্ত কুরআনের বৈজ্ঞানিক মিরাকল থেকে দূরে সরিয়ে রাখার অপচেষ্টা।এটা কুরআনে বলা হয়েছে – বারেবারে।এটা আসলে কোন মিরাকলই না – ঐসব মিরাকলের তুলনায়।উনারা ঐসব মিরাকলের ব্যাখ্যা না দিতে পেরে– আপাতত খড়-কুটা ধরে বাঁচার চেষ্টা করছেন।আচ্ছা খড়কুটাও কেড়ে নেয়ার পদক্ষেপ নেয়া যাক।

একজন নাস্তিক সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠলেন আর পত্রিকা খুলে দেখলেন –

“ রহিম সাহেবের বাড়ীর তিনতলা বন্যায় ডুবে গেছে’

এইবার আমাদের বিজ্ঞ নাস্তিক সাহেব কি বলবেন? হ্যাঁ , পত্রিকায় লেখা আছে তিনতলা ডুবে গেছে।

আমি বললাম – ভাই , একতলা কিংবা দুইতলা কি ডুবেছে এই কথা কি পত্রিকায় বলা আছে।

নাস্তিক – না , বলা নাই।

আমি – তাহলে , বিশ্বাস করবো কেন?কারণ , বলা হয় নাই।

নাস্তিক – আরে ভাই।তিনতলা ডুবেছে - বলা মানে-ইতো বাকী দুইতলা ডুবেছে।

আমি – কই , ভাই লেখা নেই তো।পত্রিকায় কোথায় লেখা আছে যে– বাড়ীর দুইতলা এবং একতলা ডুবেছে।পত্রিকায় – আপনি একটা লাইন দেখান যে ওখানে – পাশাপাশি দুইতলা এবং ডুবে যাওয়া বলা হচ্ছে।দুইতলার ইংরেজি হচ্ছে – first floor আর ডুবার ইংরেজি হচ্ছে drown।আপনি যদি পাশাপাশি এই দুই শব্দ দেখাতে পারেন তাহলে – আমি বিশ্বাস করে নেবো!!! শুধু একবার দেখান!!

নাস্তিক – এইটা বুঝে নিতে হবে।স্পষ্ট বলা হয় নাই – তবে এককথা থেকেই বুঝে নিতে হবে।

আমি – তাহলে , আপনি এই আর্গুমেন্ট দেন কেন যে – পাশাপাশি দুই শব্দ বসিয়ে বলতে হবে পৃথিবী ঘূর্ণায়মান!!

নাস্তিক – বুঝছি , তাইলে দেখান যে কোথায় বুঝানো হচ্ছে – পৃথিবী সমতল এবং ঘূর্ণায়মান নয়!!! (মানুষ হিসেবে এতো উদারমনা নাকি জানিনা , তবু আশা করলাম আর কি ? মানুষ হিসেবে ঢাকঢোল পিটিয়ে নিজেকে মুক্তমনা দাবী করাতে সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে !)

আমি – যাক তালগাছ ছেড়েছেন।এইবার দেখতে পারেন।

- কুরআন লেখার সময়কার বিজ্ঞান?

কুরআন যখন লেখা হয় তখন তা ৬০০ খ্রিস্টাব্দের সময়।

এ সময় প্রচলিত ছিল – জিওসেন্ট্রিক থিওরি! – এর অর্থ – পৃথিবী স্থির , আর পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্যসহ বাকীসব ঘুরছে!!!

জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমী (১০০-১৭৮ –এডি) তাঁর এলেমযেস্ট (Alemgest) বইয়ে লিখে দেন – আকাশ তার গম্বুজের বক্রতলে সূর্য তারাদের নিয়ে প্রত্যেক রাতে একবার করে প্রদক্ষিণ করে!!

অর্থাৎ , পৃথিবী স্থির , আর পৃথিবীকেই কেন্দ্র করে এই মহাবিশ্ব প্রদক্ষিণ করছে?????

এই সময়ের মধ্যে বসে মুহাম্মদ সা: এর উপরে কুরআন অবতীর্ণ হয়... সবাই তখনো বিশ্বাস করে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সকল কিছু , আর পৃথিবী স্থির!!!

এরপর , ১৫০০ সালে কোপার্নিকাস তাঁর মতবাদ – হেলিওসেন্ট্রিক তত্ত্ব দেন – যেখানে বলা হয় –

পৃথিবী স্থির নয় , পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান!!তবে , সূর্য স্থির!!

১৫৪৩ সালে তিনি তাঁর বইতে প্রথম লিখেন – on the revolution of the celestial spheres বইতে তিনি লিখেন –

" রাজকীয় সিংহাসনে বসে সূর্য তার সৌর পরিবারের গ্রহদের নিয়ন্ত্রণ করে।"

বলাই বাহুল্য , তিনি সূর্যকে স্থির বলেছিলেন- যদিও তা নয়- আমরা এখন জানি সূর্যেরও কক্ষপথ রয়েছে!!!

দুটো তত্ত্বই ভুল -

আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের বলে – সূর্য ও এবং পৃথিবী উভয়ে নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরছে!!

কুরআন কি বলে -

কুরআন সেটিই বলেছে – জিওসেন্ট্রিক যুগে বসে প্রথমে বলেছে –

পৃথিবী এবং সূর্য উভয়ই ঘূর্ণায়মান!!

সূর্য যে স্থির নয় তা বলা হয়েছে -

সূর্য ও চন্দ্র হিসেব মতো চলেছে।(৫৫:৫)

তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট-কাল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে (৩১:২৯)

আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে অনুগত করলেন। প্রত্যেকে আবর্তন করছে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে (১৩:২)

এখানে ব্যাবহার করা হয়েছে – ফালাক যার অর্থ – A spinning wheel – যার অর্থ ঘূর্ণায়মান।

চিন্তা করুন , কোপার্নিকাস যেখানে ভুল বলেছে – আর সেই ভুল সংশোধন হয়েছে কিছুদিন আগে – সেইখানে বসে কুরআন বলছে – সূর্য নাকি স্থির নয়!!

এইবার আসি সেই চ্যালেঞ্জে যেখানে বলা হচ্ছে – কুরআন অনুযায়ী পৃথিবী নাকি স্থির এবং সমতল , এছাড়াও দাবী করা হচ্ছে – পৃথিবী ঘূর্ণায়মান নয় – বলা হয়েছে –

প্রথম কথা কুরআনের কোন আয়াতই বলে না যে পৃথিবী স্থির কিংবা অঘূর্ণায়মান (১৪০০ বছর ধরে মানুষ পড়েও বের করতে পারেনি) – এ বিষয়ে চ্যালেঞ্জ রাখা যেতে পারে – যে এরকম কিছু বলা হয় নাই।

উল্টো বলা হয়েছে – পৃথিবী গোলাকার এবং ঘূর্ণায়মান(পুরো বইয়ে বিস্তারিত আছে – এখানে কিঞ্চিত সংক্ষেপ-ভাবে বলছি)

রাত ও দিন যে কোন একটা কিছুকেই নির্দেশ করছে – তা একসাথে ব্যবহার করা দেখলেই বোঝা যায়।

আর তিনি তোমাদের জন্য সেবারত করেছেন রাত ও দিনকে, আর সূর্য ও চন্দ্রকে। (১৬:১২)

এছাড়া –

আর তিনি তোমাদের অনুগত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যারা নিয়মানুগত-ভাবে চলমান, আর তিনি তোমাদের অধীন করেছেন রাত ও দিনকে। (১৪:৩৩)

আরও দেখুন:

- **আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে অনুগত করলেন। প্রত্যেকে আবর্তন করছে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে। (১৩:২)**

আরও একটা আয়াত দেখুন–

- **তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে।(২১:৩৩)**

পার্থক্যটা দেখুন– এইবার রাত ও দিন এক্সট্রা যুক্ত হয়েছে– কি কারণ ?? নিশ্চয়ই– রাত এবং দিনের আলাদা গুরুত্ব আছে! কি সেই গুরুত্ব , আসুন দেখি ?

একদম স্পষ্টভাবে –

দেখুন -

- আর তিনিই সেই জন যিনি *রাত ও দিনকে* এবং সূর্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন। সব ক'টি কক্ষপথে ভেসে চলেছে।(২১:৩৩)

- সূর্যের নিজের সাধ্য নেই চন্দ্রকে ধরার, আর *রাতেরও নেই দিনকে* অতিক্রম করার। আর সবক'টিই কক্ষপথে ভাসছে। (৩৬:৪০)

সূর্য চন্দ্র ঘূর্ণায়মান বলার পাশাপাশি রাত্রি এবং দিন কক্ষপথে বিচরণ করার কথা বলেই এখানে পৃথিবীর ঘূর্ণায়মানতার কথা বলা হয়েছে।

আয়াতটি হল –

- তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে।(২১:৩৩)

সবকটিই তার কক্ষপথে ভেসে বেড়াচ্ছে– কোন সবকটিই??রাত ও দিন এবং এর সাথে সূর্য ও চন্দ্র।রাত এবং দিনকে একসাথে বলা হয়েছে , আবার সূর্য ও চন্দ্রকে একসাথে বলা হয়েছে।চাঁদ যে সূর্যের কিরণ নিয়ে আলোকিত– তা পরবর্তীতে উল্লেখ আছে(যদিও বিজ্ঞান এটি কিছুদিন আগে আবিষ্কার করেছে)।এখানে , রাত ও দিনকে পৃথিবী বোঝাতে ব্যাবহার হয়েছে।কারণ , এখানে ফালাক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।রাত ও দিন বোঝাতে যে– পৃথিবীকে বোঝানো হয়েছে তা

ক্লিয়ার হয় – কক্ষপথে ভাসার মধ্যে দিয়ে। রাত ও দিন কি জিনিস?আলো আর অন্ধকার– এই জিনিস তো বৃত্তাকার কক্ষপথে ভাসার প্রশ্নই আসে না।এছাড়া রাত ও দিন– যে সমান নয় তা আমরা জানি।কখনও , রাত বড় আবার কখনও দিন বড়।আর এখানে বলা হচ্ছে– বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘূর্ণায়মানের কথা।যার ফলে , রাত ও দিন সর্বদাই সমান হওয়ার কথা– কিন্তু গুহা-যুগ থেকেই সবাই জানে যে কখন রাত বড় আবার কখনও দিন বড় হয়।তাই সে কথাও , বলার প্রশ্ন আসে না।এখানে , স্পষ্টতই পৃথিবীর কথা বলা হচ্ছে।

<u>আর তিনিই সেই জন যিনি রাত ও দিনকে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন। সব কটি কক্ষপথে ভেসে চলেছে।(২১:৩৩)</u> – সূর্য এবং চন্দ্রের কথা বাদ দিলাম।অর্থাৎ , সিমপ্লিফিকেশন করলে যা দাঁড়ায় তা হল–

আসুন একটু ওয়ার্ড গেম খেলি– ভালো করে বুঝার জন্যে –

- **আর তিনিই সেই জন যিনি রাত ও দিনকে সৃষ্টি করেছেন। সব কটি কক্ষপথে ভেসে চলেছে।(২১:৩৩)**

রাত এবং দিন বোঝাতে নিশ্চয় "টি" শব্দটি ব্যাবহার হয় না।আমাদের বিজ্ঞ নাস্তিকদের– এটা বোঝার ক্ষমতা আছে বলে আমি বিশ্বাস করি!!রাত্রি আর দিন হচ্ছে পৃথিবীর ঘূর্ণায়মানতার সবচেয়ে বড় ইঙ্গিত।এখানে তাইই বলা হয়েছে–

রাত এবং দিন বলার পরেই– পদাশ্রিত নির্দেশক "টি" ব্যাবহার করে এখানে– পৃথিবী সম্পর্কেই বলা হচ্ছে।যার মাথায়– এক গ্রাম পরিমাণ মগজ আছে–সেই এইটা বুঝতে পারবেন যে " সবকটিই" বলতে কি বুঝানো হচ্ছে।রাতটি কিংবা দিনটি বলে কিছু নেই।

আর আপনি রাত এবং দিনের কথা আনলে কি দাঁড়ায়–

- **আর তিনিই সেই জন যিনি রাত ও দিনকে সৃষ্টি করেছেন।রাত ও দিন কক্ষপথে ভেসে চলেছে।(২১:৩৩)**

ঐ আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে– সবকটিই , ইংরেজিতে যাALL।অতএব , আমরা রাত ও দিনকে বাদ দিতে পারি না।

চিন্তা করুন – বলা হয়েছে– "রাত ও দিন কক্ষপথে ভেসে চলেছে।" – <u>রাত ও দিন যে শুধুই আলো , আঁধার।আলো , আঁধার কক্ষপথে বৃত্তাকার-ভাবে ঘুরে বেড়ায়– এটা কোন পাগলও বিশ্বাস করার কথা না।আর এখানে , তা বলাও হয় নি– টায়ার ঘুরছে মানে গাড়ী চলছে , ইঞ্জিন স্টার্ট নিয়েছে বললে যেমন বুঝতে হবে– গাড়ি চলছে – তেমনি রাত ও দিন তার কক্ষপথে ভেসে বেড়াচ্ছে – বললে বুঝে নিতে হবে পৃথিবী তার কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান।</u>

এ ধরনের বর্ণনা আমরা হরহামেশাই দেখতে পাই–

ফরমুলা ওয়ানের ট্র্যাক।রেফারি পতাকা দেখালো।টায়ার গর্জন করে ছুটে চলল।ইঞ্জিন থেকে বিকট শব্দ শুরু হল।

এর অর্থ কি – টায়ার ছুটে চলেছে– গাড়ী তো ছুটে নাই।আরে ভাই, টায়ার ছুটে চলাই তো মানে গাড়ি ছুটে চলা।ইঞ্জিন শব্দ করছে – গাড়িতো না।আরে ভাই , ইঞ্জিনের গর্জন মানে-ইতো গাড়ী গর্জন করছে।

বেনজীর ভুট্টো তার গাড়ীতে করে সমাবেশে যাচ্ছে।হঠাৎ করে একটা গুলি এসে তার বুকে লাগলো।

গুলি হঠাৎ করে এসেছে সত্য , কিন্তু গুলি কে করলো।তার উল্লেখ-তো নেই।বুঝে নিতে হবে– একজন মানুষ করেছে।

এছাড়া , এর আগে আরও যুক্তি দেখিয়েছি– যেমন – তিনতলা ডুবার কথা।

এতোটুকু বুঝে নেয়ার ক্ষমতা আমাদের অবশ্যই থাকা উচিত। স্রস্টা এতোটুকু ক্ষমতা আমাদের দিয়েছেন।

ঐ একই , আয়াতের ইংরেজি অনুবাদ -

Abdullah Yusuf ali অনুবাদ করেছেন –

It is He Who created the Night and the Day, and the sun and the moon: all (the celestial bodies) swim along, each in its rounded course.(21:33)

আচ্ছা এখানে sun and moon কেটে দেই –

It is He Who created the Night and the Day,: all (the celestial bodies) swim along, each in its rounded course.(21:33)

এখানে , দিন এবং রাত বলতে পৃথিবীকেই বুঝাচ্ছে।কারণ , দিন ও রাত যদি বুঝানো চেষ্টা করা হত– তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে যেতো সর্বদাই , দিন এবং রাত সমান।কিন্তু , মানুষ আজীবনই জানে যে রাত আর দিন মোটেই সমান নয়।কেউ যদি , বানিয়ে লিখে তাহলে এই ভুল করতো না। খুব সহজভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে– পৃথিবী তার কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান।

একই ধরনের কথা আবারো কুরআনে বলা হয়েছে–

- সূর্যের নিজের সাধ্য নেই চন্দ্রকে ধরার, আর রাতেরও নেই দিনকে অতিক্রম করার। আর সবক'টিই কক্ষপথে ভাসছে। (৩৬:৪০)

আবারো সেই ইকুয়েশন – সবকটিই ।রাত ও দিন হচ্ছে অনিয়মিত আলো আঁধারের তারতম্য।আর কিছুই নয়। এই আলো আঁধার কিভাবে তার কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান।“রাত ও দিন তার কক্ষপথে ভেসে বেড়াচ্ছে” – ফালাক দিয়ে এখানে বৃত্তাকার পথে ঘূর্ণায়মানতা বুঝানো হচ্ছে।“একাধারে এখানে রাত ও দিনকে – টি নামক পদাশ্রিত নির্দেশক দিয়ে বাঁধা যায় না – এতে , রাতটি এবং দিনটি হয়ে যায়।টি – দিয়ে শব্দকে প্রকাশ করতে হলে পৃথিবী হবে।অল – শব্দটার ক্ষেত্রেও এমনটা।নির্দিষ্ট করে

দেওয়া হচ্ছে – অথচ রাত দিন কিছুই নয় শুধু মাত্র আলো আঁধার ছাড়া।এর চেয়েও বড় কথা– রাত ও দিনের ঘূর্ণায়মান কক্ষপথে চলার প্রশ্নই আসে না – এটা শুধুই আলো – এবং আঁধার।আলো এবং আঁধার একটা কক্ষপথে ঘুরছে– এমন কিছু কখনো কল্পনায়ও সম্ভব নয়।এর চেয়েও বড় কথা – রাত ও দিনকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরার প্রশ্নই আসে না।এছাড়া বলা হচ্ছে – রাতের ক্ষমতা নেই দিনকে ধরার – আর দিনেরও ক্ষমতা নেই রাতকে ধরার।এখানে যে পৃথিবীকেই বুঝানো হচ্ছে– তার প্রমাণ হল রাত এবং দিন কখনই একইরকম হয় না।গুহাবাসী মানুষও সবসময়েই জানে এককেসময়ে রাত বড় হয় , অন্য সময়ে দিন বড় হয়।শীতকালে যেমন রাত বড়।এ কথাটাই প্রমাণ যে– পৃথিবী যে তার কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান।যদি – এই ধরনের কথা বলা হত – তাহলে এমন হত যে ২৪ ঘণ্টার অর্ধেক দিন , অর্ধেক রাত।কিন্তু , এমনটা নয়– মানুষ প্রাচীন কাল থেকেই দেখে আসছেন – কখনো , রাত অনেক বড় , আবার কখনও দিন অনেক বড়।মুহাম্মদ সা: যদি এমনটাই বলতে চাইতেন – তাহলে এমনটা বলতেন না।সবদিক দিয়ে স্পষ্টই বলা যায় যে এখানে– পৃথিবীকেই বোঝানো হচ্ছে।

এছাড়া কুরআনে বলা হয়েছে –

- তোমরা কি ভেবে দেখ নি আল্লাহ্ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন সাধু কথাকে উৎকৃষ্ট গাছের সঙ্গে, যার শিকড় হচ্ছে মজবুত ও যার ডালপালা আকাশে,(১৪:২৪)

কুরআনে স্পষ্টই বলা হচ্ছে – তোমরা কি ভেবে দেখো নি – কিভাবে আল্লাহ্ উপমা দেন।

রাত ও দিন যে এরকমই একটা উপমা যা পৃথিবীকে বুঝাচ্ছে তা আর বুঝতে কষ্ট হয় কি।

আশা করি , ব্যাপারটি ক্লিয়ার করতে পেরেছি।আপনিও আপনার জবাব পেয়েছেন– যদি শুদ্ধ মন নিয়ে চিন্তার ক্ষমতা থাকে – তাহলে অবশ্যই আপনার চ্যালেঞ্জের উত্তর পেয়ে যাবেন।আশা করবো , আপনিও সত্যের পথে আসবেন।যেমনটা এসেছে – এর আগের অনেক ঘোরতর ইসলাম-বিদ্বেষীরাও।তাই -

RIP – রিটার্ন ইফ পসিবল – Return If Possible

আর একটা চ্যালেঞ্জ নাস্তিক ভায়েরা নিতে পারেন – যেখানে বলা হচ্ছে –

আপনি যদি কুরআনের একটা আয়াতেও দেখাতে পারেন যে ডিরেক্টলি বলা হচ্ছে–

পৃথিবী সমতল – পৃথিবী আর সমতল এই শব্দ দুটি যদি একসাথে একবারও দেখাতে পারেন– তাহলে আমি এই মুহূর্তে নাস্তিক হয়ে যাবো।ইটস অ্যা ওয়ান মিলিওন ডলার চ্যালেঞ্জ।

চিন্তা করুন , ৬৬৬৬ আয়াত যেখানে একবারও বলা হয় নাই – যে পৃথিবী সমতল।

এরপর , আবার ১০ লক্ষ হাদিস- একবারও বলা হয় নাই পৃথিবী সমতল।

আমি খুব ভালো করেই জানি আপনি পারবেন না।বরং বারেবারে , স্ফেরিক্যাল এবং ঘূর্ণায়মানের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।যা নিচেই উল্লেখ করা হল –

নাস্তিকদের পিতৃ-ধর্মের মত (নাস্তিকদের পুরাতন ধর্ম কোনটি দেখলে দেখবেন– সিংহভাগই হিন্দু) –

- "The sky is immovable, the Earth is immovable and these mountains are also immovable" [RIK VEDA 10-173-4]

আকাশ , পৃথিবী , পাহাড় সবই নিশ্চল – এই ধরনের একটা আয়াত দেখিয়ে দিন – আমি সাথে সাথে অবিশ্বাসী হয়ে যাবো।কিন্তু , আমি খুব ভালো করেই জানি – এই ধরনের কিছু কুরআনে নেই।

যখন আপনি নাস্তিকদের সাথে বিতর্ক করতে যাবেন – তখন –

পয়েন্ট ১ – রাত ও দিন মানে শুধুই আলো, আঁধার – এখানে আপনার কি বিশ্বাস হয় – কেউ বলবে, আলো আঁধার তার বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরছে!

পয়েন্ট ২ - রাত ও দিন কি সমান! মোটেও না।তাহলে বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরবার প্রশ্নই আসে না। (অথচ উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সমান হবার কথা)

পয়েন্ট ৩ – দিন দৌড়ে রাতের পিছনে আসে , রাত দৌড়ে দিনের পিছনে আসে যেটা বলা হয়েছে -তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে রাতের পিছনে আসে (সূরা আরাফ - ৫৪)

।প্রথম কথা – দিন এবং রাত শুধুই আলো আঁধারের খেলা – এখানে আলো , আঁধার দৌড়াদৌড়ি করে সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

পয়েন্ট ৪ – রাত দৌড়ে দিনের পিছনে চলে আসে – তার মানে রাতের সাথে সাথেই দিন।কেন এমনটা বলা হল – যেখানে ১২ ঘণ্টার মত বিশাল ব্যবধান!!!!!!এছাড়া , সকাল কিংবা রাত যেই ভাবে আমরা দেখি– সেটা মোটেও তাড়াতাড়ি নয়!

পয়েন্ট ৫ – প্রথমত কিছু আয়াতে দেখা যায় – রাত ও দিনের কথা উল্লেখ নেই – আবার কিছু আয়াতে দেখা যায় – উল্লেখ আছে ? তার মানে কি এইটা প্রমাণ হয় না – রাত ও দিনের আলাদা গুরুত্ব আছে ?

পয়েন্ট ৫ - কেন আপনি রাত ও দিনের এই কথাকে – পৃথিবী হিসেবে মেনে নিতে পারছেন না ।

অধ্যায় ২

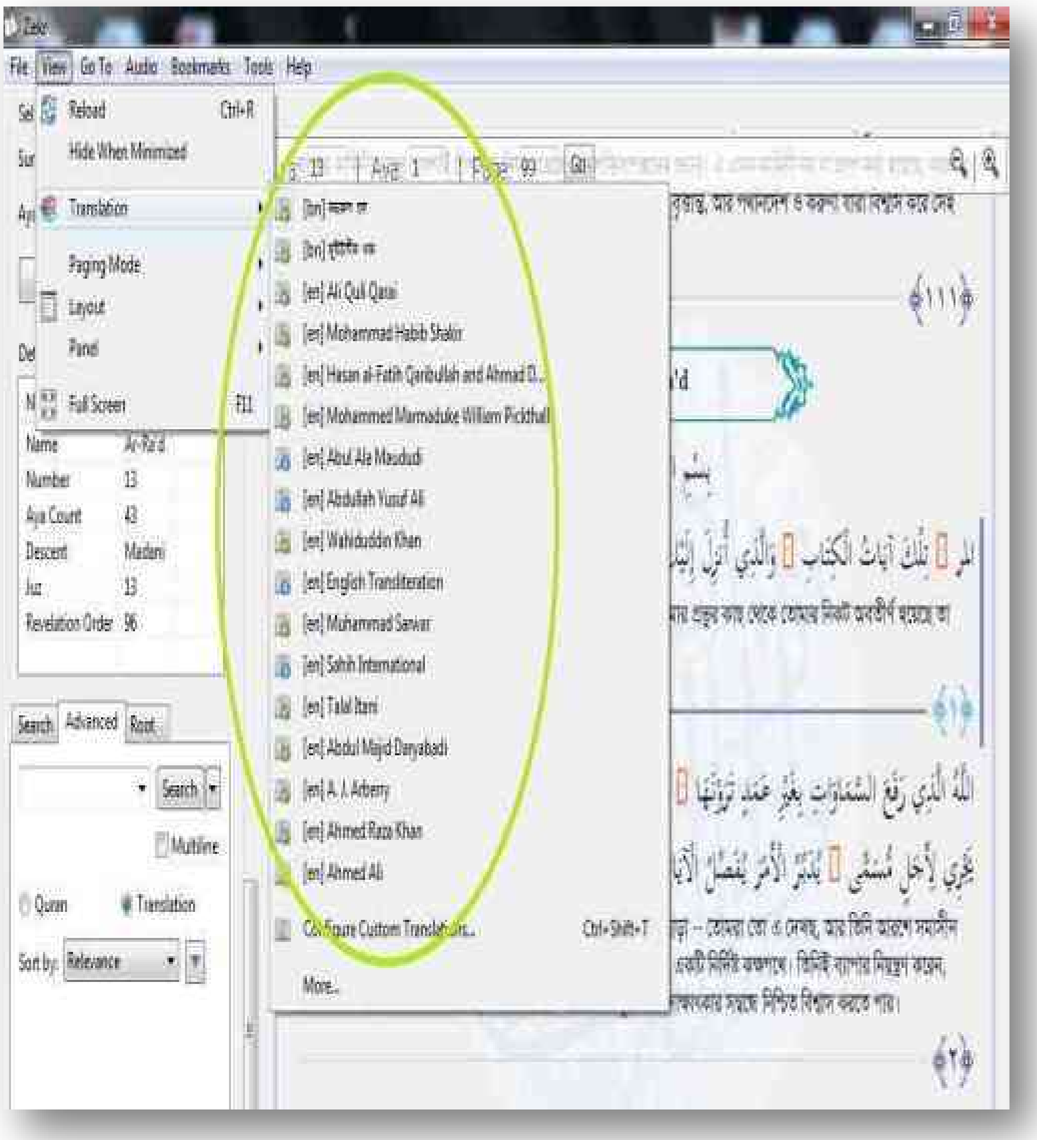
অনুচ্ছেদ ১

অনুবাদ

- এই ইবুকটি লিখতে গিয়ে সর্বমোট ১৭টি অনুবাদের সহায়তা গ্রহণ করেছি।বাংলায় দুটি এবং ইংরেজিতে ১৫টি।প্রায় যতগুলো অনুবাদ হাতের কাছে পেয়েছি– সবগুলোই ব্যবহার করা হয়েছে।এই কাজে বিশেষ করে “যিকর” সফটওয়্যারটি সহায়তা করেছে।নিচে ১৭টি অনুবাদের নাম দেওয়া হল–

- ১) জহুরুল হক
- ২) মুহিউদ্দিন খান
- ৩) Abdullah Yusuf Ali
- ৪) Sahih International
- ৫) A.J Arberry
- ৬) Hasan al-Fatih Qaribullah and Ahmar Darwish
- ৭) Talal Itani
- ৮) Muhammad Sarwar
- ৯) Wahiduddin Khan
- ১০) Muhammad Sarwar
- ১১) Abdul Majid Daryabadi
- ১২) Mohammad habib shakir
- ১৩) William Pickthall
- ১৪) Ali Quli Qarai
- ১৫) Ahmed Ali
- ১৬)Abul ala Maududi
- ১৭)Ahmed Raza Khan

এর মধ্যে প্রথম দশটি সবচেয়ে বেশিবার ব্যবহার করা হয়েছে।তবে , অন্যগুলোও বারেবারে ব্যবহার হয়েছে।



অনুচ্ছেদ ২

আল-কুরআন কি বিজ্ঞান গ্রন্থ?

Al-Quran is not a book of S-C-I-E-N-C-E , it is a book of S-I-G-N.

না , এটি শুধু বিজ্ঞান নয় সর্ব-বিষয়ের গ্রন্থ।এগুলো বিজ্ঞান নয় – নিদর্শন।বিজ্ঞান মানে বিশেষ জ্ঞান।এই জ্ঞান পরিবর্তন , পরিমার্জন হয়ে একটা সত্য সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়।কুরআন সেই সত্য সিদ্ধান্তগুলোই তুলে ধরেছে– আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে।কিছু রূপক ভাবে , কিছু স্পষ্টভাবে।নাস্তিকরা মাঝে মাঝে একটা প্রশ্ন করে– সবই যদি কুরআনে আগে থেকে লেখা থাকে , তাহলে এখন আবিষ্কারের অর্থটা কি?আগের থেকে বের করা যেতো না।

আমি বলি – আচ্ছা , ভাই ধরুন আপনার অঙ্ক বইয়ে কয়েক-হাজার সমস্যা আছে।কিন্তু , উত্তর নেই।আপনি সমাধান করার চেষ্টা করছেন – কিন্তু পারছেন না।

এমন সময় যদি – আপনাকে মাত্র কয়েক-পৃষ্ঠার উত্তরপত্র হাতে দিয়ে দেয়া হয়– তাহলে কি আপনি সেই কয়েক পৃষ্ঠা থেকে অঙ্কটা বুঝতে পারবেন।কখনই নয় – অঙ্কটা আগে করতে হবে।

আল – কুরআনও সেরকম।এটি একটি উত্তরপত্র।আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা অঙ্ক কষে বের করা অঙ্কগুলির উত্তরগুলি সঠিক হলে – সেই উত্তরপত্র কুরআনে তা ঠিকই মিল পাওয়া যায়।

আয়াত – শব্দের অর্থ চিহ্ন কিংবা নিদর্শন।

Al-Quran is not a book of S-C-I-E-N-C-E, it is a book of S-I-G-N

কুরআনেই এ সম্পর্কে বলা হয়েছে -

এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনা-বলী প্রদর্শন করাব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ কোরআন সত্য। আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্য-দাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়?

(সূরা ফুসিলাত- ৫৩)

আমাদের নিদর্শনগুলি দেখেই বুঝতে হবে – কুরআন সত্য নাকি মিথ্যা।আর নিদর্শনগুলি বের করার জন্যে কুরআনে রয়েছে –

নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদের্শনাবলী রয়েছে। (সূরা আল হিজর – ৭৫)

এছাড়াও – কুরআনে রয়েছে –

"যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে..."

আল্লাহ্ তার সৃষ্টিকে গবেষণা করার আদেশ দিয়েছেন , যাতে তার নিদর্শনগুলি বুঝতে পারি।

আর কুরআনের প্রথম আয়াতই তো –

তুমি পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, (সূরা আলাক – ১)

অনুচ্ছেদ ৩

..........ভাবো , ভাবো এবং ভাবো ....

সূরা আশ-শামস এর ১ - ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

ভাবো সূর্যের আর তার সকাল বেলাকার কিরণের কথা, আর চন্দ্রের কথা যখন সে তার কিরণ ধার করে,

এরকম আরও অনেক নিদর্শন বের করে বলা হয়েছে– ভাবো আর ভাবো ... এর কিছু পরেই আছে ... ৫-৬ আয়াতে-

ভাবো মহাকাশের কথা ও যিনি তাকে বানিয়েছেন, আর পৃথিবীর কথা ও যিনি তাকে প্রসারিত করেছেন,

আল্লাহ যদি সব বলেই দিতেন , তাহলে ভাবার কথা আসছে কেন??

আসলে , মাত্র কয়েক হাজার আয়াত দিয়ে – সংক্ষেপে ইঙ্গিত দিয়ে দেওয়া হয়েছে – এবং শেষে বলা হয়েছে – ভাবো এবং ভাবো ... ভাবতে ভাবতেই তোমার উত্তর পেয়ে যাবে।এর অর্থ , কুরআনে শুধু নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে– আমাদেরকে শুধু উত্তরটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে – অঙ্কটা নয় –

এ সম্পর্কে কুরআনে আছে –

এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনা-বলী প্রদর্শন করাব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ কোরআন সত্য। আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্য-দাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়?

(সূরা ফুসিলাত- ৫৩)

আল্লাহ শুধু আমাদেরকে নিদর্শনা-বলী গুলি দেখাবেন – আর ভাবা অর্থাৎ গবেষণা করবার মাধ্যমেই সত্যটা আমাদের কাছে ধরা দেবে...

অধ্যায় ৩

আরও যুক্তি , আরও প্রমাণ

কুরআনের আলোকে পৃথিবী সমতল নয় , বরং – গোলাকার এবং ঘূর্ণায়মান

অধ্যায় দুই

প্রমাণ ১

যখন সমতল হবে , মানেই এখন সমতল নয়

কুরআন সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগের পাঠানো আল্লাহর একটি বই।সে সময়টা এমন ছিলো, যখন আরবরা মনে করতো - চাঁদ হচ্ছে রাতের সূর্য।পৃথিবী স্থির এবং সমতল।আরবরা বেশিদূর ভ্রমণ করতো না - পাছে যদি পড়ে যায় পৃথিবী থেকে।মানুষ মনে করতো , পাহাড় হচ্ছে – আকাশের খুঁটি।চাঁদ , সূর্য – পাহাড়ের আড়ালে যায় , আবার দিন হলে পাহাড়ের আড়াল থেকে বের হয়ে যায়।

কিন্তু , এই সময়ে মিরাকল অফ মিরাকল কুরআন নাজিল হয়।কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে– এটি আল্লাহর বানী নয়।তাদের সন্দেহ দূর করার জন্যেই এই লেখা – অনেক অনেক মিরাকলের একটি মিরাকল – এখানে তুলে ধরা হল - কুরআনের আলোকে পৃথিবী সমতল নয় , বরং– গোলাকার[5] এবং ঘূর্ণায়মান ...

১- আর যখন পৃথিবীকে সমতল করা হবে – ৮৪:৩

উপরিউক্ত আয়াতে মহাপ্রলয়ের সময়কার কথা বলা হচ্ছে।বলা হচ্ছে– মহা প্রলয়ের সময় পৃথিবীকে সমতল করা হবে।

যদি , কুরআনে বলাই হত – পৃথিবী সমতল , তাহলে কেন বলা হল – মহাপ্রলয়ের দিন পৃথিবী সমতল করা হবে।অন্য কথাতে তো স্পষ্ট বুঝা যায় যে – এখন পৃথিবী সমতল নয়।

অবশ্যই , এখান থেকে বলা যায় কুরআনের দৃষ্টিতে পৃথিবী সমতল নয়।যদি সমতলই হত তাহলে– বলা হত না – সমতল করা হবে।অন্য কথায় এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, বর্তমানে পৃথিবী সমতল অবস্থায় নেই।

এছাড়াও যুক্তির বিচার থেকে দেখুন – করিম কাল থেকে ভালো হয়ে যাবে।

এর অর্থ কি দাঁড়ায় - তার মানে করিম এখন ভালো নয়।

5

(পুরো বইয়ে গোলাকার শব্দটি ব্যাবহার করা হল – তবে আসল শব্দ হবে স্ফেরিকাল , পুরো গোলাকার নয় দুই পাশে একটু চাপা।)

আর একটি কথা – প্রচলিতভাবে আমরা স্ফেরিক্যাল শব্দটা পুরো বইতে ব্যবহার করেছি – কিন্তু , শব্দটির বাস্তবিক উচ্চারণ হবে – স্ফিয়ারিক্যাল।যেহেতু , নাস্তিকদের মত , আমাদের এক্সট্রা রেফারেন্স দিয়ে , অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করে – মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজন পড়ে না , সেহেতু আমরা চেষ্টাও করি না।এছাড়াও SEO সঠিকভাবে হওয়ার জন্যে এমনটি করা হয়েছে।কুরআনই তাদের আকর্ষণ করছে – ভয়ানকভাবে।

ঠিক এখানেও এমনটি হয়েছে – যে কুরআন বলছে পৃথিবী সমতল নয়।

অন্য অনুবাদ: And when the earth is flattened out – Yusuf Ali / when the earth flattens out – Wahiduddin khan – কেউ কেউ বলেছেন – সম্প্রসারিত আবার কেউ কেউ সমতল।দুটোই সঠিক।এছাড়া একি বিষয় বলা হয়েছে অন্যান্য অনেক আয়াতে।(এক্ষেত্রে যদি মসৃণ সমতলের কথা বলা হত – তাহলে বলা হত উপরি-অংশের কথা —কিন্তু কুরআন বলছে –

আর যখন পৃথিবীকে সমতল করা হবে, আর তার ভেতরে যা-কিছু রয়েছে তা নিক্ষেপ করবে এবং শূন্যগর্ভ হবে, (৮৪-/৩-৪)—

এখানে মসৃণ সমতল নয় – একেবারে অরিজিন সমতল। মসৃণ সমতল হলে – উপরি-অংশের কথা বলা হত – কিন্তু পুরো সূরাতে পৃথিবীর উপরি-অংশের কথাই বলা হয়নি।)

এই সমতল যে একদমই নতুন করে হবে – অর্থাৎ , কেউ যদি বলে আগে সমতল ছিলও – এখন আর সমতল করা হবে – যদিও তার কোন ইঙ্গিত নেই , আয়াতে উল্টো বলা হচ্ছে– সেদিন পৃথিবীকে পারফেক্ট সমতল করা হবে এবং সরটা হবে– সম্পূর্ণ নতুন একটা আকৃতি।যেটা সমতল।

কুরআন বলছে -

সেইদিন এ পৃথিবী বদলে হবে অন্য পৃথিবী, আর মহাকাশমন্ডলীও, আর তারা হাজির হবে আল্লাহ্‌র সামনে, যিনি একক, সর্বশক্তিমান।(১৪:৪৮)

তার মানে , ঐ পৃথিবীকে স্পষ্টই সমতল বলা হয়েছে – তাহলে – আমাদের এই পৃথিবী বর্তমান-ভাবে বাধ্যতামূলকভাবে সমতল নয়।অন্য কিছু – সেই অন্য কিছুটাই দেখবো – একের পর এক...

নোট – গোলাকার নয় – স্ফেরিক্যাল হচ্ছে আসল কথা।কারণ , উপর আর নিচের দিকে কিছু অংশ চাপা পৃথিবীর ক্ষেত্রে– এজন্যে গোলাকার শব্দটি পারফেক্ট নয়।তবু , বুঝার সুবিধার্থে পুরো বইতে গোলাকার লেখা হল।

প্রমাণ ২

দুই উদয়াচল , দুই অস্তাচল – মানুষ কি দেখেছে!

২ –

সূরা আর রাহমান – ১৭ নং আয়াত কে মুহিউদ্দিন অনুবাদ করেছেন

- **তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক।**

আর জহুরুল হক অনুবাদ করেছেন –

- **তিনি দুই পূর্বের প্রভু আর দুই পশ্চিমেরও প্রভু।**

দুটোই একি কথা প্রকাশ করছে -

কুরআনে যদি পৃথিবীকে সমতলই বলা হত – তাহলে দুইবার পূর্ব আর দুইবার পশ্চিমের কথা বলা হবে কেন।পৃথিবী যদি সমতলই হত তাহলে – একবার সূর্য উঠতো- একবার ডুবতো।আসলে , পৃথিবী গোলাকার হওয়ায় এমনটা হয় না– আপনি যখন দেখেছেন – সূর্য ডুবছে , তখন আসলে , অন্য অবস্থানে সূর্য উঠছে।আর যেখানে দেখছেন সূর্য উঠছে– অন্য অবস্থানে সূর্য ডুবছে।পৃথিবী গোলাকার এবং ঘূর্ণায়মান দেখেই এমনটা হয় নতুবা নয়।এজন্যেই বলা হয়েছে এমনটি।

- আল্লাহ দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান। এতে অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্নগণের জন্যে চিন্তার উপকরণ রয়েছে।(24:44)

একই কথা আছে কুরআনে সূরা মায়ারিজে –

- আমি উদয়াচলের ও অস্তাচলের প্রভুর নামে শপথ করছি (৭০:৪০)

উদয়াচল নয় – ব্যবহৃত হয়েছে – উদয়াচলের

অস্তাচল নয় – ব্যবহার হয়েছে – অস্তাচলের।

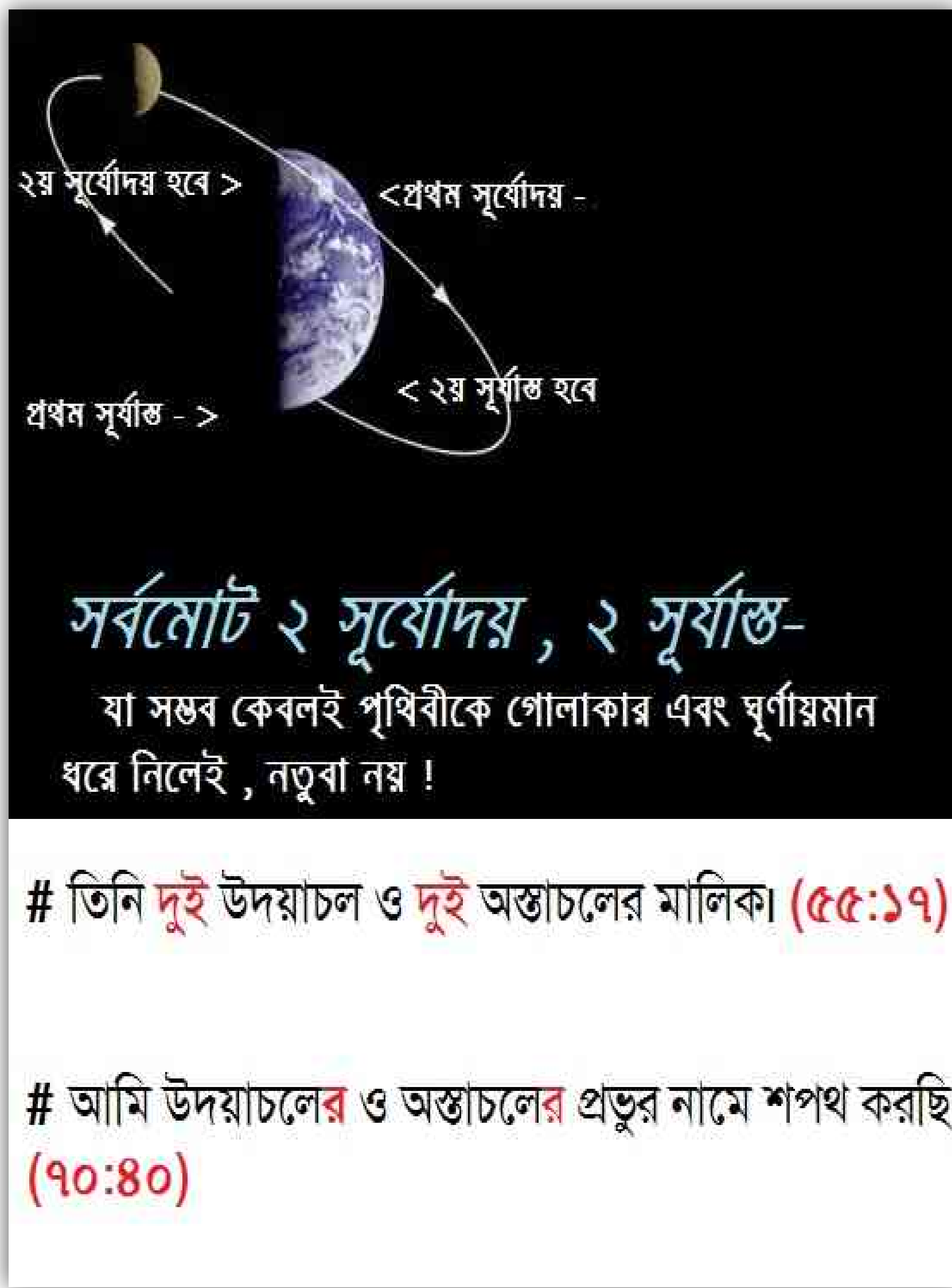
অর্থাৎ - এখানে দুটি ধরা হয়েছে।

নিচের ছবিটিই দেখুন –

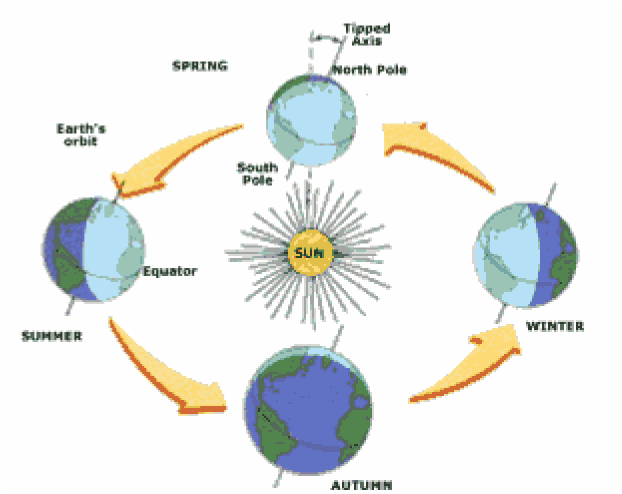


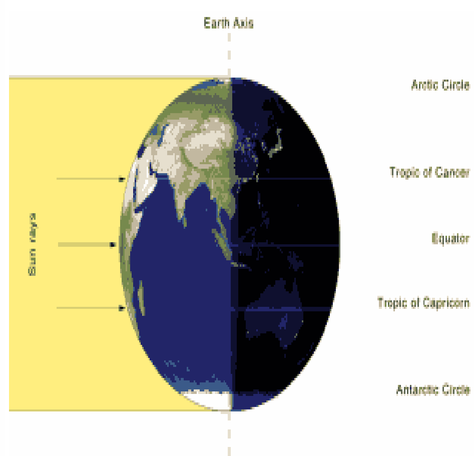
বিস্তারিত জানতে দেখুন - http://www.answering-christianity.com/earth_round.htm

এবার আসুন এই ছবিটি দেখুন –


২য় সূর্যোদয় হবে >
<প্রথম সূর্যোদয় -
< ২য় সূর্যাস্ত হবে
প্রথম সূর্যাস্ত - >
সর্বমোট ২ সূর্যোদয় , ২ সূর্যাস্ত-
যা সম্ভব কেবলই পৃথিবীকে গোলাকার এবং ঘূর্ণায়মান ধরে নিলেই , নতুবা নয় !
তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক। (৫৫:১৭)
আমি উদয়াচলের ও অস্তাচলের প্রভুর নামে শপথ করছি (৭০:৪০)


Rotation Axis
ঘটনা ২ - ২য় সূর্যোদয়
ঘটনা ১ - ১ম সূর্যোদয়
N
Night
Day
long days
Sunlight
equal days and nights
short days
S
ঘটনা ২ - ২য় সূর্যাস্ত
ঘটনা ১ - ১ম সূর্যাস্ত
সর্বমোট
#দুই সূর্যোদয়
দুই সূর্যাস্ত
ঘটনা ১- এখনকার অবস্থা
ঘটনা ২ - পৃথিবী ঘুরে গেলে , যেখানে দিন ছিল - সেখানে রাত আর যেখানে রাত ছিল সেখানে দিন হবে!
তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক (৫৫:১৭)
আমি উদয়াচলের ও অস্তাচলের প্রভুর নামে শপথ করছি (৭০:৪০)
FZ KARIM


Tipped Axis
North Pole
SPRING
Earth's orbit
South Pole
SUN
Equator
SUMMER
WINTER
AUTUMN


Earth Axis
Arctic Circle
Tropic of Cancer
Sun rays
Equator
Tropic of Capricorn
Antarctic Circle


ActiveEarth World Time and Weather Clock
London
Berlin
Moscow
Chicago
New York
Shanghai
Tokyo
Sao Paulo
Johannesburg
Sydney
Seattle
Denver
Chicago
New York
Sao Paulo
London

প্রমাণ ৩

আমি দেখে ভাবলাম তুমি একটা খারাপ কাজ করেছো , এখন দেখি কাজটা তো ভালই

৩- আবার আসুন – এই আয়াতে

- "আর তুমি পাহাড়গুলোকে দেখছ, তাদের **ভাবছ অচল-অনড়**, কিন্তু তারা চলে যাবে মেঘমালার চলে যাবার ন্যায়।" – কুরআন ২৭:৮৮

স্পেশালী কোট করুন –" *আর তুমি পাহাড়গুলোকে দেখছ তাদের* ***ভাবছ*** *অচল-অনড়*" ----- আল্লাহ্ স্পষ্টই বলে দিয়েছেন – তোমরা যদিও ভাবছো – পাহাড় পর্বত স্থির। অন্য কথায় স্পষ্ট বুঝানো হচ্ছে - পাহাড় পর্বত স্থির নয়।এরপরও সন্দেহ থাকার অবকাশ আছে-ভাই!!!!

- মুহাম্মদ সা: এর কিভাবে মনে হল – পাহাড় পর্বত নিশ্চল নয়।ভূমিকম্প ছাড়া পাহাড় পর্বতকে নড়তে মানুষ দেখেনি।কুরআনে বলা হচ্ছে , পাহাড় পর্বত স্থির নয়।পাহাড় পর্বত পৃথিবীর বাইরের কিছু নয়।পৃথিবীরই অংশ।পাহাড় পর্বত যদি স্থির না বলা হয় , তাইলে পৃথিবী কিভাবে স্থির হয়। এছাড়াও , পরবর্তী অংশে মহাপ্রলয়ের কথা বলা হচ্ছে–যেখানে পাহাড় পর্বতগুলি মেঘের মত ভেসে বেড়াবে।কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে– এখানে বলা হচ্ছে পরবর্তীতে স্থির হবে না – এখনকার কথাতো বলা হয় নাই।তাদেরকে বলতে চাই – অনুবাদটি মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করুন।এখানে যদি পাহাড় পর্বতকে স্থিরই বলা হত , তাহলে "*তাদের* ***ভাবছ*** *অচল-অনড়*" না বলে **তারা অচল-অনড় বলা হত।**এখানে ,সে সময়ে ভাবা-ভাবির প্রশ্নই আসে না।মানুষ স্পষ্টই জানতো – অচল-অনড়ই।আল্লাহ্ সুকৌশলে – দুইটি কথা এক সাথে বলে দিলেন – ভাবছ শব্দ টা দ্বারা।

এটা তো , পৃথিবীর ঘূর্ণায়মানতাকেই নির্দেশ করছে।সাধারণভাবে পাগলেও তো এরকম চিন্তা করবে না- পাহাড় পর্বত স্থির নয়।

এছাড়া – এই আয়াত আরও একটা অসাধারণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে প্রকাশ করে।প্লেট টেক্টনিক্স থিওরি অনুযায়ী – ভূগর্ভস্থ প্লেটগুলি মহাদেশ ও সমুদ্রের তলভাগ নিয়ে নড়ে চড়ে ঘুরে বেড়ায় অর্থাৎ স্থির নয়।হিসেব করে দেখা গিয়েছে– যে এই নড়াচড়ার গতি বছরে ১-৫ সেমি।প্লেটগুলো যেহেতু চলমান – সেহেতু ভূপৃষ্ঠও ভৌগলিক অবস্থান নিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে।পাহাড়ও সেই পরিবর্তনে মোটেই স্থির নয় বরং চলমান।এর থেকেও পরমান করা যায়– কুরআনের আলোকে পৃথিবীর বর্তমান বৈজ্ঞানিক রূপই ফুটে উঠছে।

“Effects of Rotation (Coriolis Effect),” The Woodrow Wilson National Fellowship Foundation, www.woodrow.org/teachers/esi/1998/p/weather/Corriolis.HTM - এখানে থেকে রোটেশন ই-ফ্যাক্ট জানা যাবে।

এছাড়া – পৃথিবী যে স্থির নয় তা আল্লাহ্ লিখেছেন –অন্য অনেক আয়াতে।

প্রমাণ ৪

দীপ্তিময়ী চন্দ্র

৪-স্পষ্টই বলা হয়েছে –কুরআনে চন্দ্রের আলো নিজের আলো নয়।বারেবারে...

- এবং সেখানে চন্দ্রকে রেখেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপ-রূপে (সূরা নুহঃ১৬)

ইংরেজি অনুবাদ -

- "'And made the moon a light in their midst, and made the sun as a (Glorious) Lamp? (৭১:১৬)

------------ এখানে – চাঁদের জায়গায় – নূর শব্দটা বলা হয়েছে।আরব দেশে চাঁদকে বলা হত –এখনো বলা হয়।কিন্তু , কুরআনে আল্লাহ্ সেই শব্দ ব্যাবহার করেননি।কারণ , সেটা অবৈজ্ঞানিক।তিনি নতুন শব্দ , ব্যাবহার করলেন– **নূর।**নূর কি জিনিস আমরা সকলেই জানি – **এটা হচ্ছে প্রতিফলিত আলো।** এছাড়াও কিছু জায়গায় – দিয়া শব্দটি ব্যাবহার করেছেন।ঐটিও একি অর্থ নির্দেশ করে।

অ্যারাবিক অভিধান খুললেই দেখা যায় – প্রতিটা শব্দের অর্থ জানতে দেখুন -

http://www.answering-christianity.com/ahmed_eldin/light_of_moon.htm - শুধু ঐ আয়াতেই নয় – আরও রয়েছে -

نور (Noor): be revealed , to be lighted , to receive light.

মহামহিম তিনি যিনি মহাকাশে তারকারাজি সৃষ্টি করেছেনআর তাতে বানিয়েছেন এক প্রদীপ ও এক চন্দ্র -- দীপ্তিদায়ক।(২৫:৬১)

যার ইংরেজি অনুবাদ হচ্ছে

- Blessed is He Who made constellations in the skies, and placed therein a Lamp and a Moon giving light; (25:61) –

স্পষ্টই বলা হয়েছে – সূর্য হচ্ছে বাতি , আর চন্দ্র হচ্ছে সেই বাতির আলো ।

এইখানেও নূর শব্দটা ব্যাবহার করা হয়েছে , যার অর্থ– be revealed , to be lighted , to receive light.

এখানে নাস্তিকরা অতি দুর্বল একটা আর্গুমেন্ট তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন–

যে কুরআনে সুরা আন নূরের ৩৫ নং আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে–

আল্লাহ্ হচ্ছেন মহাকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর আলোক।

এখানে নূর শব্দের ব্যবহার হয়েছে।তাদের ভাষ্যমতে– এই আয়াত দ্বারা নূর শব্দের অর্থ প্রতিফলিত আলো নয় বরং– আলোর উৎস বোঝানো হয়েছে।

এই ধরনের চূড়ান্ত প্রতারণা দেখে মোটেও বিভ্রান্ত না হয়ে– কুরআন খুলে দেখলেই দেখবেন–

এরা আয়াতটিকে অসম্পূর্ণ ভাবে উপস্থাপন করেছে।আসলে– দীর্ঘ ঐ আয়াতটিতে উল্লেখ আছে–

সূরা আন নূর – ৩৫ নং আয়াত –

আল্লাহ্ হচ্ছেন মহাকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর আলোক। *তাঁর আলোকের উপমা* হচ্ছে যেন একটি কুলঙ্গি যাতে আছে একটি প্রদীপ। প্রদীপটি রয়েছে একটি কাচের চিমনির ভেতরে। চিমনিটি যেন একটি উজ্জ্বল তারকা, যেটি জ্বালানো হয়েছে পবিত্র জয়তুন গাছ থেকে, -- পূর্বাঞ্চলীয় নয়, পাশ্চাত্যেরও নয়, তার তেলটা যেন প্রজ্বলিত যদিও আগুন তাকে স্পর্শ করতে পারে না। আলোকের উপরে আলোক! আল্লাহ্ তাঁর আলোকের দিকে যাকে ইচ্ছে করেন পথ দেখিয়ে নেন। আর আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমাগুলো ছোঁড়েন। আর আল্লাহ্ সব-কিছু সন্বন্ধে সর্বজ্ঞাতা।

হ্যাঁ , আল্লাহ্ মানুষকে বিভ্রান্ত না হতে – তার নূরের উপমা দিয়েছেন।তিনি তার নূর সম্পর্কে বোঝাতে বলেছেন– তিনি এখানে উপমা হিসেবে বলেছেন – ধরুন এমন একটা হারিকেন , যেখানে আগুন জ্বলছে– আর তার পিছনেই রয়েছে– কাচের চিমনি , যেটা অনেকটাই উজ্জ্বল যে , আলো প্রতিফলিত করে।এই আয়াত দ্বারা নাস্তিকরা নিজেদের কবর নিজেরাই খুঁড়ে।কারণ , এখানে আল্লাহ নিজে কিভাবে নূর এবং সিরাজ তা বোঝাতে গিয়ে নূরের ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়েছেন।।যেটা হল– আলো , যা প্রতিফলিত।আল্লাহ্ নিজেই আলোর উৎস।এবং , তিনি নিজেই নূর।কারণ , কুলুঙ্গির ভিতরের আলো , উজ্জ্বল কাচের চিমনি দিয়ে যেভাবে প্রতিফলিত হয় – সেটাই নূর।এখানে আল্লাহ্ নিজের আলো কিভাবে প্রতিফলন কারী আলো অর্থাৎ নূর সেটা বুঝাতেই তিনি বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।যার ফলে– নূর যে প্রতিফলিত আলো সে সম্পর্কে কোনই অনিশ্চয়তা নেই।একইভাবে মাঝে মাঝে মুহাম্মদ সা: কেও মাঝে মধ্যে আল্লাহ্র নূর হিসেবে বলা হয়েছে।

আশা করি , নাস্তিকরা তাদের উত্তর খুঁজে পেয়েছেন।

এছাড়াও সূরা আশ-শামসের এক এবং দুই নং আয়াতে রয়েছে -

শপথ সূর্যের ও তার কিরণের,

শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে।

এখান থেকেই স্পষ্ট – হয়ে যায় প্রাচীন যুগীয় দৃষ্টিভঙ্গি নয় –আধুনিক বিজ্ঞানের সাথেই কুরআন সামঞ্জস্যপূর্ণ।আগেকার যুগে – মানুষ মনে করতো চাঁদ হচ্ছে রাতের সূর্য।সূর্য আর চাঁদের সাথে কোন সম্পর্কই নেই।কিন্তু , কুরআন এখানে সেটি বলে নাই।

অন্য অনুবাদে [25:61]

- Blessed is He who has placed in the sky great stars and placed therein a [burning] lamp and <u>luminous moon[25:61]</u>

<u>এছাড়াও , আল্লাহ্ বলেছেন - .</u>

- **তিনিই সে মহান সত্তা যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে উজ্জ্বল আলোকময়আর চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারী-রূপে (১০-৫) ---**

It is He Who made the <u>sun to be a shining glory</u> and the <u>moon to be a light</u> **(** 10:5) –

এরপর আল্লাহ্ স্পষ্টই বলে দিয়েছেন।

- **তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে(২১:৩৩)**

কেউ কেউ বলে– এখানে নাকি– একই কক্ষপথে ঘুরার কথা বলা হচ্ছে– তাদেরকে বলছি - , ভাই"আপন" শব্দের অর্থটা কি??এটার অর্থ নিজ নিজ কক্ষপথ ...

ইংরেজি অনুবাদ দেখুন–

- It is He Who created the Night and the Day, and the sun and the moon: all (the celestial bodies) swim along, ***<u>each in its</u>*** rounded course.(21:33)

<u>each in its</u> শব্দের অর্থ ***<u>যে যার নিজের</u>*** এখান থেকে বোঝা যায় , আলাদা কক্ষপথের কথা বলা হয়েছে।এক কক্ষপথের কথা নয় –

এটা শুনতে কি আজব শুনায় না – একজন মরুদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বঞ্চিত মানুষ – এইসব বানিয়ে বানিয়ে বলেছেন।যে সকল কিছুই ঘূর্ণায়মান।এমনকি চাঁদ ও সূর্য।এই লাইনটি থেকেই তো প্রমাণ করা যায়– পৃথিবী নিজ কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান এবং গোলাকার।নিচে দেখুন – প্রমাণ – কিভাবে বলা যায় ?

নিচে আমার আঁকা ছবিটি দেখুন , আমি কল্পনা করে এঁকেছি



Figure 1:**ভূকেন্দ্রিক কাল্পনিক মডেল**

ছবিঃপৃথিবী যদি সমতল হয় তাহলে যেরকম হতে পারতো।

তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেই - পৃথিবী সমতল!!তাহলে , অবশ্যই কুরআনে বলা হত - চাঁদের নিজস্ব আলো রয়েছে।এছাড়া , **নিজস্ব আলো না থাকলে কখনই রাতের বেলা চাঁদ আকাশে দেখা যেতো না।সমতল মডেলে-তো তাই দেখা যাচ্ছে।ঐ মডেল মেনে নিলে-এটাও মেনে নিতে হবে চাঁদের নিজস্ব আলো** রয়েছে।কিন্তু কুরআনে বলা হয়েছে - চাঁদের নিজস্ব আলো নেই।যা আছে - তা হল - দীপ্তি।আরবিতে ঐ আয়াতে চাঁদ অর্থে ব্যাবহার করা হয়েছে - নূর এবং মুনির।চাঁদ সম্পর্কে প্রতিবারই এই আরবি শব্দ ব্যাবহার করা হয়েছে।যার অর্থ -শুধুই আলোকময় দীপ্তি।আর , সূর্য সম্পর্কে সর্বদাই ব্যাবহার করা হয়েছে - সিরাজ , ওয়াহহাজ এবং দিয়া।যেটাকে , আলোক উৎপন্নকারী বুঝায়।

এর চেয়ে বড় কথা - সমতল মডেলে সূর্য আর চাঁদের মধ্যে কোন সম্পর্কই নেই।কারণ , সমতল হলে - সূর্য ডুবে যাবার পর - চাঁদ উঠবে এবং নিজে নিজেই আলো দিবে। কয়েক শতাব্দী আগে পর্যন্ত মানুষ এমনটি মনে করতো।কিন্তু কুরআনে - বারেবারে চাঁদ এবং সূর্যের সাথে সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে।যেটা , আধুনিক বিজ্ঞানের সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ।এর চেয়ে বড় কথা - মানুষের পক্ষে ১৪০০ বছর আগে এ ধরনের অনুমান মোটেই সম্ভব নয়।

চাঁদের এই ধরনের কথা থেকেই বুঝা যায় - পৃথিবী কুরআনের দৃষ্টিতে মতেই সমতল নয়।উলটো - কুরআনের দৃষ্টিতে - **পৃথিবী গোলাকার এবং ঘূর্ণায়মান।পৃথিবী সমতল এবং স্থির হলে- দীপ্তিময় চন্দ্র কখনই সম্ভব নয়।**

প্রমাণ ৫

অন্তর্দৃষ্টি কেন , বাহ্যিক দৃষ্টি কি তাহলে সত্য নয়?

৫- এছাড়া কুরআনের মডেলে - পৃথিবীকে সাজালে আমাদের কাছে আবার ফুটে উঠে - যে কুরআনের আলোকে পৃথিবী সমতল নয় বরং গোলাকার এবং ঘূর্ণায়মান ...

আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন – সূরা নূর এর ৪৪ নং আয়াতে –

- আল্লাহ দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান। এতে অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্নগণের জন্যে চিন্তার উপকরণ রয়েছে।

আগেকার যুগে মানুষ জানতো যে , সূর্য ডুবে যায় , আবার উঠে।সোজা হিসাব।তাহলে– কুরআনে কেন বলা হল – এই সোজা হিসাবের মধ্যেই যে - এতে অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্নগণের জন্যে চিন্তার উপকরণ রয়েছে।বাহ্যিক দৃষ্টিতে তো দেখাই যায় – সূর্য ডুবে যাচ্ছে। অন্তর্দৃষ্টির কথা বলা হয়েছে দেখে – আমরাও বাহ্যিক নয় অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে দেখি – দিন রাতের পরিবর্তনের মধ্যে এমনকি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখার কি আছে।

কুরআনে উল্লেখ আছে –

- **তুমি কি দেখ না যে আল্লাহ রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন।- সূরা লোকমান:২৯**

এছাড়াও উল্লেখ আছে

- **"...তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন..." (সূরা যুমারঃ৫)**

এক্ষেত্রে - كَوَّرَ " কাওয়ারু শব্দটা ব্যাবহার করা হয়েছে - যার অর্থ বোঝায় - **কোন জিনিসকে প্যাঁচানোযেমনটা মাথার পাগড়ির ক্ষেত্রে বুঝানো হয়।** আপনি আমি স্পষ্টই জানি পাগড়ী কিভাবে গোলাকার ভাবে প্যাঁচানো হয়।

এই ধরনের ঘটনা শুধুই পৃথিবী গোলাকার হলে সম্ভব হয়।নতুবা নয়।যদি পৃথিবী সমতল বলা হত- তাহলে এই ধরনের কথা কখনই বলা হত না-

আসুন দেখি, পৃথিবী সমতল হলে–কেন এই গোলাকার-ভাবে পাগড়ির মতো প্যাঁচানোর ব্যাপারটা ঘটে না–

নিচের ছবিটি লক্ষ করুন ...



Figure 2:**ভূকেন্দ্রিক কাল্পনিক মডেল**

كَوَّرَ " কাওয়ারু শব্দটা ব্যাবহার করা হয়েছে - যার অর্থ বোঝায় - **কোন জিনিসকে প্যাঁচানো যেমনটা মাথার পাগড়ির ক্ষেত্রে বুঝানো হয়।** আপনি আমি স্পষ্টই জানি পাগড়ী কিভাবে গোলাকার ভাবে প্যাঁচানো হয়।

ছবিতেই সব বলে দিয়েছি – আর কি বলবো!!!!



পৃথিবীকে যদি সমতলই বলার চেষ্টা করা হত– হঠাৎ করে রাত আর হঠাৎ করে দিন হত।সেটা বড় কথা না– এর চেয়েও বড় কথা – পাগড়ির মত পেছানোর কথাটা বলা হত না।আপনি কুরআনে– সব জায়গায় দেখবেন – এরকম কথা বলা আছে – আর পাশাপাশি বলা আছে – এতে অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্নগণের জন্যে চিন্তার উপকরণ রয়েছে। - আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন – সূরা নূর এর ৪৪ নং আয়াতে -

আল্লাহ দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান। এতে অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্নগণের জন্যে চিন্তার উপকরণ রয়েছে।

এছাড়াও বলা হয়েছে – সূরা আল-ইমরানের ১৯০ নং আয়াতে –

- “নিঃসন্দেহ মহাকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে বিশেষ নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবান লোকদের জন্য”

কি সেই বিশেষ নিদর্শন!!বারে বিশেষ নিদর্শনের কথা বলা হচ্ছে কেন???

বাহ্যিক নয় – অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখবার ফলেই – স্পষ্ট হয়ে যায় – এখানে কি বলার চেষ্টা করা হয়েছে।এছাড়া বাহ্যিক দৃষ্টি দিয়ে দেখার কথা মানা করা হয়েছে।চোখের সামনে আমরা যা দেখি তা বাহ্যিক।যেমন এখন দেখছি– সূর্য অস্ত যাচ্ছে।এটা

বাহ্যিক দিক থেকে দেখে সত্যি মনে হচ্ছে– আসলে কিন্তু ভিন্ন।অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখার আর বারেবারে পাগড়ির মত করে প্যাঁচানোর কথা বলে - এখানে পৃথিবীর স্ফেরিক্যাল আর বিশেষ করে ঘূর্ণায়মানতার কথা বলা হয়েছে।

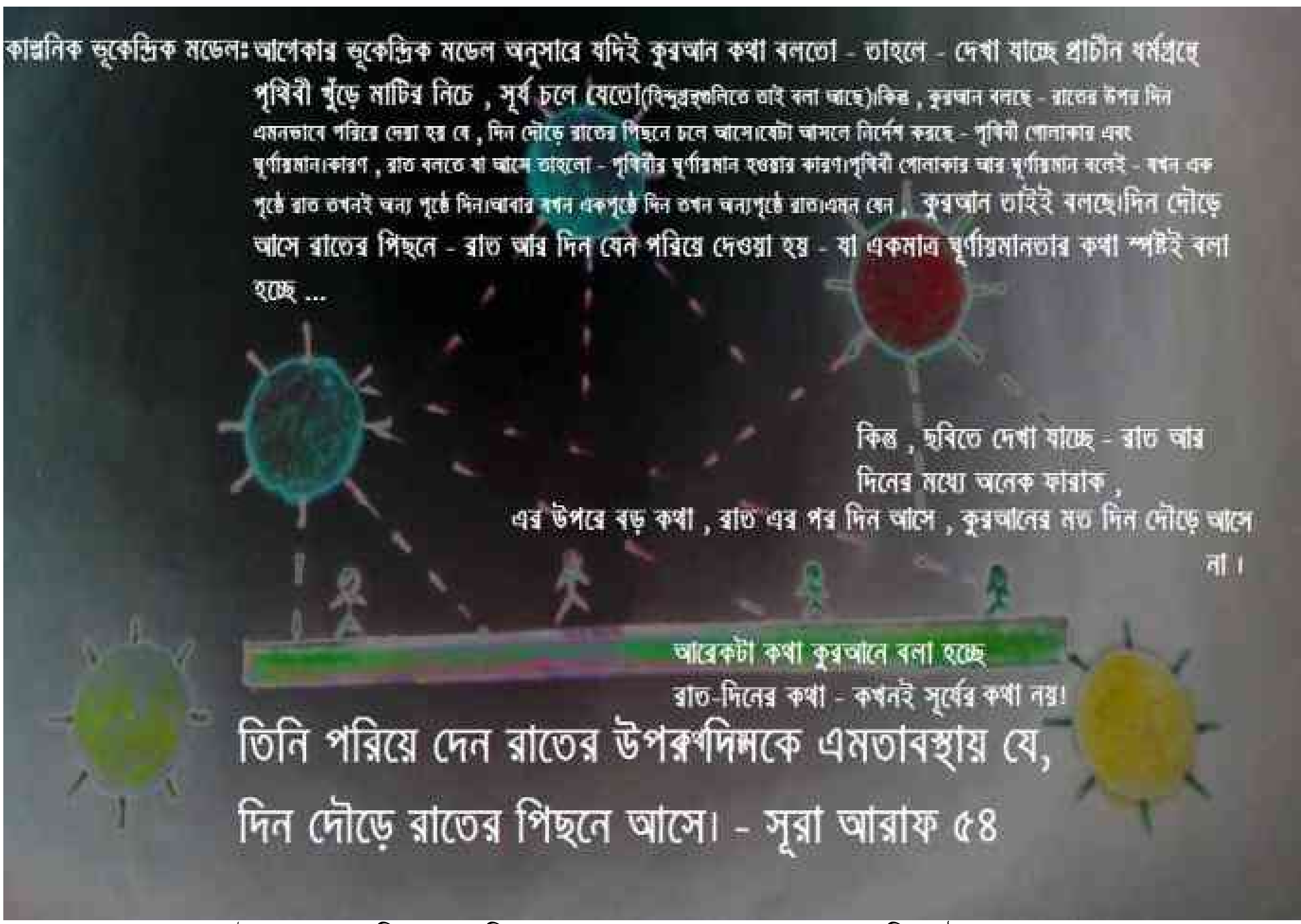
প্রমাণ ৬

সূর্যকে আচ্ছাদিত করে পৃথিবী – কিন্তু , আগে বলা হত – সূর্যই আচ্ছাদিত করে

৬/ উপরে যে বিষয়টা বলার চেষ্টা করেছি– তা আরও আরও ক্লিয়ার হবে এই আয়াতের মাধ্যমে -

কুরআনের সূরা আরাফের ৫৪ নং আয়াতে রয়েছে–

- তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে রাতের পিছনে আসে(সূরা আরাফ - ৫৪)



কুরআন বলছে – রাত শুরু হলেই সাথে সাথে দিন।কুরআনিক এক্সপ্রেশনে যা বলা হচ্ছে– তা হল , দিন দৌড়ে রাতে পাশে আসে।

আরও একটা কথা , নাস্তিক ভাইরা খেয়াল করবেন তা হল– বলা হচ্ছে রাতের এবং দিন দৌড়ে– রাত দিন হচ্ছে!!!

সূর্য ঘুরে , বা ডুবে যেয়ে রাত দিন হচ্ছে না।

আগেকার যুগে মানুষ জানতো – রাত দিনের জন্যে দায়ী হচ্ছে সূর্য।সূর্যের ঘূর্ণায়মানতার জন্যেই রাত দিন।আর , পৃথিবী স্থির।

এখানে তার সম্পূর্ণ – উলটো – বলা হচ্ছে , রাত ও দিন নিজেই দৌড়ে আসে।অর্থাৎ , পৃথিবীই দায়ী– রাত দিনের জন্যে।পৃথিবীর রাত দিনই দৌড়ে আসা যাওয়া করছে।এখানে-তো , পৃথিবীর ঘূর্ণায়মানতার কথাই ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে॥

আরও একটা কথা – বলা হচ্ছে – রাতের উপর দিনকে পরিয়ে দেন– এমনভাবে যেন দৌড়ে , অর্থাৎ সাথে সাথে!!

তার মানে , এখন রাত হবার সাথে সাথেই দিন চলে আসছে– দৌড়ে।

কিন্তু , মানুষ জানতো এবং এখনো আমরা দেখি - রাতের পর দিন হতে অনেক অনেক সময় লাগে।দৌড়ে তো পরের কথা– প্রায় অনেক সময় ১২ ঘণ্টা লাগে।

কিন্তু , বাস্তবে হয় , রাতের পরই দিন , কারণ পৃথিবীর একাংশে যখন সন্ধ্যা হয়ে রাত হচ্ছে , তখন অন্যপাশে সেটা হচ্ছে ভোর।অর্থাৎ , একপাশে রাত হবার সঙ্গে সঙ্গেই , অন্যপাশে দিন।

কুরআনে সেটাই বলা হচ্ছে – রাতের পরই দিন দৌড়ে চলে আসে।এমনভাবে যে রাতকে , দিন দ্বারা পরিয়ে অর্থাৎ পরিবর্তন করা হচ্ছে- সাথে-সাথে।

একটা একমাত্র সম্ভব হয় – পৃথিবী ঘূর্ণায়মান এবং গোলাকার দেখে।

এরপরেও , কি সন্দেহ আছে।



প্রমাণ ৭

সূর্যকে কে আচ্ছাদিত করে – পৃথিবী নাকি সূর্য – উত্তর পৃথিবী!

এছাড়াও বলা হয়েছে – কুরআনের এ-

- শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে (৯১:৪)

এখানে রাত সূর্যকে আচ্ছাদিত করার মাধ্যমে বলা হচ্ছে - বলা হচ্ছে–

রাত্রিই সূর্যকে আচ্ছাদিত করছে – অর্থাৎ , পৃথিবীর রাতই , সূর্যকে আচ্ছাদিত করছে।

সূর্য নয়।

এখানে কি , কুরআন পৃথিবীকেই রাতের জন্যে দায়ী করছে। যে , রাতই সূর্যকে আচ্ছাদিত করছে।

অথচ মানুষ আগে জানতো , সূর্যই পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করছে , কেন্দ্র করে ঘুরছে , আর পৃথিবী স্থির।

কিন্তু কুরআন বলছে – রাত্রিই সূর্যকে আচ্ছাদিত করছে!!!

বাস্তবে তাইই।

এরপরও কি বলা যায় – কুরআনের দৃষ্টিতে পৃথিবী স্থির!!

প্রমাণ ৮

ফ্ল্যাশ ব্যাক –

যখন আপনি নাস্তিকদের সাথে বিতর্ক করতে যাবেন – তখন – যেসব প্রশ্নগুলি করতে পারেন -

পয়েন্ট ১ – রাত ও দিন মানে শুধুই আলো, আঁধার – এখানে আপনার কি বিশ্বাস হয় – কেউ বলবে, আলো আঁধার তার বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরছে!

পয়েন্ট ২ - রাত ও দিন কি সমান! মোটেও না।তাহলে বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরবার প্রশ্নই আসে না। (অথচ বৃত্তাকার কক্ষপথে সমান হবার কথা)

পয়েন্ট ৩ – দুই সূর্যাস্ত এবং দুই সূর্যোদয় ব্যাখ্যা করুন – কি কারণে আল্লাহ এমনটা বললেন!

পয়েন্ট ৪ – পৃথিবীকে যদি সমতলই বলা হত – তাহলে কেন বলা হল সমতল করা হবে!!

পয়েন্ট ৫ – দিন দৌড়ে রাতের পিছনে আসে , রাত দৌড়ে দিনের পিছনে আসে।প্রথম কথা – দিন এবং রাত শুধুই আলো আঁধারের খেলা – এখানে আলো দৌড়াদৌড়ি করে সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

পয়েন্ট ৬ - উপরের কথা অনুসারে দিন এবং রাত দৌড়ানোর কথা বলা হচ্ছে – এবং এর ফলে রাত ও দিনের কথা বলা হচ্ছে – কেন বলা হয় নি সূর্যের কথা!!!সূর্যের প্রতি সামান্যতম ইঙ্গিতও কেন করা হয়নি!!

পয়েন্ট ৭ – কেন দিন এবং রাতকে পাগড়ীর সাথে প্যাঁচানোর কথা বলা হল!!

পয়েন্ট ৮ – কেন দিন ও রাত সম্পর্কিত আয়াতগুলিতে একবারও সূর্যের কথা বলা হয়নি। বারেবারে পৃথিবীকেই ইঙ্গিত করছে – দিন ও রাতের জন্যে।

পয়েন্ট ৯ – রাত দৌড়ে দিনের পিছনে চলে আসে – তার মানে রাতের সাথে সাথেই দিন।কেন এমনটা বলা হল – যেখানে ১২ ঘণ্টার মত বিশাল ব্যবধান!!!!!!

পয়েন্ট ১০ – শেষ কথা , কেন একবারও ডিরেক্টলি বলা হয়নি – পৃথিবী সমতল।

পয়েন্ট ১১ – কেনও একবারও বলা হয়নি ডিরেক্টলি – পৃথিবী স্থির!

পয়েন্ট ১২ - কেন আপনি রাত ও দিনের এই কথাকে – পৃথিবী হিসেবে মেনে নিতে পারছেন না ।

উপরে ৭ ভাবে প্রমাণিত ... এবং সন্দেহাতীত ভাবে- অথেনটিক ভাবে ...

আর কিছু বলতে চাই না , যা প্রমাণ করার করেছি – আর কিছুই বাদ রাখিনি...***<u>এরপরেও কি আর কিছু বলার প্রয়োজন আছে ... না নেই– তবুও বলছি–</u>***

অধ্যায় ৪

আরও কিছু প্রমাণ

অনুবাদ নিয়ে ভিন্নতা

অধ্যায় ৪

অনুচ্ছেদ ১

একই শব্দের দুই অর্থ এই নজির সহস্রাধিক...

বিবর্তনবাদ অন্য কোন ক্ষেত্রে সত্যি[6] না হলেও ভাষার ক্ষেত্রে সত্যি।ভাষা সদা পরিবর্তনশীল।একি শব্দ একেক সময়ে একেক রকমের অর্থ প্রকাশ করে – আর একি শব্দের রয়েছে হাজারো হাজারো অর্থ।আমাদের বাংলা শব্দেই এর উদাহরণ ভুরিভুরি। যেমন ধরুন – বল শব্দটাকে খেলার সামগ্রী হিসেবে চালিয়ে দেওয়া যাও।আবার , শক্তি হিসেবেও চালিয়ে দেওয়া যায়।

যেমন – কেউ একজন বলল –স্রস্টা,আমায় অনেক বল দাও!!

আপনি কি বুঝবেন – খেলার বলের কথা , নাকি শক্তির কথা!!কিছুই বুঝার কথা না – যদি না আপনি অবস্থান না জেনে থাকেন!!

আপনি যদি দেখেন – ঐ মানুষটি শতবর্ষী থুরথুরে বুড়ো--- তাহলে বুঝতে হবে সে স্রস্টার কাছে অনেক শক্তি চাচ্ছে।

আর আপনি যদি দেখেন – ঐ মানুষটি একজন বাচ্চা ছেলে যাকে তার বাবা বল কিনে দেয় নাই – সে তখন এই কথা বলছে – তাহলে বুঝতে হবে সে স্রস্টার কাছে খেলার বল চাচ্ছে।

এই অংশটা ভাষার ক্ষেত্রে সহস্রবার ঘটে।এরকম , আরও লাখ লাখ উদাহরণ দেখা যায়। কুরআন যখন রচিত হয় – তখন মানুষের ধারনা ছিল পৃথিবী সমতল – তখন মানুষকে যদি স্রস্টা হঠাৎ একদম সরাসরি বলে দিতেন – পৃথিবী গোলাকার!! তাহলে মানুষ ভড়কে যেতো।যেমনটা ভড়কে যাই – আমরা অজানা অঙ্ক দেখে।এজন্যে , স্রস্টা এমন শব্দ ব্যাবহার করলেন – যার অর্থ দুটো।একটা গোলাকার অথবা ঘূর্ণায়মান বুঝাচ্ছে – আরেকটা অন্যটা।স্যার ফ্রান্সিস ড্রেইক কয়েক শতাব্দী আগে এই আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত – একে ঘোরতর অবৈজ্ঞানিক গ্রন্থ হিসেবে চালিয়ে দিত-অমুসলমানরা।এখানেই কুরআনের

---

[6] নোট – বিবর্তনবাদ সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে জানতে – www.bibortonbad.blogspot.com এ দেখুন।

এছাড়াও – “Uncle Darwin we have not changed” বইটি অবশ্যই পড়ে দেখবেন।আশা করি , বইয়ের মধ্যে কয়েকশ প্রাচীন - শত মিলিওন বছর পূর্বের – অপরিবর্তিত ফসিল গুলি দেখে – বিবর্তনবাদ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারনা ভাঙবে। এছাড়া - Atlas of creation পড়ে দেখবেন।

অলৌকিকত্ব – এবং সকল যুগের সাথে খাপ-খাওয়াতে পারার বৈশিষ্ট্য।যাতে মানুষ আপাতত , সন্তুষ্ট থাকে– তবে পরে যেন বুঝে সঠিক অর্থটা বসাতে পারে।নিম্নোক্ত দুটো ক্ষেত্রে এমনই ঘটেছে ... তাছাড়া,**সব কথার উপরের কথা আকারে ইঙ্গিতে স্রস্টা আরও অনেকভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন- পৃথিবী গোলাকার এবং ঘূর্ণায়মান- যেটা উপরে বিস্তারিত উল্লেখ করেছি*তার পরে অবশ্য এই দুই আয়াত উল্লেখের প্রয়োজন বোধ করি না...তবুও করলাম*।**

আসুন দেখি সেই দুই আয়াত।

প্রমাণ ৯

উটপাখির ডিম , আর উটপাখির মতই গলা লম্বা বিশিষ্ট হাতুড়ে আরবি ভাষা বিশেষজ্ঞ!!

৬-He made the earth egg-shaped.- 79:30

"এবং আল্লাহ্ পৃথিবীকে ডিম্বাকৃতি করে তৈরি করেছেন- সূরা আন-নাযিয়াত:৩০

এটা দিয়ে , বোঝানো হচ্ছে – পৃথিবী গোলাকার । পৃথিবীতে উটপাখির ডিমই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হতে পারে।আজীবন সমতলে দাঁড়ানো – মুহাম্মদ সা: এর কিভাবে মনে হল যে , পৃথিবী ডিম্বাকৃতির।যদি ,দাবী কেউ করে– মুহাম্মদ সা: বানিয়ে বলছেন – তাইলে তার মস্তিষ্কের সুস্থতা নিয়ে ব্যাপক প্রশ্ন তোলা যায়।

আরও বিস্তারিত জানতে - http://www.answering-christianity.com/egg-shaped_earth.htm তে গিয়ে বিস্তারিত দেখতে পারেন।

(এই আয়াতের অনুবাদ নিয়ে কিছু অর্বাচীন জল-ঘোলা করছে– দেখলাম ব্লগে।তাঁদের জন্যে কিছু কথা-

যারা এই আয়াতের অনুবাদ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন– তারা যা জীবনে একটা আরবি হরফের অর্থ জানেন না , সেটা ভালো করেই জানি।দুই শব্দের আরবি জ্ঞান নিয়ে , তারা সময়মত– এরা-বিক বিশেষজ্ঞ হিসেবে দাঁড়িয়ে যান।এটা শক্ত ঈমানের মানুষের কাছে কিঞ্চিত হাস্যকর ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।একজন দুর্বল ঈমানের মানুষ ভড়কে যেতে পারে।আমরা নিজেরাই বাঙালি।অনেকের বাংলা শব্দের অর্থই জানিনা।সেখানে , আরবির মত একটা জটিল ভাষা কিভাবে বুঝবো সেটা সন্দেহের ব্যাপার।সেজন্যে , আমাদের ভাষা বিশেষজ্ঞদের দ্বারস্থ হতে হয়।রাস্তার হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে গিয়ে সমস্যার সমাধান হয় না – ই-বুকটি সংক্ষেপ রাখা চেষ্টা করছি দেখে আর বেশি কিছু বলছি না।তবে বলতে চাই –আপনি হতে পারেন বড়- সড় বিজ্ঞানী কিন্তু আরবি সম্পর্কে আপনার জ্ঞান অ্যারা-বিয়ান ১ বছরের শিশুর সমানও নয়।অল্প বিদ্যা নিয়ে ভাঁড়ামি করতে নেই।যে যে বিষয়ে জানেন না– চুপ করেই থাকা শ্রেয়।কারণ , অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর পরিণতি ডেকে আনে।

সকল অ্যারাবিক বিশেষজ্ঞ যেখানে একমত– সেখানে কিছু ব্লগারবৃন্দের ভাঁড়ামি দেখতে আর যাই লাগুক সুখকর লাগে না।

এখানে ব্যাবহার হয়েছে– দা-হাহা শব্দটি।যার উৎপত্তি দুহিয়া থেকে।যার অর্থ অনেকে করেছেন– বিস্তৃত করা।আবার অনেকে উটপাখির ডিম।দুটোই সত্য।আরবি ডিকশনারিগুলি তার প্রমাণ।বাংলা শব্দেই এই ধরনের ব্যাবহার অহরহ দেখা যায়– যেমন বল শব্দটি– খেলার বলকেও বুঝায় আবার শক্তিকেও বুঝায়।বাংলা সহ পৃথিবীর সকল ভাষাতেই– এই ধরনের নজির অহরহ দেখা যায়।(ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

[1] উপরিউক্ত আয়াতটির উচ্চারণ-Waalarda baAAda thalika dahaha – এখানে দা-হাহা শব্দের উৎপত্তি দুহিয়া থেকে যার অর্থ উটপাখির ডিম।উপরের আরবি টু ইংলিশ অভিধান থেকেই এ বিষয়ে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

নিম্নোক্ত ছয়টি আরবি অভিধান থেকে কুরআন বিশেষজ্ঞরা একমত হয়েছেন যে– এর দ্বারা বিস্তৃত এর পাশাপাশি উটপাখির ডিমও বোঝানো হচ্ছে - পেজ সহ উল্লেখিত – আপনারা নিজেরা চাইলে দেখে সিউর হতে পারেন...

1. Lisan Al-Arab dictionary [1] , Book 2, Pages 215-218.
2. Lisan Al-Arab dictionary [1] , Book 8, Pages 236-238.
3. Al-Muheet dictionary [2], Page 1179.
4. Al-Muajam Al-Waseet dictionary [3], Pages 272-274.
5. Al-Mawrid dictionary Arabic-English section [4], Page 537.
6. Arabic-English dictionary the Hans Wehr dictionary [6], Page 273.

যেসকল অর্বাচীনরা তর্ক বিতর্ক চালিয়ে যাচ্ছে , তাদের সম্পর্কে আমি এতটুকুই জানা যথেষ্ট মনে করি যে– তারা জীবনে এইসব আরবি অভিধানের নাম-ধামও শুনেননি।

এখন , দায়িত্ব আপনার এইসব হাতুড়ে বিশেষজ্ঞ দের কথা বিশ্বাস করবেন যারা জীবনে একটা অ্যারাবিক অভিধানও দেখে নি , কিংবা ইসলামিক বিশেষজ্ঞদের যারা এক পয়েন্টে একমত হয়েছেন---তাঁদের কথা বিশ্বাস করবেন।দায়িত্ব আপনার।ফলাফলও আপনার।

http://www.answering-christianity.com/egg-shaped_earth.htm - বিস্তারিত জানতে এই পোস্টটি ভালো করে পড়ে দেখবেন।এখানে জায়গা স্বল্প দেখে আর কথা বাড়াচ্ছি না।পরবর্তীতে প্রয়োজনে বিস্তারিত লিখবো।

এরপর , আবার "অবিশ্বাসের দর্শন" বইতে পড়েছিলাম – লেখক সন্দেহ প্রকাশ করে বলছেন – উটপাখির ডিমের সাথে পৃথিবীকে তুলনা করা নাকি যৌক্তিক নয় । আপনারাই নিজেরাই একটু গভীর ভাবে দেখুন যৌক্তিক নাকি–

কুরআনের আলোকে পৃথিবীর আকার আসলে স্ফেরিক্যাল, কোনভাবেই সমতল নয়। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর আকারকে বাস্তবে কোন কিছুর সাথেই তুলনা করা যায় না এবং সম্ভবও নয়।বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ বলেন কমলালেবুর মতো।আবার কেউ কেউ মত দেন কুমড়ার (pumpkin) মতো। তবে কোনটাই কিন্তু পুরোপুরি সঠিক নয় , হওয়ার কথাও নয়। ইন্টারনেটে পৃথিবীর অনেক ফটো আছে কিন্তু কমলালেবুর মতো 'দুই সাইড চ্যাপ্টা এবং কিছুটা ভেতর দিকে ঢুকে গেছে' এরকম কোন ফটো দেখা যায় না। আর তা-ই যদি হয় তাহলে পৃথিবীকে ডিমের সাথে তুলনা করাই বেশী যৌক্তিক এবং বাস্তব। কারণগুলো হচ্ছে:

(১) কমলালেবুর যেমন স্ফেরিক্যাল , ডিমও তেমন স্ফেরিক্যাল;



(২) কমলালেবুর বোঁটা রয়েছে, কিন্তু অপরপক্ষে ডিম ও পৃথিবীর কোন বোঁটা নেই:





(৩) কমলালেবুর মধ্যে বিচি রয়েছে, কিন্তু ডিম ও পৃথিবীর মধ্যে কোন বিচি নেই।

(৪) কমলালেবুর কেন্দ্রে কিছুটা ফাঁপা হয়ে থাকে, কিন্তু ডিম ও পৃথিবীর কেন্দ্রে ফাঁপা নয়।

(৫) কমলালেবুর মধ্যভাগ অনেকগুলো কোয়ার সমষ্টি এবং কোয়াগুলোকে একে অপর থেকে সহজে পৃথকও করা যায় কিন্তু ডিম ও পৃথিবীর মধ্যভাগ কমলালেবুর মতো নয়;

(৬) ডিমের যেমন কয়েকটি স্তর আছে(শেল, শেলের নীচে পাতলা স্তর, সাদা তরল পদার্থের স্তর, হলুদ তরল পদার্থের স্তর, ইত্যাদি)পাশাপাশি পৃথিবীরও তেমনি কয়েকটি স্তর আছে (Crust, Mantle, Inner core, Outer core, etc.);

(৭) ডিম ও পৃথিবী উভয়েরই পৃষ্ঠভাগ শক্ত পদার্থ এবং মধ্যভাগ নরম ও গলিত পদার্থ দ্বারা গঠিত।কমলালেবু এর ধারে কাছেও যায় না।

(৮)কমলার দুইপাশ চাপা হলে একটি সুবিধা , উপরের সাতটা অসুবিধা। আর , উটপাখির ডিমের একটা অসুবিধা হলে – ৭টা এক্সট্রা সুবিধা।আর , কোন কিছুর সাথে মিলাতে হলে যে – ১০০% ই মিলবে এমন কথা নেই।১০০% মিললে-তো আর কম্পেয়ার হয় না – একি জিনিস হয়।সেদিক থেকে , এটি পারফেক্ট – কারণ বেশি অংশ মিলে যায়।



ইজ ইকুএল টু

এরপরে আবার কিছু উটপাখির ডিমের ছবি দেখুন -

গুগলে OSTRICH EGG লিখে – প্রথম পেজের যেসব ছবি আসে –











পাশাপাশি , উটপাখির ডিমের আকৃতি বেশিরভাগ সময়ে গোলাকার।তবে কিছু ভিন্ন আকৃতির পাওয়া যেতে পারে– এটা স্বাভাবিক।তবে , উদাহরণ হিসেবে কমলালেবু কিংবা কুমড়ার চেয়ে উটপাখির ডিম বেশি পারফেক্ট।কারণ , কমলালেবুর



অরিজিনাল সাইজ - - যেটা মোটেও পারফেক্ট নয়।গোলাকার আর একটু চাপা এমন কমলা কমই দেখা যায়।ডিমের ক্ষেত্রেও মাঝে মাঝে এমনটা হয়– আসলে যদি একবারে ম্যাচ করে তাহলে কম্পেয়ারের তুলনা আসে কেন...একটু-আধটু পার্থক্য তো থাকবেই।

পাই এর মান
৩.১৪১৫৯২৬৫৩৫৮৯৭৯৩২৩৮৪৬২৬৪৩৩৮৩২৭৯৫০২৮৮৪১৯৭১৬৯৩৯৯৩৭৫১০৫৮২০৯৭৪৯৪৪৫৯২৩০৭৮১৬৪০৬২৮৬২০৮৯৯......... শেষ হবে না অসীম

কিন্তু আমরা অঙ্ক করি – ৩.১৪১৬ দিয়েই।

অথচ , এইটার চেয়ে ওইটা বেশি পারফেক্ট।কিন্তু , আসন্ন মান বলে একটা কথা আছে– পৃথিবীর ক্ষেত্রেও তেমনটি।পৃথিবীতে এমন কোন পারফেক্ট প্রাকৃতিক জিনিস আপনি আমি দেখাতে পারবো না যে– যা পুরোই গোলাকার এবং উপর আর নিচ থেকে একটু চাপা।ওয়ান মিলিওন ডলার বেট রাখা যেতে পারে...

সে হিসেবে , উটপাখির ডিম একটি পারফেক্ট জিনিস– পৃথিবীর যেকোনো জিনিসের চেয়ে , পৃথিবীর সাথে তুলনা করতে...।

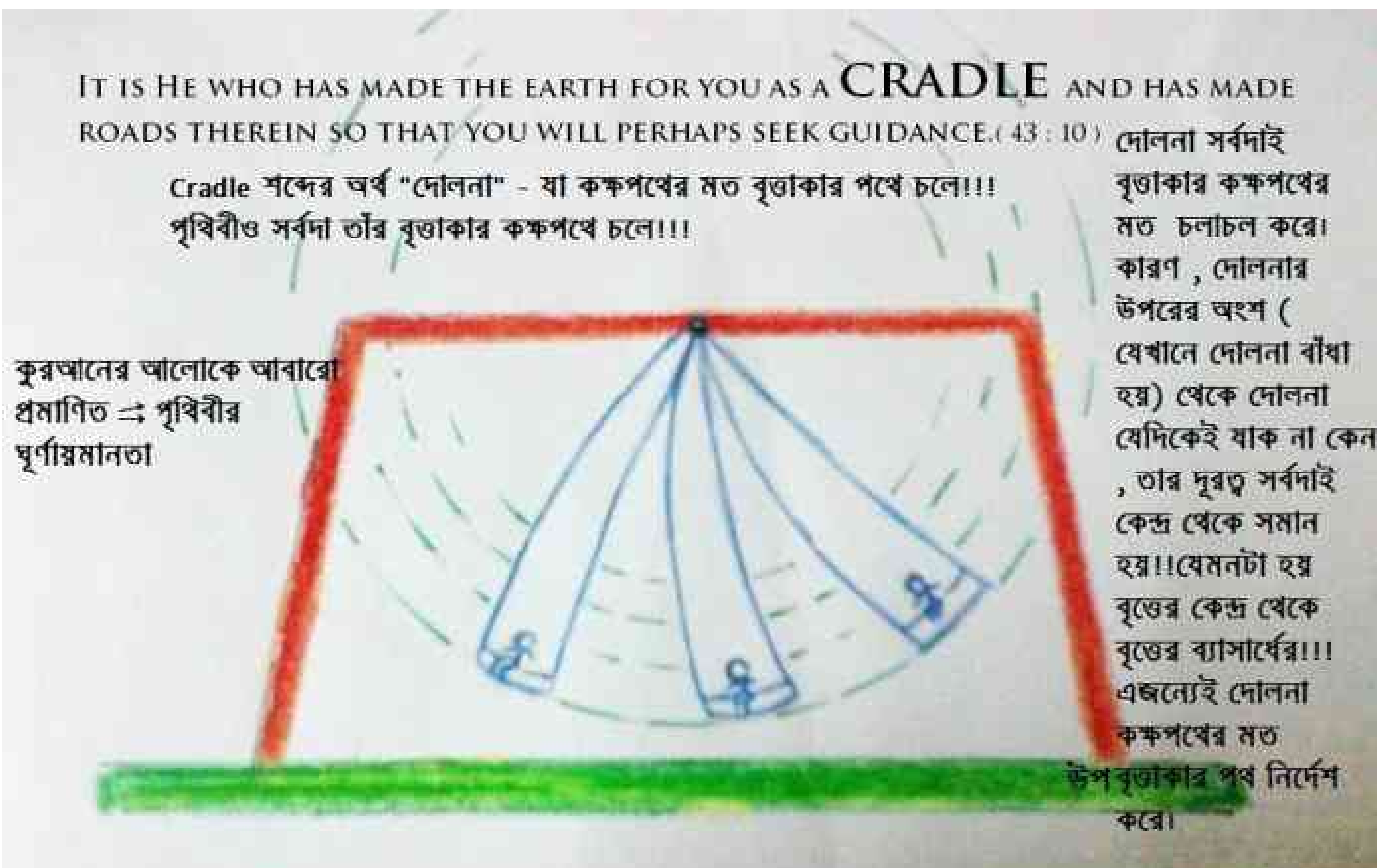
আর মনে রাখবেন – উপমা দেয়াই হয় – শুধুমাত্র জিনিসটার অবয়ব বোঝানোর জন্যে।১০০% মিল কখনই হয় না।দুই পাশে সামান্য চাপা , বলা চেয়ে গোলাকার বলাটাই সবচেয়ে বেশি জরুরী।এবং , কুরআন সেটাই বলেছে।

প্রমাণ ১০

দোল দোল দুলুনি – কখনো কি ভেবেছেন দোলনা বৃত্তাকার পথে চলে!!

It is He who has made the earth for you as a cradle and has made roads therein so that you will perhaps seek guidance .(Az-Zukhruf:10)

Cradle- মানে দোলনা।এখানে পৃথিবীকে দোলনার সাথে তুলনা করা হয়েছে।আমরা স্পষ্টই জানি– দোলনা কিভাবে চলে।এটি বৃত্তাকার পথে চলে।নিচের ছবিটি দেখলে ব্যাপারটি হয়ত– ক্লিয়ার হবে –



আসলে পৃথিবীর কক্ষপথ পুরোপুরি গোলাকার নয় – পৃথিবীর কক্ষপথ উপবৃত্তাকার।এখানে আরেকটা মিরাকল।আপনি যদি প্রাক্টিকালি পরীক্ষা করতে যান – দেখবেন – বাতাসের প্রভাবে দোলনা কখনই বৃত্তাকার পথ পরিক্রম করতে পারবেন না।যদি কোন দোলনাকে খুব জোরে ধাক্কা দেন , এমনভাবে যেন একদম উপরের পর্যন্ত উঠে , উল্টো দিক থেকে আবার উপর থেকে নিচে নেমে আসবে – তাহলে দেখবেন – গ্রাভিটির কারণে – পথটা উপ-বৃত্তাকার হয়ে যাবে।যা পৃথিবীর উপবৃত্তাকার কক্ষপথকেই নির্দেশ করবে।

ছবির নোট – আসলে পৃথিবীর কক্ষপথ পুরোপুরি গোলাকার নয় – পৃথিবীর কক্ষপথ উপবৃত্তাকার।এখানে আরেকটা মিরাকল।আপনি যদি প্রাক্টিকালি পরীক্ষা করতে যান – দেখবেন – বাতাসের প্রভাবে দোলনা কখনই বৃত্তাকার পথ পরিক্রম করতে পারবেন না।যদি কোন দোলনাকে খুব জোরে ধাক্কা দেন , এমনভাবে যেন একদম উপরের পর্যন্ত উঠে , উল্টো দিক থেকে আবার উপর থেকে নিচে নেমে আসবে – তাহলে দেখবেন – গ্রাভিটির কারণে – পথটা উপ-বৃত্তাকার হয়ে যাবে।যা পৃথিবীর উপবৃত্তাকার কক্ষপথকেই নির্দেশ করবে।

<u>যা থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় – আল্লাহ্‌ পৃথিবীকে ঘূর্ণায়মান বলেছেন…</u>

কারণ , দোলনা সর্বদাই উপবৃত্তাকার কক্ষপথে চলাচল করে।কারণ , দোলনার উপরের অংশ (যেখানে দোলনার রশি বাঁধা হয়) থেকে যেদিকেই যাক না কেন , সর্বদাই তার দূরত্ব কেন্দ্র থেকে সমান এছাড়াও , বাতাসের এবং মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে এটা উপবৃত্তাকার পথে পরিণত হয়।

বৃত্তের ক্ষেত্রেও এমন , বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু থেকে সর্বদাই বৃত্তের ব্যাসার্ধ সমান হয়।বৃত্তের মতই , দোলনার ক্ষেত্রেও এমন হয়।কেন্দ্র থেকে যেখানেই যাক না কেন - দূরত্ব সর্বদাই সমান।এরপরেই , বাতাসের এবং মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে এটা উপবৃত্তাকার পথে পরিণত হয়।

এর ফলে , দোলনা ইঙ্গিত দেয় – উপ-বৃত্তাকার কক্ষপথের যা – স্পষ্টই বলে পৃথিবী তার কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান।

অনুবাদের ভিন্নতা: আমি যে অনুবাদটা দিয়েছি তা Muhammad Sarwar এর।উনি ছাড়াও AJ Arberry, Qaribullah , Ahmad Darwish , Ali Quli Qarai , Abul Ala Maududi, Wahiduddin Khan এবং আরও কয়েকজন এভাবে অনুবাদ করেছেন।তবে , আবার কয়েকজন , অন্যভাবেও অনুবাদ করেছেন।এদের মধ্যে একজন হল– ইউসুফ আলী।ইউসুফ আলীর অনুবাদ বিখ্যাত হওয়ায় অনেকেই তার অনুবাদকে অন্ধ অনুসরণ করেন।এতে , অনেকের অনুবাদ তাঁরটার মতো হয়ে যায়।বাংলাতেও তার ব্যতিক্রম হয় নাই।বাংলা অনুবাদও ইউসুফ আলীর সিকুয়েল।তাই আসুন দেখি -

আপনি Muhammad Sarwar এর অনুবাদ খুললে দেখবেন –

It is He who has made the earth for you as a cradle and has made roads therein so that you will perhaps seek guidance. (Az-Zukhruf: 10)

আপনি AJ Arberry এর অনুবাদ খুললে দেখবেন –

He who appointed the earth to be a cradle for you, and appointed ways for you therein, that haply you may be guided (Az-Zukhruf:10)

আবার Hasan al-Fatih Qaribullah and Ahmad Darwish এর যৌথ অনুবাদ খুললে দেখবেন –

(It is) He who made the earth to be a cradle for you and made in it ways for you, in order that you are guided. .(Az-Zukhruf:10)

আবার , Ali Quli Qarai এর অনুবাদ খুললে দেখবেন –

He, who made the earth a cradle for you, and made for you in it ways so that you may be guided [to your destinations],(Az-Zukhruf: 10)

আবার – Abul Ala Maududi অনুবাদ করেছেন -

He it is Who made this earth for you a cradle and made in it pathways for you that you may find the way to your destination; (Az-Zukhruf: 10)

আবারো – Wahiduddin Khan অনুবাদ করেছেন –

Who has made the earth a cradle for you and made thereon paths for you so that, hopefully, you may find your way (Az-Zukhruf: 10)

আবার ,

এরাও বিখ্যাত অনুবাদক।যেখানে এতো জন অনুবাদক একই অনুবাদ করছেন – সেখানে এইটা ভুল বলা অযৌক্তিক।অন্যেরা অন্যরকম অনুবাদও করেছেন।কিন্তু , ঐ যে বলেছি– একই শব্দের অনেক অর্থ থাকতে পারে।

ঐখানে – ইউসুফ আলী অনুবাদ করেছেন –

- (Yea, the same that) has made for you the earth (like a carpet) spread out, and has made for you roads (and channels) therein, in order that ye may find guidance (on the way);

অনেকেই তাঁর মত করে অনুবাদ করেছেন – তিনি – cradle এর বদলে spread out বেছে নিয়েছেন।দুটোই হান্ড্রেড পার-সেন্ট সঠিক।নিচে – এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল –

ইউসুফ আলীসহ অন্যান্য অনেকে অনুবাদ করেছেন

- [43:10] (Yea, the same that) has made for you the earth (like a carpet) **spread out**, and has made for you roads (and channels) therein, in order that ye may find guidance (on the way);

Transliteration – **আরবি উচ্চারণ** :

[043:010] Allathee jaAAala lakumu alarda mahdan wajaAAala lakum feeha subulan laAAallakum tahtadoona

Arabic (from right to left):

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ [٤٣:١٠] 78:6

Abdullah Yusuf Ali have translated مَهْدً mahdan to mean " **spread out** ". However, in the following Noble Verses, he translated the root word forمَهْدً mahdan **to mean "cradle":**

ইউসুফ আলী مَهْدً mahdan – মাহদ-আন বোঝাতে "spread out"।এক্ষেত্রে তিনি , "spread out" বেছে নিলেও অন্য ক্ষেত্রে একই শব্দ মাহদ-আনের জন্যে বেছে নিয়েছেন–Cradle অর্থাৎ দোলনা।দেখুন নিচে –

ইউসুফ আলী এবং অন্যান্য সবাই:

[019:029] But she pointed to the babe. They said: "How can we talk to one who is a child in the cradle?"

Transliteration- **আরবি উচ্চারণ**:

[019:029] Faasharat ilayhi qaloo kayfa nukallimu man kana fee al mahdi sabiyyan.

Arabic (from right to left):

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا [١٩:٢٩]

এক্ষেত্রে , দুটো শব্দই مهد (mahd) ধাতু থেকে উৎপত্তি হয়েছে[7]।নিচের আরবি অভিধান থেকে দেখা যায়– শব্দটি দুটো অর্থই নির্দেশ করে– cradle এবং Spread out।এ বিষয়ে ইসলাম বিশেষজ্ঞরাও একমত। যার প্রমাণ এতোগুলো অনুবাদ।

রেফারেন্স:

1. Lisan Al-Arab dictionary [1] , Book 2, Page 790.
2. Al-Muheet dictionary [2], Page 303.
3. Al-Muajam Al-Waseet dictionary [3], Page 889.
4. Al-Mawrid dictionary Arabic-English section [4], Page 1132.

[7]মাহদ হচ্ছে আসল শব্দ এর সাথে অন্যান্য ক্ষেত্রে আন , ইন ইত্যাদি শব্দাংশ বাংলার মত আরবিতেও যোগ হয়ে থাকে।যেমন আসল শব্দ – দোলনা।এটি ব্যাবহার হয় – দোলনায় , দোলনাতে ইত্যাদি শব্দাংশ যোগ হয়ে। "য়" , "তে" ইত্যাদি শব্দাংশ যোগ শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে না।এখানেও , তেমনটি।

5. Al-Mawrid dictionary English-Arabic section [4], Page 227.

6. Arabic-English dictionary the Hans Wehr dictionary [6], Page 928.

এই আরবি অভিধানগুলিতে যা আছে তা হল –

مهد (mahd): مَهْدُ الصبي هو موضعه الذي يُهيّأ له و يُوَطّأ لينام فيه و the **mahd** of the baby is the place that is prepared for him, **and is rocked back and forth** يُوطّأ **to put him to sleep.**

مهد (mahd): **cradle.** It is said: من المهد إلى اللّحد from cradle to grave.

এছাড়াও একইভাবে – Muhammad sarwar অনুবাদ করেছেন –

It is God who has made the earth as a **cradle** for you with roads for you to travel.(সূরা তাহাঃ৫৩)

এছাড়াও – A.J arberry -

He who appointed the earth to be a **cradle** for you (সূরা তাহাঃ৫৩)

Qaribullah ও Darwish যৌথভাবে একই অনুবাদ করেছেন।

It is He who has made for you the earth as a **cradle**

যার আরবি উচ্চারণ হবে –

Allathee jaAAala lakumu alarda **mahdan** wasalaka lakum.

বিস্তারিত জানতে দেখুন:

http://www.answering-christianity.com/egg-shaped_earth.htm - এর শেষাংশে।

#নাস্তিকদের শেষ চেষ্টা হিসেবে তারা যুক্তি দিতে পারে– দোলনা কখনও পৃথিবীর কক্ষপথের মডেল হতে পারবে না।কারণ হচ্ছে – দোলনার পিছনে ধাক্কা দেয়া লাগে – ইত্যাদি ইত্যাদি।তখন তাদেরকে কাউন্টার প্রশ্ন করবেন– আপনি উপমা শব্দের অর্থ কি না।বোঝেন।উপমা মানে কি?উপমা মানে – মিল।মিল থাকবে মানে কি – ১০০% মিল হবে।১০০% মিল হলে তো আর উপমা হয় না।

তারপরও না বুঝলে – বলবেন – আমি ঘোষণা করলাম।দোলনাই এর সবচেয়ে ভাল উপমা।যদি আপনার কাছে– এর চেয়ে ভাল কোন উপমা থাকে – তাহলে বলুন।দেখবেন , বলতে পারবে না।

আমাকে একজন বলেছিলো – লাটিম।উনাকে খুব ভালভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছিলাম – কেন লাটিমের চেয়ে দোলনা ভাল উপমা।

দেখবেন , দোলনার চেয়ে আর ভালো উপমা হয় না।

প্রমাণিত- কুরআন দ্বারা পৃথিবীর ঘূর্ণায়মান।

উপরে মাত্র সাতভাবে প্রমাণ করেছি যে কুরআনের দৃষ্টিতে পৃথিবী সমতল কিংবা স্থির তো নয়ই , বরং ঘূর্ণায়মান এবং গোলাকার।এছাড়া আর অনেকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব…

এছাড়াও মহাবিশ্বের প্রায় সকল জিনিসের ঘূর্ণায়মান সম্পর্কে কুরআন বলছে–

১-শপথ চক্রশীল আকাশের।৮৬:১১

জাস্ট কোট –চক্রশীল– যার দ্বারা বোঝানো হচ্ছে – চক্রের কথা।এখানে মহাবিশ্ব এর অগণিত কক্ষপথকে নির্দেশ করছে।

২- আল্লাহ্ বলেছেন…

"কসম বহু পথ আর কক্ষপথ বিশিষ্ট আসমানের।" (সুরা যারিয়াত, ৫১ : ৭)

- এটা থেকে কি মনে হয়????নবী করিম সা: কিভাবে কল্পনা করেছেন – সারা মহাবিশ্ব কক্ষপথ দ্বারা বেষ্টিত।এটা কল্পনাও করা সম্ভব নয় সে যুগে।

অধ্যায় ৫

অন্য ধর্মগ্রন্থ কি বলে...

অধ্যায় ৫

অনুচ্ছেদ ১

খ্রিস্টানরা কি বলে

অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থ কি বলছে

বাইবেলে দেখুন ...

The Bible suggests that the earth is a **flat disc (flat circle)** **standing on pillars**:

"He set the earth on its foundations; **it can never be moved.** (From the NIV Bible, Psalm 104:5)"

"He shakes the earth from its place and makes its pillars tremble. (From the NIV Bible, Job 9:6)"

"Where were you when I laid the earth's foundation? Tell me, if you understand. (From the NIV Bible, Job 38:4)"

"that it might take the earth by the edges and shake the wicked out of it? (From the NIV Bible, Job 38:13)"

"He sits enthroned above the **circle of the earth**, and its people are like grasshoppers. He stretches out the heavens like a canopy, and spreads them out like a tent to live in. (From the NIV Bible, Isaiah 40:22)" ((The earth being a "circle" means it is a flat disc.)

উপরিউক্ত , বাইবেলীয় ভারসগুলি আমাদের বলছে পৃথিবী নাকি বৃত্তাকার চাকতির মত , এবং সমতল।আরও ভয়ানক ব্যাপার এই যে– বলছে পৃথিবী নাকি– শক্ত স্তম্ভের উপরে দাঁড়িয়ে আছে!!!

অনুচ্ছেদ ২

হিন্দু ধর্ম কি বলে -

বাংলা ব্লগ জগতে– তথাকথিত কিছু মুক্তমনা রয়েছেন। তারা নাকি নাস্তিক- কুরআন খুঁজে খুঁজে ভুল বের করেন ! তারা নাকি নাস্তিক ? আসলে , হিন্দু পরিচালিত এই ওয়েব এ আমার গুটিকয়েক এক্স-মুসলিম ভাইরা কুরআন নিয়ে নিয়মিত লিখালিখি করেন– কটাক্ষ করেন মুসলিমদের !

কিন্তু , তারা কি দেখেছেন– এই ব্লগের নাস্তিকরা কক্ষনো হিন্দু ধর্মকে বিজ্ঞানের কাঠগড়ায় দাঁড়া করিয়েছেন। উত্তর না ? কেন ? বেদে কি কোন ভুল নাই ? বেদ ট্যাগে মুক্তমনায় মাত্রও ১০টা লিখা ? [8]

হাজার হাজার ভুল থাকা সত্ত্বেও– কেন সেই ওয়েবে হিন্দু ধর্মকে কটাক্ষ করে লেখা যায় না? উল্টা , ঐ ব্লগে ফাউন্ডার এক পোস্টে লিখেছেন– এভাবে ধর্মগ্রন্থে মিল খুঁজলে– বেদেই নাকি কত মিল পাওয়া যায়!

আমি এই কয়দিন ধরে সার্চ করে দেখছি- বেদ কিংবা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ গুলির ভুল ধরে কোন পোস্ট নেই ? আমি আবারো আশ্চর্য হলাম – এদের উদ্দেশ্যটা কি ?

শুধু মাত্রও – ইসলামকে হেয় করা , আর কিছু নয় ?

হিন্দু মুক্তমনা কেন এতো বেশি ?

আর , না বুঝেই ওদের দলে দৌড় দেওয়া- মুসলিম ভাইদের কাছে আমার প্রশ্ন ?

আপনারা ফাঁকটা ধরতে পারছেন-তোআমাকে শুধু একবার বলুন– কেন , মুক্তমনায় বেদের ভুল সম্পর্কিত কোন লিখা নেই ! কেন , কেন , কেন ? অথচ , মুক্তমনায় হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ !!

এইবার তাদের উদ্দেশ্য কি ক্লিয়ার?

আসুন দেখে নেই– এক পলকে কিছু হিন্দু ধর্মগ্রন্থের ভয়ানক ভয়ানক ভুল।এখানে উল্লেখিত - প্রতিটা শ্লোক , মন্ত্রসব পড়ে দেখেছি ... – এবং ১০০% সিউরিটি দিয়েই উপস্থাপন করছি । (কিছু সংগ্রহ করেছি , আর বেশিরভাগই নিজে বেদ পড়ে পড়ে বের করেছি !)

---

[8] http://mukto-mona.com/bangla_blog/?tag=%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6

- কোন বৈজ্ঞানিক ভুল নেই –এই ব্লগে

হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলি আরও এককাঠি সরেস , তার স্পষ্টই বলে দিয়েছে– সকল কিছুই স্থির , এমনি স্থির যে নাড়ানোই নাকি সম্ভব নয়।

- "Sabita made this Earth fixed by different devices (like hills and mountains) and sustains sky without pillars so <u>that it does not move</u>" [RIK VEDA]
- "The sky is <u>immovable</u>, the <u>Earth is immovable</u> and these mountains are <u>also immovable</u>" [RIK VEDA 10-173-4]
- ধ্রুবা দৌধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবা-সঃ পর্বতা ইমে (ঋগ্বেদ দশম মণ্ডল , ১৭৩/৪)

অর্থাৎ - "আকাশ নিশ্চল , পৃথিবী নিশ্চল , এ সমস্ত পর্বতও নিশ্চল"।

- সূর্য রথ-বাহক সাতটি অশ্বীকে যোজিত করলেন, সেই স্বয়ং-যুক্ত অশ্বীদের দ্বারা তিনি গমন করেছেন **(ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডল , ৫০ নং সুক্তি , ৯)**
- যার দ্বারা আকাশ শক্ত এবং পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে - যজুর্বেদ (৩২৬)
- স্থির দৃঢ় পৃথিবী ইন্দ্র বিপদ থেকে রক্ষা করে। (অথর্ব বেদ ১২/১/১)
- দয়াময় , চির-উদার পৃথিবী যেখানে আমরা থাকি– সেই স্থির , দৃঢ় পৃথিবী (অথর্ব-বেদ ১২/১/১৭)
- পৃথিবী একটা সবার জন্যে স্থির আবাস।ই-সভারা এই মহাবিশ্বকে ধরে রেখেছে । **(নরসিমহা পুরানা , পৃষ্ঠা ১৭০)**
- গরু আকাশকে ধরে রেখেছে (যজুর্বেদ ৪:৩০)
- **ঋগ্বেদ ১১/৫৭/**
- প্রকাণ্ড দেহ বিশিষ্ট ইন্দ্রের উদ্দেশে আমি মননীয় স্তুতি সম্পাদন করছি।
- এইবার আরও --- ক্লিয়ার হল– বিশ্বস্রষ্টার একটা প্রকাণ্ড দেহও আছে। মানুষের চেয়ে আর স্রষ্টার কি) ! আর পার্থক্য থাকলো
- **ঋগ্বেদ ১১/৬৩/**
- ১। হে ইন্দ্র তুমি !সর্বাগ্রগণ্য; ভয়ের সময়ে তোমার শত্রু শোষণকারী বল দ্বারা তুমি দ্যাবা পৃথিবী ধারণ করেছিলে। বিশ্বের সমস্ত ভূত ও পর্বতসমূহ এবং অন্য যে সমস্ত মহৎ ও দৃঢ় পদার্থ আছে, তারাও নভস্থলে সূর্যরশ্মির ন্যায় তোমার ভয়ে কম্পিত হয়েছিল।

ইংরেজি অনুবাদ –

When, in their fear of thee, ***<u>all firm-set mountains and monstrous creatures</u>*** shook like dust before thee.

ইন্দ্রর ভয়ে দেখছি – স্থির পৃথিবীর সকল মহৎ এবং দৃঢ় স্থির জিনিসগুলি কম্পিত হয়ে যায়।তার মানে স্থির জিনিসইতো কম্পিত হয়।-

যাক – ঋগ্বেদের অনুসারে স্থির পৃথিবী মাঝে মধ্যে কম্পিতও হয়!!!!!

কিন্তু – বিজ্ঞান বলছে , পৃথিবী সমানে ঘুরছে !!!

- **(অথর্ব বেদ ১২/১/১)**

  on the firm earth that Indra guards from danger. Atarv Ved 12/1/11

  স্থির দৃঢ় পৃথিবী ইন্দ্র বিপদ থেকে রক্ষা করে। (অথর্ব বেদ ১২/১/১)

  প্রকান্ডদেহী ইন্দ্র বিপদ থেকে রক্ষা করে নাকি – সেটা পরের ব্যাপার।কিন্তু , আমার জানি – পৃথিবী মোটেই স্থির নয় – তাহা সমান-তালে ঘুরিতেছে !!

  http://www.sacred-texts.com/hin/av/av12001.htm

- **(অথর্ব-বেদ ১২/১/১৭)**

  Kind, ever gracious be the Earth we tread on, the firm Earth, Prithivi (Atharv Ved 12/1/17)

  দয়াময় , চির-উদার পৃথিবী যেখানে আমরা থাকি – সেই স্থির , দৃঢ় পৃথিবী (অথর্ব-বেদ ১২/১/১৭)

  http://www.sacred-texts.com/hin/av/av12001.htm

- **- ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডল , ৫০ নং সুক্তি , ৯**

  ৯। সূর্য রথ-বাহক সাতটি অশ্বীকে যোজিত করলেন, সেই স্বয়ং-যুক্ত অশ্বীদের দ্বারা তিনি গমন করেছেন

  যাক এইবার আরও ক্লিয়ার হল – সূর্য নিজেই তার সাতটা ঘোড়া কে নিযুক্ত করিয়াছেন।এবং তিনি তার ঘোড়া ছাড়া চলাফেরা করতেই পারেন না !!

  এইবারও – বিজ্ঞানের নাম আনলাম না !! লজ্জা পাবে।

- **(যজুর্বেদ ৪:৩০)**

  The Bull hath propped the sky and air's mid-region - Yajur Ved: 4: 30

  গরু আকাশকে ধরে রেখেছে (যজুর্বেদ ৪:৩০)

  আমি নিজে এই জিনিসটা ভালো করে পড়ে দেখেছি – শুধু এইখানে না – আরও অনেক জায়গায় বলা হচ্ছে – গরু আকাশকে ধরে রেখেছে!!

  তো – গরুটা কোথায় ?

  নাহ – ঠাকুরমার ঝুলিও হার মানলো ! বিজ্ঞান কি করবে ? আকাশ হচ্ছে – একটা বায়বীয় আস্তরণ – একে কিভাবে ধরে রাখা যায় – সেটা মনে হয় – ঐ গরুই জানে !!

  http://www.sacred-texts.com/hin/wyv/wyvbk04.htm

- **যজুর্বেদ ১৪:৫**

  Upon the back of Aditi I lay thee the sky's supporter - Yajur Ved: 14:5

  যাক আকাশকে অদিতি পিঠে করে ধরে রেখেছে –যজুর্বেদ ১৪:৫

জেনে খুশি হলাম । ভাগ্যিস , ধরে রেখেছিলো – নইলে কি যে বিপদ হত ! !
http://www.sacred-texts.com/hin/wyv/wyvbk14.htm

- **যজুর্বেদ ৩২):৬ (**

-

 -By whom the heavens are strong and earth stands firmly,
by whom light's realm and sky-vault are supported; Yajur Ved: 32:6
যার দ্বারা আকাশ শক্ত এবং পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে ৩২) যজুর্বেদ...:৬ – (
পৃথিবী নিজ অক্ষে ঘুরছে – বিপুল বেগে।আধুনিক বিজ্ঞান তাইই বলছে – প্রাচীন যুগীও ঠাকুরমার ঝুলির মত – বেদ বলছে – পৃথিবী স্থির !! আকাশও স্থির।ভালই।স্থির থাকাই ভালো ,
আধুনিক বিজ্ঞান বলছে – পৃথিবী ঘুরছে – সব ঘুরছে । আকাশ একটা বায়বীয় আস্তরণ বৈকি আর কিছুই নয় – সেটা যে শক্ত – সেটা জেনে আবারো প্রীত হলাম দাদা !!
http://www.sacred-texts.com/hin/wyv/wyvbk.32htm

- দয়াময় , চির-উদার পৃথিবী যেখানে আমরা থাকি – সেই স্থির , দৃঢ় পৃথিবী (অথর্ব-বেদ ১২/১/১৭)
http://www.sacred-texts.com/hin/av/av12001.htm

এরকম আরও অনেক অনেক জায়গায়।এ বিষয়ে আরও আরও জানতে– দেখুন – আমার লেখা - **বেদ নামক রূপকথার বইটি কি পড়েছেন ! (প্র থ ম প র্ব– ২২ ভুল) !**

অধ্যায় ছয়

কিছু প্রচলিত প্রশ্নের উত্তর

অধ্যায় ৬

অনুচ্ছেদ ১

বধির , বোবা ও অন্ধ – রঙ্গমঞ্চ প্যারাডক্স = সবই আল্লাহ করাইছে – আমার দোষ নাই!.

কুরআনে এইসব ভবিষ্যৎ বানী কিভাবে করা হল – বলতে পারেন।আমি জানি বলতে পারবেন না।হেন তেন বলে এড়িয়ে যাবেন হয়ত – কিন্তু, মনে রাখবেন যখন সৃষ্টিকর্তার সামনে দাড়া হবেন – সেদিন এই এড়ানোর জন্যে অনেক দাম দিতে হবে।

এগুলির মধ্যে একটা নিদর্শনই , আপনাকে সত্যের পথে টেনে আনার জন্যে যথেষ্ট।মনকে উন্মুক্ত করুন।জীবন কোন ছেলে – খেলা নয়।দলগত ভাবে ব্লগ খুলে কোন একটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করলেই সেটা সত্যি হয়ে যায় না।মানুষ এখনও অনেক ভ্রান্তিতে থেকে গেছে - পৃথিবী সমতল এই বলে – একটা প্রতিষ্ঠান তাঁদের এগারশ পৃষ্ঠার প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছে।চিন্তা করুন , ভ্রান্তির কি বাহার।একটা দুটো বই লিখলেই বিষয়টি সত্যি হয়ে যায় না।

যারা এরপরেও সত্যে পথে ফিরে আসবে না তাদের জন্যে বলা আছে–

“তারা বধির , বোবা ও অন্ধ।সুতরাং তারা ফিরে আসবে না-সূরা বাকারা – ১৮

সত্যকে এড়িয়ে যাবার এই যে খারাপ অভ্যাস , তার তীব্র নিন্দা করে কুরআন।এইধরনের কাজ করলে– অবশ্যই একদিন কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

এখানে – প্রাসঙ্গিক কিছু আলোচনা করি –

অনেকে বলে থাকেন – আল্লাহ্-তো সবই জানতেন , তাহলে তিনি বিচার করবেন কেন।তাদেরকে উদাহরণ দিতে পারি

– একটা ক্লাসের ছাত্ররা পরীক্ষায় কেমন করবে – সেটা একজন মনযোগী শিক্ষক বলে দিতে পারবেন।ক্লাসের ছাত্রর দৌড় কিরকম – শিক্ষক জানেন।যদি রহিমকে , শিক্ষক বলেন – তুমি পরীক্ষায় জিপিএ ৪ এর বেশি পাবে না- এবং আমি

নিশ্চিত।তাহলে কি আপনি বলবেন – রহিমের রেজাল্টতো শিক্ষক আগেই বলে দিয়েছেন– এখন , খারাপ রেজাল্টের জন্যে রহিম দায়ী থাকবে না ? এখানেও এমনই , দায়ী আল্লাহ্ নয়– মানুষই।

ইবনে সিনা এই কুযুক্তির উত্তর দিতে গিয়ে বলেছিলেন–

"আমাদের জানা , আর স্রস্টার জানা – এর মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে।আমরা যেটা জানি সেটা প্রতি মুহূর্তে বদলাতে পারে।প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের জ্ঞান প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তন হয়।আমাদের জ্ঞান পরিবর্তনশীল।আর স্রস্টার জ্ঞান অর্থাৎ জানা – STATIC (**স্থির)।**"

আল্লাহ্ , সময়কে সৃষ্টি করে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে রেখেছেন।তাই , এই সময়ের মধ্যে যা হবে সবই আল্লাহ্ জানেন।কারণ , "হবে" শব্দটা আমাদের জন্যে প্রযোজ্য।আল্লাহ্‌র জন্যে নয়।আল্লাহ্‌র কাছে "হবে" বলে কিছু নেই।কারণ , তিনি সময়কে সৃষ্টি করেই রেখেছেন।আর মানুষ এই সময়ে স্বাধীনভাবে কাজ করবে–

- এবং মানুষ তাই পায়, যা সে করে , তার কর্ম শীঘ্রই দেখা হবে। অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। (৫৩:৩৯-৪১)।

আর এর মধ্যে আল্লাহ্ মানুষকে নানারকম ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন তৈরি করে পরীক্ষা করেন।পরীক্ষা করার কথা কুরআনে শতাধিকবার এসেছে।পরীক্ষা মানেই কঠিন একটা পরিস্থিতি তৈরি করে– মানুষকে পরীক্ষা করা।

একজন নাস্তিক – তার টাইমলাইনে লিখেছেন - "ইসলামের শত্রু , মেড বাই আল্লাহ্"।

নাস্তি-বাদীরা এই যুক্তির গ্যাঁড়াকলে পড়ে বেশি।

কথাটা হবে দুইভাবে –

"ইসলামের শত্রু , নোনড বাই আল্লাহ্ এজ লাইক এজ রহিম'স রেজাল্ট ওয়াজ নোনড বাই হিজ টিচার"।

"ইসলামের শত্রু , যা আল্লাহ্ জানতো ঠিক সেভাবেই , যেভাবে রহিমের জিপিএ ৪ এর সম্পর্কে জানতেন তার টিচার"।যদি টিচারকে দায়ী করা না যায় – তাহলে আল্লাহকেও দায়ী করা সম্ভব নয়।কারণ টিচার জানলেই টিচার দায়ী হয় না –তেমনিভাবে আল্লাহ্ জানলেও আল্লাহ্ দায়ী হবে না।জানলেই কেউ দায়ী হয় না।কর্মফল রহিমের , দায়ী রহিমই।কর্মফল নাস্তিকের , দায়ী নাস্তিকই।

এরপর , দুই নং সমস্যা , তার লিখা উচিত – ইসলামের শত্রু , ফেইন্ড ইন আল্লাহ’স এক্সাম।

কারণ , আল্লাহ্ তাকে পরীক্ষা করবার জন্যেই –বিশ্বাসের দোলাচলে ফেলেছেন(যেভাবে আমাকেও এককালে ফেলেছিলেন)।দেখেছেন – কিভাবে সে সেই দোলাচল পেরিয়ে আসে।অবিশ্বাসের বীজ ঢুকিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করেছেন– সে কিভাবে পেরিয়ে আসে।কিন্তু , সেই নাস্তিকসহ অন্য নাস্তিকরা সেই পরীক্ষায় করুণভাবে অকৃতকার্য হয়েছে।আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন –

- "নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে জ্ঞান দৃষ্টি এসেছে, কাজেই যে কেউ দেখতে পায়, সেটি তার নিজের আত্মার জন্যে, আর যে কেউ অন্ধ হবে, সেটি তার বিরুদ্ধে যাবে। আর আমি তোমাদের উপরে তত্ত্বাবধায়ক নই।’’(৬:১০৪)

অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট – আল্লাহ্ আমাদের তত্ত্বাবধায়ক নন।“যে কেউ অন্ধ হবে, সেটি তার বিরুদ্ধে যাবে’ – হ্যাঁ , যে ভুল করবে সেইই দায়ী হবে- আল্লাহ্ নন।কারণ , আল্লাহ্ আমাদের বর্তমান কাজের তত্ত্বাবধায়ক নন।আর , আল্লাহ্ ইচ্ছা করেই এই কঠিন পরীক্ষায় ফেলার ক্ষেত্রে - ইসলামিক স্কলার – আল জুনায়েদ এই সম্পর্কে বলেছেন -

- “একজন মানুষকে তার খারাপ স্বভাব-চরিত্রের জন্যে দায়ী করা হবে না , বরং দায়ী করা হবে– যদি সে তার খারাপ স্বভাব চরিত্র অনুযায়ী আচরণ করা হয়” (হি-লওয়াত আল আউলিয়া)

হ্যাঁ , আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত নাস্তি-বাদী মনোভাবের জন্যে নয় – দায়ী করা হবে সে অনুযায়ী আচরণের জন্যে।কুরআন বলে –

- “আর তারা ভেবেছিল যে কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে না, সেজন্য তারা হলে অন্ধ আর বধির, এরপর আল্লাহ্ তাদের দিকে ফিরলেন। তারপরেও তাদের অনেকে অন্ধ ও বধির হলে।**আর তারা যা করে আল্লাহ্ তার দর্শক।** “(৫:৭১)

সকল নাস্তিকদের জিজ্ঞেস করে দেখুন – তারা বিশ্বাস করে না , যে তাদের কোন পরীক্ষা হবে কিংবা হচ্ছে না।তারা এই প্রশ্নও করে – আল্লাহ্ থাকলে তার অবিশ্বাসীদের কিছু বলে না কেন ? কেতাবি – শব্দ , দ্যা সাইলেন্স অফ গড ! তাদের জন্যে বলা হয়েছে - **আর তারা যা করে আল্লাহ্ তার দর্শক**।রবীন্দ্রনাথের কবিতার সুরে বলি – দিনে দিনে বহু বাড়িতেছে দেনা , শুধিতে হইবে ঋণ।হ্যাঁ , দেখা হবে – রোজ কেয়ামতের মাঠে।

কুরআন বলে –" আর এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। তারা তো অনুমানেরই অনুসরণ করছে, আর নিঃসন্দেহ সত্যের বিরুদ্ধে অনুমানে কোনো লাভ হয় না।সেজন্য তাকে উপেক্ষা করো যে আমাদের উপদেশ থেকে ফিরে যায় আর দুনিয়ার জীবন ছাড়া আর কিছু চায় না।এইটিই তাদের জ্ঞানের শেষসীমা। নিঃসন্দেহ তোমার প্রভু -- তিনিই ভাল জানেন তাকে যে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে, আর তিনিই ভাল জানেন যে সৎপথ-প্রাপ্ত।"(৫৩:২৮-৩০) হ্যাঁ , আসুন বৃথা অনুমান দিয়ে , সত্যকে ঢেকে না রেখে – সত্যকে আলিঙ্গন করুন।

আশা করি – এই তথাকথিত প্যারাডক্সের সমাধান হয়েছে। এটা প্যারাডক্স নয় – আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতায় ভুল অনুমান।নাস্তিকদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য কারণ – আপনারা নাস্তিক , এর জন্যে আল্লাহ্ দায়ী নন।আল্লাহ্ জানতেন , বলেই আল্লাহ্ দায়ী নয়।আর , আপনারা মানব সমুন্নত বিবেককে , অপযুক্তির কাছে বন্ধক দিয়েছেন।এর জন্যে , আপনারাই দায়ী।

- আর তোমরা ভেবো না যে অন্যায়কারীরা যা করে আল্লাহ্ সে-সম্বন্ধে বেখেয়াল। তিনি তাদের শুধু অবকাশ দিচ্ছেন সেইদিন পর্যন্ত যেদিন চোখগুলো হবে পলকহীন স্থির –[১৪:৪২]

অনুচ্ছেদ ২

আল্লাহ্ যদি সত্যি থাকেন – তাহলে এত্তো ধর্ম কেন – একটা নয় কেন?

এই লেখাটি প্রাসঙ্গিক কোন লেখা নয় – তবুও সংশয়ী মনের দরজা বন্ধ করতে এটাও লিখে দিলাম –

একটা শিশু যখন জন্ম নেয় , তখন তাকে আমরা একধরনের পড়া পড়তে দেই, আবার যখন সে একটু বড় হয় , তখন আরেকটু উপরের লেভেলের বই হাতে দেই।ধারাপাতে – শিশুদের পড়াই – অজগরটি ঐ আসছে তেড়ে!!! এর চেয়ে অবাস্তব কথা আর কি আছে – অজগর কি তেড়ে আসে নাকি,নড়তে নড়তেইতো ওর দিন শেষ?? কিন্তু , আমরা ঐ শিশুকে সেটাই পড়াই।কারণ , সেটাই তার জন্যে উপযুক্ত।ঐ শিশুটির বইতে কখনই লিখে দেই না- অজগর একটি সরীসৃপ গোত্রীয় প্রাণী – যার বৈজ্ঞানিক নাম –

Pythonidae

অথচ , আমরা কিন্তু ভুল শিখাচ্ছি বাচ্চাটিকে।কিন্তু , ঐ ছেলেটি যখন এইট নাইনে উঠবে – তখন ঠিকই জানবে – Pythonidae হচ্ছে – অজগরের বৈজ্ঞানিক নাম।
এরপর , ইচ্ছে করলে – অজগরের উপরে গবেষণা করে পিএইচডিও নিতে পারবে।
তেমনই , আল্লাহ্– মানুষকে তার শিশু সভ্যতা থেকে আধুনিক সভ্যতায় আসার সময় দিয়েছেন।একেকেমযে , একেক নবী রাসুল পাঠিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন।এবং নবী- রাসুলরা – তাদের গোত্রকে শিক্ষা দিয়েছেন।আল্লাহর বানি শুনিয়েছেন।মানুষকে সভ্য হওয়ার সাথে সাথে সভ্যতর নিয়মকানুন দিয়েছেন।যেমন , ধরুন – আদম আ; আর হাওয়া আঃ এর সময়েই যদি কুরআন দিয়ে দেওয়া হত – তাহলে কি গুহাবাসী মানুষেরা পর্দা প্রথা মেনে চলতে পারতো।যেখানে , গাছের পাতাই সম্বল – সেখানে আবার পর্দা।ই নিশ্চিতভাবে মানুষকে , আল্লাহগাছের পাতা পরার পরামর্শই দিয়েছিলেন।এখনো যদি – সেই গ্রন্থ থাকতো- তা হলে কি সেটা উপযুক্ত হত।এছাড়া, অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা আসতো – যেমন অর্থের প্রচলন কখন হল।এর আগে কি-ধর্ম ছিল না।তাহলে – ইসলাম ধর্মে উন্নততর – অর্থনৈতিক ব্যাবস্থা দিয়েছেন??আদম আঃ এর সময়ে দিলে কি হত??

আসলে , একজন ছাত্র যখন প্লে থেকে ইউনিভার্সিটি পাস করে বের হয়ে যায় – তখন কি সে – অজগরটি ঐ আসছে তেড়ে – লেখা বইয়ের কোন মূল্য থাকে।না , থাকে না।সেটা তখন , ভাঙ্গা চুরা আলারা মাথায় নিয়ে বেচলো কিনা- নাকি ঘরের কোনায় ইঁদুরে কাটা পড়ল।সেটার মূল্য থাকে না।ঠিক প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলিও সেরকম।সেগুলো , এখন টয়লেটে টিস্যু হিসেবে না ঝাল-মুড়ির ঠোঙ্গা হিসেবে ব্যাবহার হচ্ছে – নাকি কেউ অজগরটি ঐ আসছে তেড়ে কেটে অজগরটি ঐ আসছে কুন্ডুলি পাকিয়ে লিখে

ফেলে সেটা আর স্রস্টার কিংবা আমাদের মাথাব্যাথা না।কারণ , সেগুলোর প্রয়োজনিতা ফুরিয়ে গেছে।সেগুলো , নির্দিষ্ট কওমের জন্যে এসেছিলো।এখন বিকৃতি হলেই কি , নাহলেই কি।

আমি তোমাদের সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করতে এসেছি।

ওয়ান মিলিওন চ্যালেঞ্জ – কোন নবীই বলেননি –

আমি বিশ্ববাসীকে পথ প্রদর্শন করতে এসেছি , একমাত্র মুহাম্মদ সাঃ ব্যাতীত

যার জন্যে যেটা উপযুক্ত , তার জন্যে সেটাই দেওয়া হয়।পৃথিবীতে আল্লাহ্১ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার কিংবা ২ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার নবী পাঠিয়েছেন।এদের একেকজনকে – তার গোত্রের জন্যে পাঠানো হয়েছে।সকলকেই , তার নিজের গোত্রের জন্যে পাঠানো হয়েছে।ঈসা আঃ ও তেমন একজন।
(বাইবেল) ৬১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কার্যকর।তারপর , মুহাম্মদ সাঃ নবুয়াত পেলেন – এবং বাইবেল সহ অন্যসব বাতিল হল।তিনিও ঘোষণা করে দিলেন –বিদায় হজ্জে- আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন কে পূর্ণ করে দেওয়া হল।এবং এটাই ফাইনাল।রিসালাতের সমাপ্তি হয়েছে – আমার পরে আর কোন নবী আসবেন না।

স্পেশালী কোট – দ্বীন কে পূর্ণ — এত দিন তার মানে অসম্পূর্ণ ছিলো।

কিন্তু মুসা আঃ কি বলেছিলেন –

- তাঁর Book of Deuteronomy এর ১৮ নং অধ্যায়ের ১৮ নং অনুচ্ছেদে বলে দিয়েছিলেন –
  মহান ঈশ্বর বলেছেন , আমি তোমার মত করে তোমার ভাইয়ের মধ্য হতে একজন নবীকে পাঠাবো। আমি তাকে ধর্ম প্রচার করতে বলবো।সে আমার আদেশে সব কথা বলবে।"

মুসা আঃ স্পষ্টই বলে দিয়েছেন – আমার পরে আরেকজন আসবে।স্পষ্টই – বলা হল – সে আমাদের ভাই এর মধ্যের একজন।এখানে , মুহাম্মদ সাঃ এর কথাই বলা হয়েছে , চিন্তা করেন ব্যাপারটা।

- বুক অফ আইজায়ার ২৯ নং অধ্যায়ের ১২ নং অনুচ্ছেদে আছে –

আসমানী কিতাব যাকে দেওয়া হবে তিনি শিক্ষিত নয়।তাকে যখন বলা হবে এটা পড় , সে বলবে আমি পড়তে জানি না।

আপনি আমি স্পষ্টই জানি – মুহাম্মদ সাঃ কে যখন প্রথম – জিবরাইল আঃ হেরা গুহায় বলেছিলেন – ইকরা-পড়।তখন , নিরক্ষর মুহাম্মদ সাঃ বলেছিলেন – আমি পড়তে জানিনা !!!! চিন্তা করুন ব্যাপারটা।এড়িয়ে যাবেন না।

আল্লাহ্আরো স্পষ্টভাবে এই প্রসঙ্গে কুরআনে বলেছেন –
সূরা আরাফের ১৫৭ নং আয়াতে –

- "তারা অনুসরণ করে নিরক্ষর নবীকে , যার উল্লেখ আছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে(বাইবেল)"

বলাই বাহুল্য – মুহাম্মদ সাঃ ওপেন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন – হে আরববাসী , তোমরা কি এই গ্রন্থের কোন ভুল ধরতে পারবে।কেউ ধরতে পারেনি।এর মধ্যে , নিরক্ষর কথাটিও সত্য।বারেবারে , কুরআনে মুহাম্মদ সাঃ এর নিরক্ষরতার কথা বলা হয়েছে – সূরা আনকাবুতে বিশেষ করে। যদি , এই স্টেটমেন্ট মিথ্যা হত – তাহলে আরববাসী ভুল ধরে দিতো।তুমি তো নিরক্ষর নও!!! কিন্তু , এমনটা হয়নি।তিনি আসলেই নিরক্ষর ছিলেন।

কুরআনে বলা হয়েছে –

এমন কোন সম্পদায় নেই যেখানে আমি সতর্ককারী পাঠাইনি – সূরা ফাতির , আয়াত ২৪

এইবার দেখি , ঈসা আঃ (যিশু) কি বলেছিলেন – তিনি কি ওইরকম কোন কথা বলেছেন –
হ্যাঁ তিনিও বলেছেন –
গস্পেল অফ জনের ১৬ নং অধ্যায়ের ১২০১৪ অনুচ্ছেদে আছে
যিশু বা ঈসা আঃ বলেছেন –

- তোমাদের আমি অনেক কিছুই বলতে চাই , কিন্তু তোমরা এখন সেগুলো বুঝবে না। কারণ , সত্য আত্মা তোমাদেরকে সত্যের পথে নিয়ে যাবে। সে তাঁর নিজের কথাগুলি বলবে না , যে কথাগুলি শুনবে সেই গুলিই বলবে। সে আমাকে মহিমান্বিত করবে। সে তোমাদের ভবিষ্যতের কথাগুলিই বলবে।

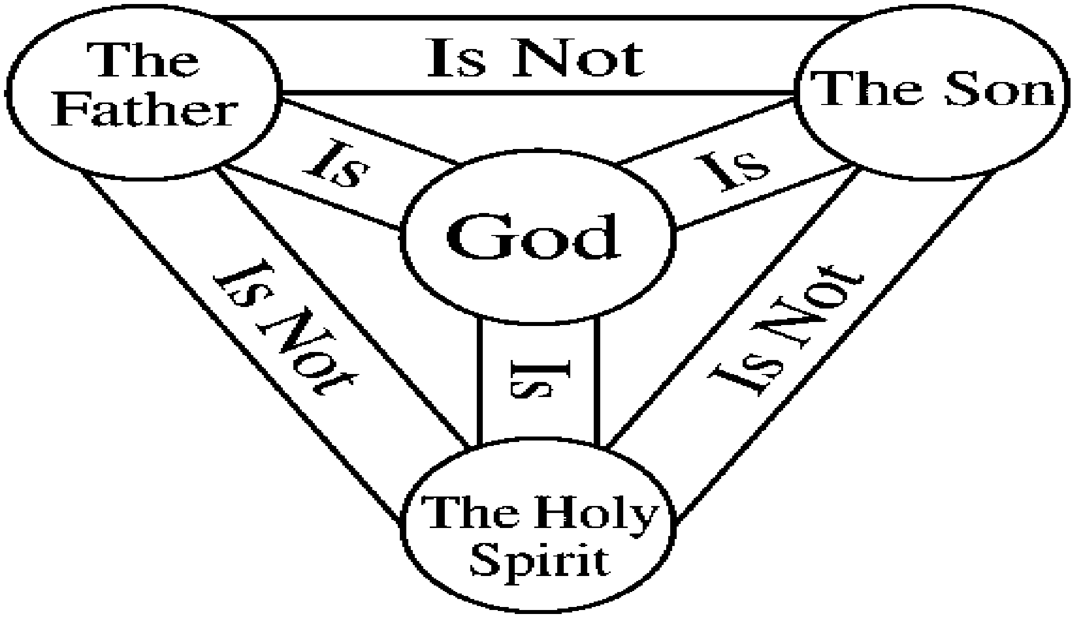
  “And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter

ধূর্ত খ্রিস্টানরা বলে নাকি , এখানে – পবিত্র আত্মাকে বোঝানো হয়েছে।এই ইন্টারপ্রেশন সম্পূর্ণই ভুয়া।কারনটা নিচে দেখুন –

আরেকটা রেফারেন্স দেখুন
গস্পেল অফ জন এর ১৬ অধ্যায়ের ৭ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে –

আমি তোমাদের সত্য কথাটাই বলি।আমি চলে গেলেই তোমাদের সবার জন্যে ভালো হবে।কারণ , আমি না গেলে সেই সাহায্যকারী আসবে না।আর আমি গেলেই সে এখানে আসবে।

ভবিষৎবাণীটি ভাল করে লক্ষ্য করতে পারেন।সেখানে শর্ত , দেওয়া হচ্ছে ঈসা আঃ চলে গেলেই একজন আসবেন।এখানে আবারো সাহায্যকারী বলা হয়েছে।পাদ্রী মশায় এবং অরফিউস বললেন – ইহা নাকি পবিত্র আত্মা।খুবই ভালো।এইবার আসেন জানি – পবিত্র আত্মা জিনিসটা কি।এটা হচ্ছে holy spirit।
http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_spirit
হলি স্পিরিটকে ট্রিনিটির একটা অংশ বলা হয়।http://www.gotquestions.org/Bengali/Bengali-Holy-Spirit.html – এখানে বাঙ্গালী খ্রিস্টানরা ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। পবিত্র আত্মা জিনিসটা ঈশ্বরের কাছাকাছি । এমনকি ঈশ্বরের আরেকরূপ



।

পবিত্র আত্মা সম্পর্কে বাইবেলের ধারনা মতে – পবিত্র আত্মা —

উপরের ছবিটিও উইকি থেকে নেয়া।খ্রিস্টান ব্যাখ্যাকারীরা কিভাবে ব্যাখ্যা করে – যে ওইখানে সাহায্যকারী (Comforter) বলতে পবিত্র আত্মাকে বুঝানো হয়েছে।

ভবিষৎবাণীটি ভাল করে লক্ষ্য করতে পারেন।সেখানে শর্ত , দেওয়া হচ্ছে ঈসা আঃ চলে গেলেই একজন আসবেন।

পবিত্র আত্মা তো ট্রিনিটিরই এক অংশ – তাহলে কেন বলা হল – ঈসা আঃ এর মৃত্যুর পরে পবিত্র আত্মা আসবেন।ঈসা আঃ কে যখন বেপ্টাইজ করা হয় – তখনো পবিত্র আত্মার উপস্থিতির কথা ছিলো।যখন তিনি মায়ের গর্ভে ছিলেন – তখনো পবিত্র আত্মার কথা বলা হয়েছে ...তাহলে কি দাঁড়ালো... — পবিত্র আত্মাতো আগে থেকেই বিদ্যমান।তাহলে , উনার মৃত্যুর পর কেন আসবে?????
এতোগুলি কথার কোন যুক্তিই নেই – কারণ – ওইখানে স্পষ্ট করে বলা আছে – সাহায্যকারী।জোড়া-তালি দিতে আস্ লেতো ভুল হবেই।(অনুবাদটি the King James Version থেকে নেয়া হয়েছে)

সোজা ভাষায় , সাহায্যকারী মেনে নেয়টাই যৌক্তিক।

অন্য রিলিজিয়নে আসি -

- গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন – গস্পেল অফ বুদ্ধর ২১৭ , ২১৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে –
  আনন্দ বুদ্ধকে প্রশ্ন করলেন – হে আশীর্বাদপ্রাপ্ত , আপনি চলে গেলে কে আমাদের পথ দেখাবে?জবাবে গৌতম বুদ্ধ বললেন – আমি পৃথিবীর প্রথম বুদ্ধ নই , এমনকি শেষ বুদ্ধও আমি নই। ভবিষ্যতে আরেকজন বুদ্ধ পৃথিবীতে আসবেন , তিনি পবিত্র , সবার উপরে , আলোক প্রাপ্ত ... ”
- হিন্দুদের কল্কি পুরাণের ২য় অধ্যায়ের ১১ নং মন্ত্রে –
  বিষ্ণুইয়াস নামে এক ব্যাক্তির ঘরে সুমতির গর্ভে , কলিক অবতার জন্মাবে।
  সংস্কৃততে বিষ্ণুইয়াশের অর্থ করলে দাঁড়ায় – বিষ্ণু অর্থ – ঈশ্বর , আর ইয়াস অর্থ – ভৃত্য।যার অর্থ – ঈশ্বরের ভৃত্য।এর আরবি হল – আব্দুল্লাহ – যা মুহাম্মদ সাঃ এর বাবার নাম।সুমতি অর্থ – প্রশান্ত – যার আরবি আমিনা -যিনি নবীর মাতা।সাম্বালা গ্রাম – মানে শান্তির শহর – — মক্কাকে সর্বদা দারুল আমান বলা হত – যার অর্থ শান্তির শহর , কারণ , কাবা ঘরের সামনে যুদ্ধ নিষিদ্ধ।
  একটু পরেই , ১৫ নং মন্ত্রে বলা হয়েছে – তিনি মাধব মাসের দ্বাদশ দিনে জন্মগ্রহণ করবেন।
  – মুহাম্মদ সাঃ রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখে জন্মেছিলেন।
  হিন্দুদের অগ্নির ৬৪ নং মন্ত্রে বলা আছে – ঋষি মায়ের দুধ পাণ করবেন না – আমরা জানি তিনি হালিমার দুধ পাণ করেছিলেন।
  ঐ অংশেরই , অর্থাৎ কল্কি পুরাণের ৫ নংএ উল্লেখ আছে – কল্কিকে চারজন সহযোগীতা করবেন। — মুহাম্মদ সাঃ এর চার সদাসঙ্গী সাহাবীর কথা কে না জানে।উসমান রাঃ , আবু বকর রাঃ , উমর রাঃ এবং আলী রাঃ
  অথর্ববেদের ২০ নং গ্রন্থের ১২৭ নং অনুচ্ছেদের ২ নং মন্ত্রে বলা হয়েছে –
  তিনি হবেন উটে চড়া ঋষি।
  সকল ব্রাহ্মণের উটে চড়া নিষেধ।মুহাম্মদ সাঃ সর্বদাই উটে চড়তেন।
  তিন নং এ বলা হয়েছে – তিনি হবেন মহাঋষি।
  ভবিষ্যৎ পুরাণের ৩য় পর্বের ৩য় খণ্ডের ৫ নং এ উল্লেখ আছে-
  একজন ম্লেচ্ছ আসবে সঙ্গীদের নিয়ে মরুস্থল থেকে।
  পরবর্তীতে , সেই ম্লেচ্ছকে মানব জাতির গর্ব বলা হয়েছে – বিলাসীতে পড়েছিলেন – ম্লেচ্ছ অর্থ বিদেশি।মহানবী সাঃ মরুস্থল থেকেই এসেছেন – তিনি মরুভূমির দেশ আরব থেকে এসেছেন।

এভাবে আরো সারাদিন বলা যায়... সময় স্বল্পতায় বলছি না।

সকল ধর্মই একই সূত্রে গাঁথা।তবে – এখন “অজগরটি ঐ আসছে তেড়ের” মত সেগুলো দিনে দিনে বাতিল হয়ে গিয়েছে।এখন – সর্বশেষ – ইসলাম।

ধর্মের মূল কথা হল – আল্লাহ্‌ একত্ববাদ।

আল্লাহ্‌ , সকল যুগে সকল মানুষের কাছে নবী পাঠিয়েছেন।তবে সকলকে , তার গোত্রের জন্যে।পৃথিবীর সকল ধর্মগ্রন্থেই বলা আছে – আমাকে ঈশ্বর তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্যে পাঠানো হয়েছে(**বিশ্ববাসীর জন্যে নয়**)।এমনকি , ঈসা আঃ (যিশু) কেও শুধুই ইজরায়েলবাসীর জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে –

গস্পেল অফ ম্যাথিউর ১৫ নং অধ্যায়ের ২৪ অনুচ্ছেদে যিশু বলেছেন -
আমাকে পাঠানো হয়েছে , শুধুমাত্র ইসরায়েলবাসীকে পথ প্রদর্শনের জন্যে।

হিন্দু , বৌদ্ধ সব একই।হিন্দু ধর্মও এককালে ভারতবাসীর জন্যে এসেছিলো।কুরআন আসার আগ পর্যন্ত ।কুরআনে এরকমই বলা হয়েছে।বেদের বানী ঈশ্বরেরই ছিলো – কিন্তু , পরবর্তীতে মানুষের হাতে পরিবর্তিত হয়েছে।স্বামী বিবেকানান্দ বলেছিলেন – বেদের ৯৯% ই বিকৃত হয়ে গেছে।১% যা আছে ওইখান থেকে – উদ্ধার করা হইছে এগুলো।
এট দ্যা সেম টাইম – ঈসা আঃ এর উপরে – ইজরায়েলবাসীকে পথ দেখানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।তিনি শুধুই তাঁর সম্প্রদায়কে পথ দেখিয়েছেন – তাঁকে সে সময় যারা মেনে চলেছে – তারা বেহেস্তবাসী।কিন্তু , মুহাম্মদ সাঃ এর আবির্ভাবের পরে সেই ধর্ম বাতিল।কারণ , এখন বিশ্ববাসীর জন্যে এসে গিয়েছে।
মুসা আঃ এর সময়ে মুসা আঃ তাঁর সম্প্রদায়কে পথ দেখিয়েছেন-তাঁকে সে সময়ে যারা মেনে চলেছে – তাঁরা পুরস্কৃত হবে।

বর্তমানে ৮০% মুসলমান সৌদিআরবের বাইরের।

wiki *তে*growth of religion *কিংবা – গুগল এ সার্চ দিয়ে দেখুন —- পৃথিবীতে কোন ধর্মটা সবচেয়ে বেশি বাড়ছে – কনভারটিং এর মাধ্যমে।আপনি হত বুদ্ধি হয়ে যাবেন।উন্নত দেশগুলোতেই এই কনভারসনের হার বেশি…*
http://en.wikipedia.org/wiki/Growth_of_religion
উইকিপিডিয়াতে আছে – গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস এ আছে –
Islam is the world's fastest-growing religion by number of conversions each year
ইসলাম হচ্ছে ধর্ম পরিবর্তনের ভিত্তিতে পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ম

"Although the religion began in Arabia, by 2002 80% of all believers in Islam lived outside the Arab world. In the period 1990–2000, approximately 12.5 million more people converted to Islam than to Christianity"

Guinness World Records 2003. Guinness World Records. 2003. p. 142.

এত কোটি কোটি মানুষ ইসলাম সম্পর্কে জেনেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে।না জেনে নয়।তাই , মুসলিম বন্ধুদের নির্দেশ করছি – ইসলাম সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করুন , বিশ্লেষণ করুন।তাহলেই ভ্রান্ত ধারনা দূর হবে , নতুবা নয়।কারণ কুরআন শরিফের প্রথম আয়াতইতো নাজিল হয়েছিলো – পড় , তোমার প্রভুর নামে।আগামী ১০০ বছরের মধ্যে ইসলাম হবে সবচেয়ে বড় ধর্ম।১৯১০ সালে ২২ কোটি মুসলিম – ২০১০ সালে ১৫৫ কোটিতে এসে ঠেকেছে।

ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন, আর ইসলাম নিয়ে বেশি বেশি জানার চেষ্টা করবেন। আপনি হয়ত, নাও বুঝতে পারেন – কিন্তু, গিনেস বুক রেকর্ডে সংখ্যাটা থাকবে।

অধ্যায় ৭

অভিযোগের ময়নাতদন্ত

অধ্যায় ৭

অভিযোগ পর্ব –

নিচের সহজ কথাগুলো বিশ্লেষণ না করেই , আমার নাস্তিক ভায়েরা নিয়মিত বলে চলেছেন পৃথিবী সমতল।সাধারণ কথাটার এত্তবড় মিনিং বের করলেন ,বিরাট আলোচনা করে বের করলেন – এইখানে বোঝানো হয়েছে পৃথিবী সমতল।অথচ , আরও সহজ কথাটা একটু চিন্তা করে বের করতে পারলেননা।এটা আপনাদের বদ্ধ মানসিকতার পরিচায়ক।
এইভাবেই , খুব সহজেই একটু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় – এদের মিথ্যাচারের চূড়ান্ত নমুনা।আপনার পক্ষে বেশিরভাগ সময়েই এতো বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়।তাই বলে, এদের চলমান মিথ্যাচারের কথা বিশ্বাস করবেন এমনটাও নয়।যখনি এই ধরনের বিভ্রান্তি মূলক কথা ছড়াতে দেখবেন – নিজ বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করবেন।তিন ভাবে বিচার শুরু করবেন –
#যেই আয়াতের কথা বলা হয়েছে – তার অনুবাদ ভালো দেখবেন।কয়েকটি দেখুন।

#তাফসীর দেখুন।

#শাব্দিক অর্থ না দেখে , অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝার চেষ্টা করুন।
যেই আয়াতের কথা বলা হয়েছে , তার রূপক অর্থ বোঝার চেষ্টা করবেন।এর জন্যে ব্যাখ্যা দেখবেন মুসলিমরা কি বলছে – উন্মুক্ত মন নিয়ে শুনুন।
#ঐ আয়াতের আগের কমসেকম ৫ আয়াত , এবং পরের ৫ আয়াত দেখবেন।তাহলে , অর্থ অনেকটাই ক্লিয়ার হবে।এছাড়া , সন্দেহ দূর না হলে পুরো সূরা পড়ে দেখবেন।সূরা তওবা এর অন্যতম উদাহরণ।পুরো সূরা না পড়লে কিছুই বুঝবেন না– যেমন জামাল , রহিম কে মার দিলো।এখন আপনি যদি এইটা শুনেই – জামালকে মারতে দৌড় দেন তাহলে ভুল করবেন।আপনাকে শুনতে হবে – এর আগে রহিম কি করেছে।ভালো করে দেখলে দেখবেন – রহিম অনেক খারাপ কাজ করেছে দেখেই জামাল রহিমকে মেরেছে।অর্বাচীনদের মত অ-দূরদৃষ্টি থাকলে হবে না।
#আমরা নিজেকে বিজ্ঞানের উৎকর্ষের চূড়ান্ত সীমায় মনে করি – এই ধারনা পরিহার করুন।বর্তমান বিজ্ঞান দিয়ে আমরা সব ব্যাখ্যা করে ফেলবো ভাবলে – বিষয়টাকে বোকামি বলা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।বর্তমান বিজ্ঞান নিয়ে রেভুলশন টা শুরু হয়েছে – মাত্র ১০০ বছর আগে।যেমন ,১৯০০ সালে মহাবিশ্ব বিগ ব্যাং এর মাধ্যমে এসেছে এই কথাটি ব্যাখ্যা করতে গেলে আপনি হতাশ হতেন।কারণ , সে সময়ে এটি আবিষ্কার হয়নি।তেমনিভাবে, কিছু জিনিসে এখনো আপনি হতাশ হতে পারেন।তাই বলে আশা হারাবেন না।৯৯% যেখানে প্রমাণিত – সেখানে ১% অপ্রমাণিত থাকলেও বুঝে নিতে হবে – অচিরেই সেটি প্রমাণিত হবে।

#সোজা কথায় – খালি ইসলাম নিয়ে প্রশ্ন দেখেই – নিজ মনে উত্তর খুঁজবেন না। একটু পড়াশোনা করুন।ধরে ফেলবেন– প্রোপাগান্ডা টেকনিক!

অধ্যায় ৮

বিছানা কিংবা কার্পেট কিংবা প্রসারিত

অভিযোগ পর্ব –

সূরা নাবা'র ২৭ এবং ২৮ নং আয়াতে আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন -

নিশ্চয় তারা হিসাব-নিকাশ আশা করত না। এবং আমার আয়াতসমূহে পুরোপুরি মিথ্যারোপ করত।

এখানেও এমনটি হয়েছে – নাস্তিক এবং ইসলাম-বিদ্বেষীরা সবসময় আয়াতের উপর মিথ্যারোপ করে আয়াতগুলি ভুল বলার চেষ্টা করে।কিন্তু , একটু শুদ্ধ মন নিয়ে চিন্তা করলেই আয়াতের নিহিতার্থ বেরিয়ে আসে।যা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

এইবার আসি অভিযোগ পর্বে –

১-পৃথিবী কার্পেট বা বিছানা বলা হয়েছে – কুরআনের ১৫:১৯, ২০:৫৩, ৪৩:১০, ৫০:৭, ৫১:৪৮, ৭১:১৯, ৭৮:৬, ৭৯:৩০, ২:২২!!!!

আর পৃথিবী -- আমরা তাকে প্রসারিত করেছি, আর তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা, আর তাতে উৎপন্ন করেছি হরেক রকমের জিনিস সু-পরিমিতভাবে। (১৫:১৯)

যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে তোমাদের জন্যে করেছেন পথ, যাতে তোমরা গন্তব্য-স্থলে পৌঁছতে পার। (৪৩:১০)

আর পৃথিবী -- তাকে আমরা প্রসারিত করেছি আর তাতে স্থাপন করেছি পাহাড়-পর্বত, আর তাতে আমরা জন্মিয়াছি হরেক রকমের মনোরম বস্তু – (৫০:৭)

আর পৃথিবী -- আমরা একে বিছিয়ে দিয়েছি, কাজেই কত সুন্দর এই বিস্তারকারী!(৫১:৪৮)

"আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য পৃথিবীটাকে করেছেন সুবিস্তৃত "যেন তোমরা তাতে চলতে পার প্রশস্ত পথে।''(৭১:১৯- ২০)

আমরা কি পৃথিবীটাকে পাতানো-বিছানা-রূপে বানাই নি, আর পাহাড়-পর্বতকে খুটিরূপে? (৭৮:৬-৭)

আর পৃথিবী -- এর পরে তাকে প্রসারিত করেছেন।এর থেকে তিনি বের করেছেন তার জল, আর তার চারণভূমি।

(৭৯:৩০-৩১)

যে পবিত্র-সত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না। বস্তুত: এসব তোমরা জান।(২:২২)

জবাব:

হ্যাঁ অবশ্যই বলা হয়েছে।আপনি কেন বলা হয়েছে সে ব্যাপারটা ঠিক ধরে উঠতে পারেননি।আসুন দেখি– কেন বলা হয়েছে?

প্রথমত, কোরআনের কোথাও পৃথিবীর আকারকে সমতল বলা হয়নি। কোরআনের বিরুদ্ধে অনেক অপপ্রচারের মধ্যে এটিও একটি। দ্বিতীয়ত, কেউ কি অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে কোরআনের পৃথিবীকে সমতল বানাতে পারবেন? উত্তর হচ্ছে, মোটেও না। নীচের আয়াতগুলো দিয়ে কোরআনের পৃথিবীকে সমতল বানানোর চেষ্টা করা হয়।

২০:৫৩ –তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে শয্যা করেছেন এবং তাতে চলার পথ করেছেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তা দ্বারা আমি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি।

৫১:৪৮ - আমি ভূমিকে বিছিয়েছি। আমি কত সুন্দরভাবেই না বিছাতে সক্ষম।

৭১.১৯: আল্লাহ তা’আলা তোমাদের জন্যে ভূমিকে করেছেন বিছানা।যাতে তোমরা চলাফেরা কর প্রশস্ত পথে।

আপনি প্রতিটা ক্ষেত্রেই দেখবেন

তাদের যুক্তি হচ্ছে, কুরআনে যেহেতু পৃথিবীকে বেড ও কার্পেটের সাথে তুলনা করা হয়েছে সেহেতু কুরআনে পৃথিবীর আকারকে সমতল মনে করা হয়েছে! কিন্তু এই ধরণের যুক্তিকে কু-যুক্তি ছাড়া অন্যকিছু বলা যেতে পারে না। কারণগুলো নিম্নরূপ:

“কোরআনের এই আয়াতগুলোতে ‘Shape’ ও ‘Flat’ শব্দ দুটির কোনটিই ব্যবহার করা হয়নি। সুতরাং আয়াতগুলোতে আসলে কি বুঝাতে চাওয়া হয়েছে সেটাই বিবেচ্য বিষয়। প্রথমত, কিছু অনুবাদক ‘কার্পেট’ ও ‘বেড’ শব্দ দুটি ব্যবহারই করেননি। দ্বিতীয়ত, কার্পে-টিং করতে হলে রাস্তা-ঘাট সরল রেখার মতো সমতল হতেই হবে, এমন আজগুবি কথা কে বলেছে! পাহাড়ের উপর দিয়ে যে রাস্তা তৈরি করা হয় সেটি তো বক্রাকার বা অর্ধবৃত্তাকার। সেই অর্ধবৃত্তাকার রাস্তায় কি কার্পেটিং করা হয় না? ফলে গোলাকার বস্তুর উপর কার্পেট বিছানো যাবে না কেন?কেস ডিসমিস।

রাস্তার উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে আসলাম !

তাহলে – রাস্তা কি সমতল হবে?নাহ , রাস্তার কথা শুনলেই সমতল ভাবা বোকামি।আগে জানতে হবে– রাস্তাটা কিসের উপরে।রাস্তাটা-তো পাহাড়ের উপর দিয়েও হতে পারে।সেক্ষেত্রে– রাস্তা বৃত্তাকার!

কিন্তু , সবাই শুধু বলবে – রাস্তা।

ঘরের মেঝেতে মানুষ কার্পেট বিছায় মূলত: কিছু কারণে: মেঝে খসখসে হলে; মেঝে ঠাণ্ডা হলে; মেঝের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য; ইত্যাদি। রাস্তায় যানবাহন চলাচলের সুবিধার জন্য যেমন কার্পেটিং করা হয়, পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগকেও মানুষের বসবাস ও ফসল ফলানোর উপযোগী করার জন্য কার্পেটিং করা হয়েছে। পৃথিবীর মধ্যভাগ বসবাস ও ফসল ফলানোর উপযোগী নয়। বেডের

উপর মানুষ যেমন বিশ্রাম নিতে পারে তেমনি পৃথিবীর পৃষ্ঠেও বিশ্রাম নিতেপারে। আর এ কারণেই পৃথিবীকে বেডের সাথে তুলনা করা হয়েছে, পৃথিবীর মধ্যভাগ বিশ্রাম-যোগ্য নয়। অতএব প্রচলিত বেডের আকার সমতল না হয়ে অন্য কিছু হলেও সেই বেডের সাথেই হয়তো তুলনা করা হতো। তাছাড়া স্ফেরিক্যাল বেদও তো অসম্ভব কিছুনয়। পুরো পৃথিবীকে একটি বিশাল স্ফেরিক্যাল বেড ধরে নেয়াটা অযৌক্তিক হবে কেন? আয়াতগুলোতে কিছু শব্দ যেমন Bed, Carpet, Spread out, Expanse ইত্যাদি দেখেই পৃথিবীর আকারকে সমতল ধরে নেয়া হয়েছে! কিন্তু Bed, Carpet, Spread out, Expanse ইত্যাদি বলতে যে সমতল হতেই হবে তার কোন যৌক্তিকতা নেই। কোরআনের কিছু আয়াত পড়ে অনুমান করা যায় যে, পৃথিবীটা বর্তমান অবস্থায় হুট করে আসেনি। ফলে 'এক্সপ্যান্ড' ও 'স্প্রেড' শব্দ দুটি কোরআনের জন্য অর্থবহ।"

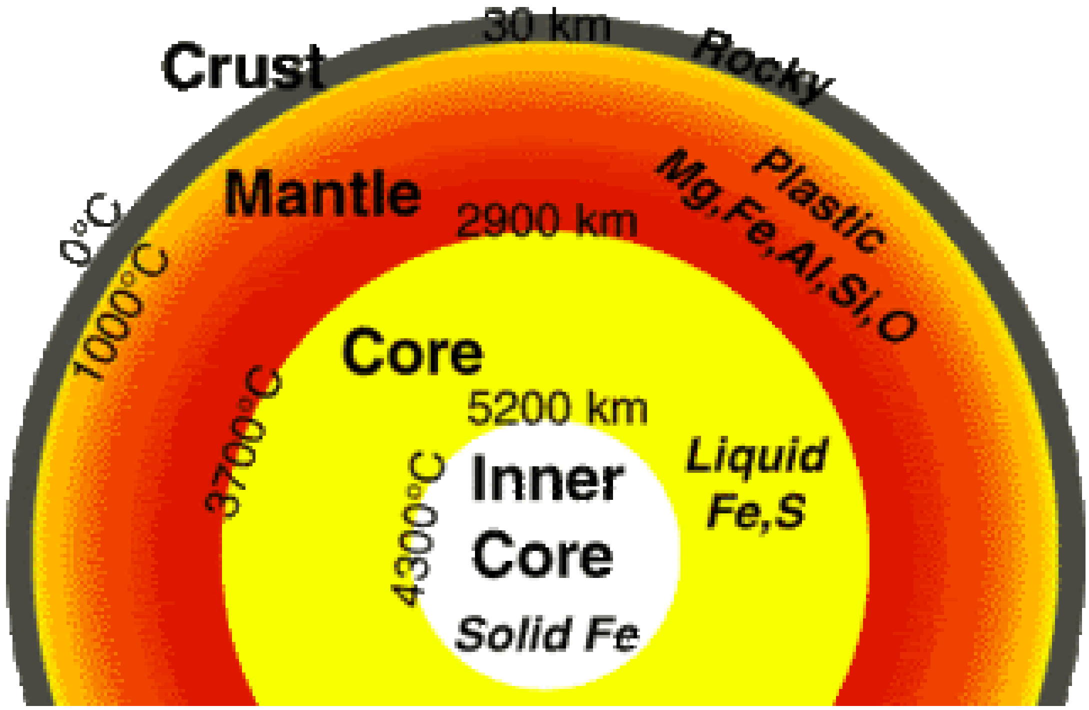
এই প্যারাটুকু – www.signofquran.com থেকে নেয়া হয়েছে...

এইবার আলোচনায় আসি – বিছানা কেন বলা হয়েছে – আমাদের পৃথিবী বসবাসযোগ্য হবার মূল এবং প্রধান কারণ হল – পৃথিবীর উপরিভাগ –

কুরআনে বিছানা বা কার্পেট ব্যাবহার করা হয়েছে।বিছানা বলতে – কখনও চার-পা স্ট্যান্ড এর কথা বলা হয়নি।আসলে – এখানে কার্পেট কিংবা বিছানো জাতীয় কিছু বলা হয়েছে।কথাটা আপনাদের কাছে অবৈজ্ঞানিক লাগলেও যে কত বড় ঘোরতর বৈজ্ঞানিক তা দেখানো হল।বিছানা বলা হল কেন ব্যাপারটা বুঝতে হলে আপনাকে প্রথমে জানতে হবে – বিজ্ঞান সম্পর্কে অল্প জানলে মানুষ নাস্তিক হয়, আর বেশি জানলে আস্তিক হয় – ফ্রান্সিস বেকনের এই অমর উক্তিটি। তারপর , বেশি জানার জন্যে – উইকিতে যেতে হবে – পড়াশোনা শুরু করতে হবে (ভূপৃষ্ঠ) ক্রাস্ট নিয়ে।

বিছানা/কার্পেট এর সংজ্ঞা কি?--শক্ত , এবড়োখেবড়ো জায়গার উপরে আরামদায়ক কোন আস্তরণ।যার উপরে থেকে আমরা আরাম অনুভব করতে পারি।

এইবার পৃথিবীর উপরে সার্চলাইট ফেলি...আপনি জানেন কি?পৃথিবীরও কয়েকটি লেয়ারে বিভক্ত।এই লেয়ার গুলির মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে – নিচে লেয়ারগুলি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি।নিচে পৃথিবীর নিম্নভাগের একটা ছবি দেখানো হল -



ছবিঃপৃথিবীর লেয়ার...

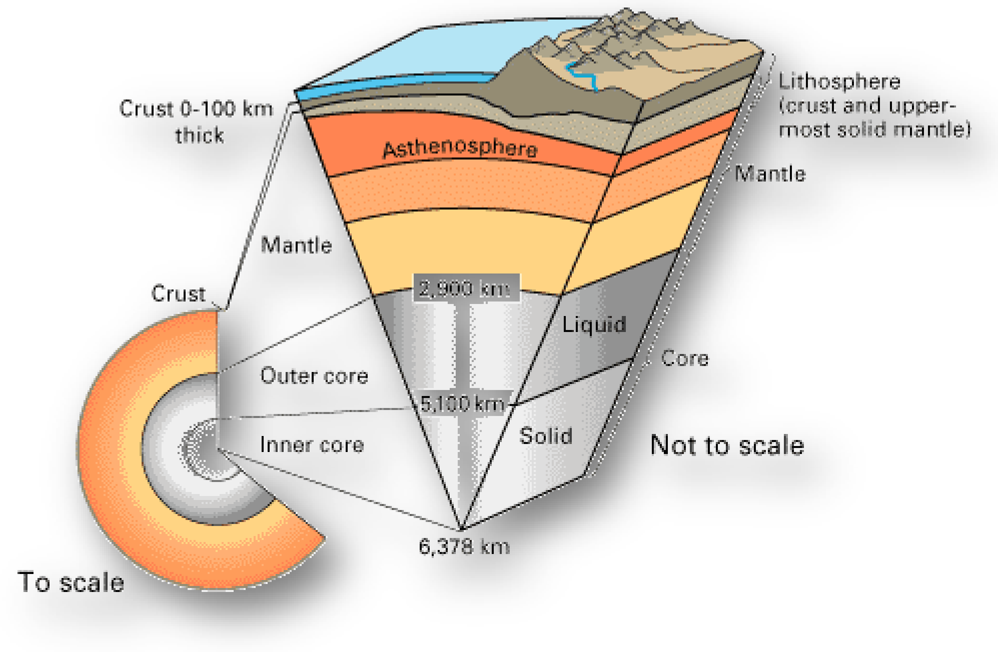
পৃথিবীর লেয়ারের মধ্যে সবচেয়ে উপরে হচ্ছে– ক্রাস্ট-http://en.wikipedia.org/wiki/Crust_%28geology%29)।এটি হচ্ছে সবচেয়ে পাতলা আস্তরণ।এর আয়তন হচ্ছে মাত্র -৩০ কিমি।এটি হচ্ছে সবচেয়ে পাতলা আস্তরণ।এই আস্তরণটির উপরেই আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি।এই আস্তরণটি মানুষের জন্যে এতোটাই উপযুক্ত– তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব হওয়ার পিছনে এই উপরিতল – যা ক্রাস্ট নামে পরিচিত তার ভূমিকা বলে শেষ করা যাবে না।

আপনি আমি এই ক্রাস্টের উপরেই দাঁড়িয়ে আছি– আপনি জানেন – আমরা যার উপরে দাঁড়িয়ে আছি তার আয়তন মাত্র– ৩০ কিমি।আর এই ক্রাস্টের নিচেই রয়েছে– ম্যান্টল। যা সর্বমোট ২৯০০ কিমি পুরু।এবং এটি এতই ভয়াবহ যে – ঐ স্তরের তাপমাত্রা সম্পর্কে -

উইকিপিডিয়াতে আছে - In the mantle, temperatures range between 500 to 900 °C

এছাড়াও , ম্যান্টল হচ্ছে পাথুরে , গলিত এবং অতিরিক্ত তাপমাত্রা।এটির তাপমাত্রা – ৫০০ থেকে ৯০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।সম্পূর্ণভাবে বসবাস অনুপযোগী। যেখানে , ক্রাস্টের এ ধরনের কোন উচ্চ তাপমাত্রাই নেই।ক্রাস্টের এই পাতলা আবরণ মাত্র – ৩০ কিমি।এর পর থেকেই এই দানবীয় ম্যান্টল।চিন্তা করুন ক্রাস্ট ছাড়া পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব

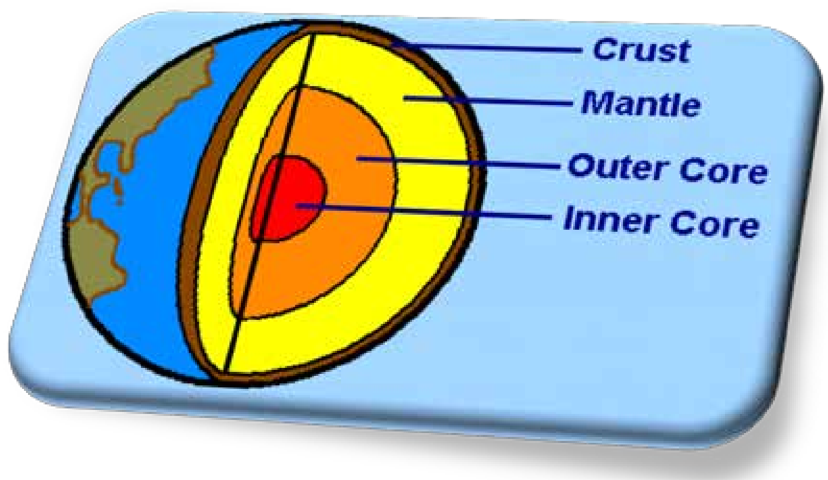
নয়।যেখানে পুরো পৃথিবীতে ক্রাস্ট এর মাত্রা ১%



সমুদ্রের তলদেশেও এই ক্রাস্ট রয়েছে।

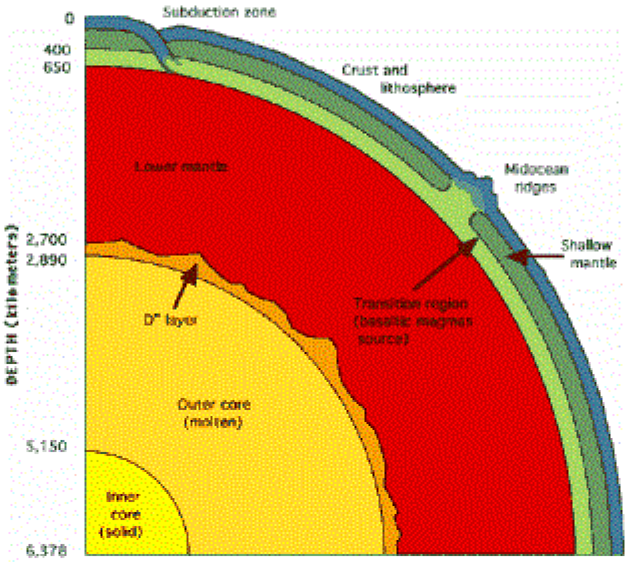
এরপর , আবার ম্যান্টলের নিচে রয়েছে–আউটার কোর। যার তাপমাত্রা প্রায় – ৩৭০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবং এটি পুরু ২৮৯০ কিমি।অর্থাৎ ক্রাস্ট থেকে আপনি যত নিচে নামবেন – তাপমাত্রা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকবে...

এরপর , পৃথিবীর কেন্দ্রে রয়েছে – ইনার কোর।এটি ১২২০ কিমি পুরু।এবং এর তাপমাত্রা – ৫৪৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।এই অংশটার তাপমাত্রা সূর্যপৃষ্ঠের তাপমাত্রার প্রায় সমান।



ভূপৃষ্ঠ থেকে যত নিচে নামবেন ততই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে।এর আনুপাতিক হার– উইকিতে আছে –
The temperature of the crust increases with depth, reaching values typically in the range from about 200 °C (392 °F) to 400 °C (752 °F) at the boundary with the underlying mantle.

ম্যান্টল এর কাছে যত যাওয়া যায় – তত তা পাথুরে এবং উত্তপ্ত।
The temperature increases by as much as 30 °C (about 50 °F) for every kilometer locally in the upper part of the crust.



আমি ভূমিকে বিছিয়েছি। আমি কত সুন্দরভাবেই না বিছাতে সক্ষম।৫১:৪৮

এইবার আপনাদের কাছে প্রশ্ন –

আপনি যদি সৃষ্টিকর্তা হতেন এবং মানুষ আপনার সৃষ্টি হত– তাহলে মানুষকে সহজ ভাষায় ক্রাস্টের গুরুত্ব বুঝানোর জন্যে আপনি কি শব্দ ব্যাবহার করতেন।সহজ ভাষায় – পাতলা আস্তরণ – আরও সহজ ভাষায় কার্পেট বা ঐ জাতীয় বিছানা।আরবিতে এখানে ফরাশ সহ অন্যান্য শব্দ ব্যাবহার হয়েছে।

এটাই হবে সবচেয়ে পারফেক্ট শব্দ –

কারণ , ভূপৃষ্ঠ খুবই পাতলা , মাত্র ৩০ কিমি।যা মাত্র পৃথিবীর ১%।যেখানে সর্বমোট ৬৩৭৮ কিমি।কার্পেট বিছানাও পাতলা আস্তরণ।

ক্রাস্ট বা ভূপৃষ্ঠের নিচে – যতই যাবেন ততই তাপমাত্রা ভয়ানক ভাবে বাড়তে থাকবে।এমনকি , কেন্দ্রে চলে গেলে তাপমাত্রা সূর্যের কাছাকাছি প্রায় ৫৪৩০ ডিগ্রিতে পৌঁছে যাবে।কার্পেট বিছানাও আরামদায়ক করার জন্যেই বিছানো হয় , যেমনটা ক্রাস্ট সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীকে আরামদায়ক করার জন্য।যাতে আমরা চলাফেরা করতে পারি সহজে– কুরআনে এভাবেই বলা হয়েছে –

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে ভূমিকে করেছেন বিছানা।

যাতে তোমরা চলাফেরা কর প্রশস্ত পথে।(সূরা নুহ ১৯-২০)

স্পষ্টই বলা হয়েছে – এই বিছানা বিছানো হয়েছে – যাতে আমরা চলাফেরা করতে পারি।ভূপৃষ্ঠের গুরুত্ব এটাই।এছাড়া আপনি সর্বদাই দেখবেন বলা হয়েছে – ভূমিকে বিছানা করা হয়েছে – পৃথিবীকে নয়।আর ভূমি হচ্ছে পৃথিবীর মাত্র ১% যা

উপরের অংশ এবং যাকে আমরা ভূপৃষ্ঠ (ক্রাস্ট) বলি– যাকে বিছানা বা কার্পেট জাতীয় কিছুর সাথেই তুলনা করা কেন যৌক্তিক তা উপরেই দেখিয়েছি।

আর , পৃথিবী আর ভূমি-এই অর্থের মধ্যে যে কয়েক লক্ষ আলোকবর্ষ দূরত্ব রয়েছে– তা অর্বাচীন সমালোচক-গন বুঝেন না!!!

তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব, তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে।(67:15)

এই আয়াত স্পষ্টই বলছে – পৃথিবীর উপরের ভূস্তরের কথা।কারণ , এখানে – তোমরা এর কাঁধে !! অর্থাৎ - পৃথিবীর উপরিতলে অবস্থান কর।

ভূপৃষ্ঠের নিম্নে – লৌহ , নিকেল , পাথুরে , লাভা ইত্যাদি , যেখানে ক্রাস্ট বসবাস উপযোগী।কার্পেট , বিছানাও এগুলো একই উদ্দেশ্যে বিছানো হয়lএবড়ো- থেবড়ো , অতিরিক্ত তাপমাত্রা ইত্যাদি সমস্যা থেকেই বাঁচতে কার্পেট বা বিছানা বিছানো হয়।

আপনি যদি বিছানা বা কার্পেট সংক্রান্ত প্রতিটা আয়াত দেখেন – তাহলে দেখবেন – ভূমিকে কার্পেট আকারে বিছানো হয়েছে – এই কথা বলার সাথে সাথেই বলা হয় যাতে তোমরা সহজে চলাফেরা করতে পারো – ফসল উৎপন্ন করতে পারো।যারা আইওয়াশে বিশ্বাসী তারা কখনই পরের অংশগুলি তুলে ধরে না –

নিচে দেখুন আয়াতের নমুনা –

আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালার ভার স্থাপন করেছি এবং তাতে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদগত করেছি।(৫০/৭)

এইখান থেকে আপনি স্পষ্টই বুঝতে পারেন যে – এখানে পৃথিবীর উপরিতলকেই বুঝানো হচ্ছে – যে ক্রাস্টের কল্যাণেই আমরা চাষবাস করতে পারি।এছাড়াও , ক্রাস্টের উপরে পাহাড়-পর্বত থাকায় – পৃথিবীতে স্টেবিলিটি এসেছে।

আরেক আয়াতে - আমি ভূমিকে বিছিয়েছি। আমি কত সুন্দরভাবেই না বিছাতে সক্ষম।(৫১/৪৮)

পৃথিবীর উপরিতল হচ্ছে সবচেয়ে পারফেক্ট প্রাণের উদ্ভবের উপযোগী।অন্য কোন গ্রহে – এতো পারফেক্ট কোন উপরিতল নেই – যেখানে জীবের উদ্ভব হয় , চাষবাস করা যায়।

আরেক আয়াতে - আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে ভূমিকে করেছেন বিছানা।যাতে তোমরা চলাফেরা কর প্রশস্ত পথে।(৭১/১৯-২০)

নাস্তিকরা খালি প্রথম অংশই বলে – শেষাংশ বলে না।কারণ , শেষাংশ বললেই –চলাফেরা করার কথা থেকেই মানুষ বুঝে যাবে যে এখানে পৃথিবীর উপরিতলকে বুঝানো হয়েছে।

এর উপরে বড় কথা – আমরা কিভাবে ক্রাস্ট সম্পর্কে আন্দাজ করেছি – তা নিম্নের আয়াত থেকে বোঝা যায় –

আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা।(৭৮/৬)

জহুরুল হক অনুবাদ করেছেন - আমরা কি পৃথিবীটাকে পাতানো-বিছানা-রূপে বানাই নি।(৭৮/৬)

পাতানো কিসের উপরে হয় – কোন কঠিন বা বসবাসের অনুপযোগী স্থান এর উপরেই হয়। তেমনি পৃথিবীর ম্যান্টলের উপরে পৃথিবীর উপরিতল ক্রাস্ট পাতানো অবস্থায় রয়েছে।

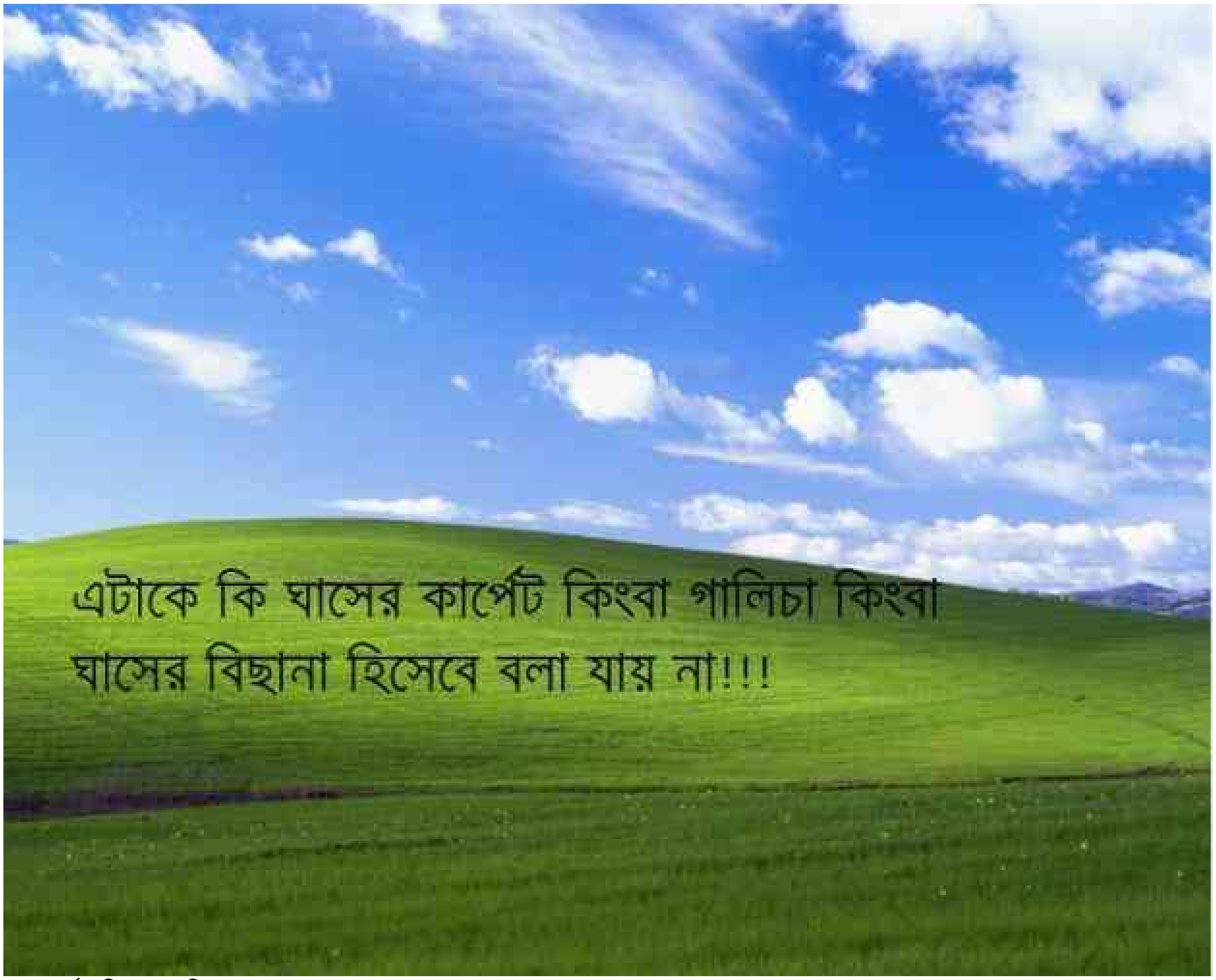
সূরা নাবায় ৬ ও ৭ এ তাই বলা হয়েছে – "আমি কি ভূমিকে বিছানা করিনি , এবং পর্বতমালাকে পেরেক।"

এখান থেকেও স্পষ্ট যে সেই বিছানা বলতে ক্রাস্ট বোঝানো হয়েছে।কারণ , ক্রাস্টের উপরেই পাহাড়-পর্বত অবস্থিত।যার– রুট ক্রাস্টের অনেক নিচ পর্যন্ত বিস্তৃত।এজন্যই পেরেক বলা হয়েছে।

কুরআনে বলা হয়েছে – পৃথিবী জুড়ে কার্পেট বা বিছানা বিস্তৃত করা হয়েছে?

এখানেই – আপনাদের সমস্যা।পৃথিবীকে যে গোলাকার এবং ঘূর্ণায়মান বলা হয়েছে – সেটা আমি প্রমাণ করেছি – উপরে সর্বমোট সাতভাবে।
মানুষ চিন্তার সীমাবদ্ধতায় ভুগে।যা দেখে শুধুই তার মধ্যে চিন্তা করে।ক্ষুদ্র গণ্ডি দিয়ে সবকিছু বিচার করলে চলে না...কার্পেট কি খালি সমতলেই বিছানো হয়।না ...

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশিবার দেখা " ব্লিস" ছবিটা দেখুন –



- কার্পেট বিছানো কি অসম্ভব!!!!

আরও মনে করুন , ধরুন , পুরো পৃথিবীকে আমরা একটা কার্পেট দিয়ে পুরোপুরি ঢেকে দেবো।তাহলে কি হবে– কার্পেটটা তো গোলাকারই হবে। তাই নয় কি।কার্পেট পরের কথা,পিচ-ঢালা রাস্তা দিয়েই তো আমরা পৃথিবী পুরো ঢেকে দিয়েছি।পিচ –ঢালা পথটা কি গোলাকার নয়।বদ্ধ মন নিয়ে নয় , মুক্ত মনে চিন্তা করুন।ভালো করে ভাবলেই ব্যাপারটা ধরতে পারবেন।

কার্পেটিং করতে হলে রাস্তা-ঘাট সরল রেখার মতো সমতল হতেই হবে, এমন আজগুবি কথা কে বলেছে! পাহাড়ের উপর দিয়ে যে রাস্তা তৈরি করা হয় সেটি তো বক্রাকার বা অর্ধবৃত্তাকার। সেই অর্ধবৃত্তাকার রাস্তায় কি কার্পেটিং করা হয় না? ফলে গোলাকার বস্তুর উপর কার্পেট বিছানো যাবে না কেন?কেস ডিসমিস।

ধরুন আমি বললাম - রাস্তার উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে আসলাম !

তাহলে – রাস্তা কি সমতল হবে?নাহ , রাস্তার কথা শুনলেই সমতল ভাবা বোকামি।আগে জানতে হবে– রাস্তাটা কিসের উপরে।রাস্তাটা-তো পাহাড়ের উপর দিয়েও হতে পারে।সেক্ষেত্রে– রাস্তা বৃত্তাকার!

তিনিই মহান আল্লাহ যিনি পৃথিবীকে আবাস যোগ্য করেছেন (সূরা গাফের ৪০ : ৬৪)

এতক্ষণে হয়তো – বিস্তারিত ভাবে বুঝাতে পারলাম- কেন ভূপৃষ্ঠকে বা ক্রাস্টের সাথে কেন বেড , বা কারপেটকে তুলনা করা হয়েছে।

ভুল ধরতে গিয়ে , আবার প্রমাণিত হল – এইগুলি নিয়ে যারা সমালোচনা করে তারা ঠিকই এগুলি জানে কিংবা জানে না– না জেনেই বড়াই করে থাকে।তাদের ভুল-ভাল কথা আর কত শুনবেন।মিথ্যার বেসাতি দিয়েই , এদের তাসের ঘর।এরপরও , যারা এই ধরনের ভ্রান্তি আড়ম্বরপূর্ণ গলায় প্রচার করে তাদের কাছে থেকে পরামর্শ নিবেন কিনা– সেটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যাপার।তিক্ত ফলাফলও আপনাকে বহন করতে হবে...

এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে – সূরা আনকাবুতের , ৪৩ নং আয়াতের -

এ সকল উদাহরণ আমি মানুষের জন্যে দেই; কিন্তু জ্ঞানীরাই তা বোঝে।

এই জ্ঞান বলতে – ক্যালটেকের কিংবা হারভাডের প্রফেসর কিংবা সার্টিফিকেট নয় – এই জ্ঞান ধর্মগ্রন্থ অনুধাবন করার জ্ঞান।আপনি খালি চোখে দেখে বারেবারেই ভুল – করবেন , তাই অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে দেখতে হবে।

আর আমি দুনিয়ার সকল ইসলাম-বিদ্বেষীদের ওপেন চ্যালেঞ্জ জানালাম – যদি একটা আয়াতও দেখাতে পারেন – যেখানে বলা হচ্ছে ---

পৃথিবী সমতল এবং স্থির!!!

শুধু মাত্র , সমতল কিংবা ফ্ল্যাট এই ধরনের শব্দ দেখান যেখানে বলা হচ্ছে– পৃথিবী সমতল।আপনি সারাজীবন কুরআন পড়েও তা বের করতে পারবেন না।

ইটস অ্যা ওয়ান মিলিয়ন ডলার চ্যালেঞ্জ।

বের করে দেখাতে পারলে – আমি এই মুহূর্তে নাস্তিক হয়ে যাবো।কিন্তু , আপনি কখনই দেখাতে পারবেন না– কারণ , কুরআনে এই ধরনের কোন কথাই নেই।বরং , আকার ইঙ্গিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে– পৃথিবী সমতল নয় বরং স্ফেরিকাল এবং ঘূর্ণায়মান।

৬৬৬৬ আয়াতেও এমনকি দশ লাখ হাদিসেও একবারও বলা হয়নি – পৃথিবী সমতল।এটা কি নির্দেশ করে?তখন সমগ্র দুনিয়ার মানুষ জানতো যে – পৃথিবী সমতল।মহানবী যদি বানিয়েই লিখতেন – তাহলে – অবশ্যই বারেবারে সমতল বলতেন।কিন্তু , তাঁর রেখে যাওয়া কুরআন বলছে পৃথিবী গোলাকার এবং ঘূর্ণায়মান। এটা কি প্রমাণ করে না– এটা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে।

পয়েন্ট , পয়েন্ট খেলা –

এবার বিছানা বা কারপেট বলা সবগুলি আয়াত আপনাদের সামনে হাজির করি - আয়াতগুলি দেখি–

(১)–তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে শয্যা করেছেন **এবং তাতে চলার পথ করেছেন** আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং **তা দ্বারা আমি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি২০:৫৩**

(২)আর পৃথিবী -- আমরা তাকে প্রসারিত করেছি, আর তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা, আর তাতে উৎপন্ন করেছি হরেক রকমের জিনিস সু-পরিমিতভাবে। (১৫:১৯)

(৩)যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে তোমাদের জন্যে করেছেন পথ, যাতে তোমরা গন্তব্য-স্থলে পৌঁছতে পার। (৪৩:১০)

(৪)আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালার ভার স্থাপন করেছি এবং**তাতে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদগত করেছি। (৫০:৭)**

(৫)আমি ভূমিকে বিছিয়েছি। **আমি কত সুন্দরভাবেই না বিছাতে সক্ষম।৫১:৪৮**

(৬) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে ভূমিকে করেছেন বিছানা।**যাতে তোমরা চলাফেরা কর প্রশস্ত পথে। ৭১:১৯–২০**

(৭)আমরা কি পৃথিবীটাকে **পাতানো**-বিছানা-রূপে বানাই নি, আর **পাহাড়-পর্বতকে খুটিরূপে?**(৭৮:৬-৭)

(৮)সূরা নুহ ১৯-২০ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে **ভূমিকে** করেছেন বিছানা। যাতে **তোমরা চলাফেরা কর প্রশস্ত পথে।**

(৯)তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে **সুগম** করেছেন, অতএব, **তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর**এবং তাঁর দেয়া **রিযিক আহার** কর। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে।(৬৭:১৫)

(১০)আর পৃথিবী -- এর পরে তাকে প্রসারিত করেছেন।এর থেকে**তিনি বের করেছেন তার জল, আর তার চারণভূমি।**

(৭৯:৩০-৩১)

(১১)যে পবিত্র-সত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে **তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে**অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না। বস্তুত: এসব তোমরা জান।(২:২২)

(১২)আল্লাহ **সপ্তা-কাশ** সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও **সেই পরিমাণে,** (৬৫:১২)

এবার বিছানা বা কারপেট বলা সবগুলি আয়াত আপনাদের সামনে হাজির করি - আয়াতগুলি দেখি –

(১)–তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে শয্যা করেছেন এবং **তাতে চলার পথ করেছেন,** আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং **তা দ্বারা আমি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি।২০:৫৩**

(২)আর পৃথিবী -- আমরা তাকে প্রসারিত করেছি, আর তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা, আর তাতে উৎপন্ন করেছি হরেক রকমের জিনিস সুপরিমিতভাবে। (১৫:১৯)

(৩)যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে তোমাদের জন্যে করেছেন পথ, যাতে তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার। (৪৩:১০)

(৪)আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালার ভার স্থাপন করেছি এবং **তাতে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদগত করেছি। (৫০৭)**

(৫)আমি ভূমিকে বিছিয়েছি। **আমি কত সুন্দরভাবেই না বিছাতে সক্ষম। ৫১:৪৮**

(৬) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে ভূমিকে করেছেন বিছানা।**যাতে তোমরা চলাফেরা কর প্রশস্ত পথে। ৭১:১৯-২০**

(৭)আমরা কি পৃথিবীটাকে **পাতানো**-বিছানারূপে বানাই নি, আর **পাহাড়-পর্বতকে খুঁটিরূপে?** (৭৮:৬-৭)

(৮)সূরা নূহ ১৯-২০ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে **ভূমিকে** করেছেন বিছানা। যাতে **তোমরা চলাফেরা কর প্রশস্ত পথে।**

(৯)তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে **সুগম** করেছেন, অতএব, **তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর** এবং তাঁর দেয়া **রিযিক আহার** কর। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে।(৬৭:১৫)

(১০)আর পৃথিবী -- এর পরে তাকে প্রসারিত করেছেন।এর থেকে **তিনি বের করেছেন তার জল, আর তার চারণভূমি।**

(৭৯:৩০-৩১)

(১১)যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে **তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে।** অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না। বস্তুতঃ এসব তোমরা জান।(২:২২)

(১২)আল্লাহ **সপ্তাকাশ** সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও **সেই পরিমাণে,** (৬৫:১২)

উপরে – যেসকল আয়াত আপনাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে সেই আয়াতগুলি সব একসাথে হাজির করলাম।এইবার আপনারা খুব ভাল করে আয়াতগুলির দিকে খেয়াল করে দেখুন–

আল্লাহ্ এইসব আয়াতগুলিতে মোটেই পৃথিবীকে সমতল বলার চেষ্টা করেননি। এখানে সুস্পষ্টভাবেই পৃথিবীর উপরিতলকে বোঝানো হচ্ছে।লাল মার্ক করা অংশগুলো দেখুন –

টাইপ ১ – পৃথিবীর উপরিতলের প্রধান গুরুত্ব হচ্ছে – এর উপর মানুষ চলাচল করতে পারে।কারণ , ক্রাস্ট না থাকলে– পৃথিবীতে মোটেই চলাফেরা করা সম্ভব হত না।যার কারণ , উপরেই উল্লেখ করেছি।

ভূপৃষ্ঠ থেকে যত নিচে নামবেন ততই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে।এর আনুপাতিক হার– উইকিতে আছে –
The temperature of the crust increases with depth, reaching values typically in the range from about 200 °C (392 °F) to 400 °C (752 °F) at the boundary with the underlying mantle.

কারণ , ভূপৃষ্ঠ খুবই পাতলা , মাত্র ৩০ কিমি।যা মাত্র পৃথিবীর ১%।যেখানে সর্বমোট ৬৩৭৮ কিমি।কার্পেট বিছানাও পাতলা আস্তরণ।

ক্রাস্ট বা ভূপৃষ্ঠের নিচে – যতই যাবেন ততই তাপমাত্রা ভয়ানক ভাবে বাড়তে থাকবে।এমনকি , কেন্দ্রে চলে গেলে তাপমাত্রা সূর্যের কাছাকাছি প্রায় ৫৪৩০ ডিগ্রিতে পৌঁছে যাবে।কার্পেট বিছানাও আরামদায়ক করার জন্যেই বিছানো হয় , যেমনটা ক্রাস্ট সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীতে চলাফেরার করার জন্য।যাতে আমরা চলাফেরা করতে পারি সহজে– কুরআনে এভাবেই বলা হয়েছে –

নাস্তিকরা খালি প্রথম অংশই বলে – শেষাংশ বলে না।কারণ , শেষাংশ বললেই –চলাফেরা করার কথা থেকেই মানুষ বুঝে যাবে যে এখানে পৃথিবীর উপরিতলকে বুঝানো হয়েছে।

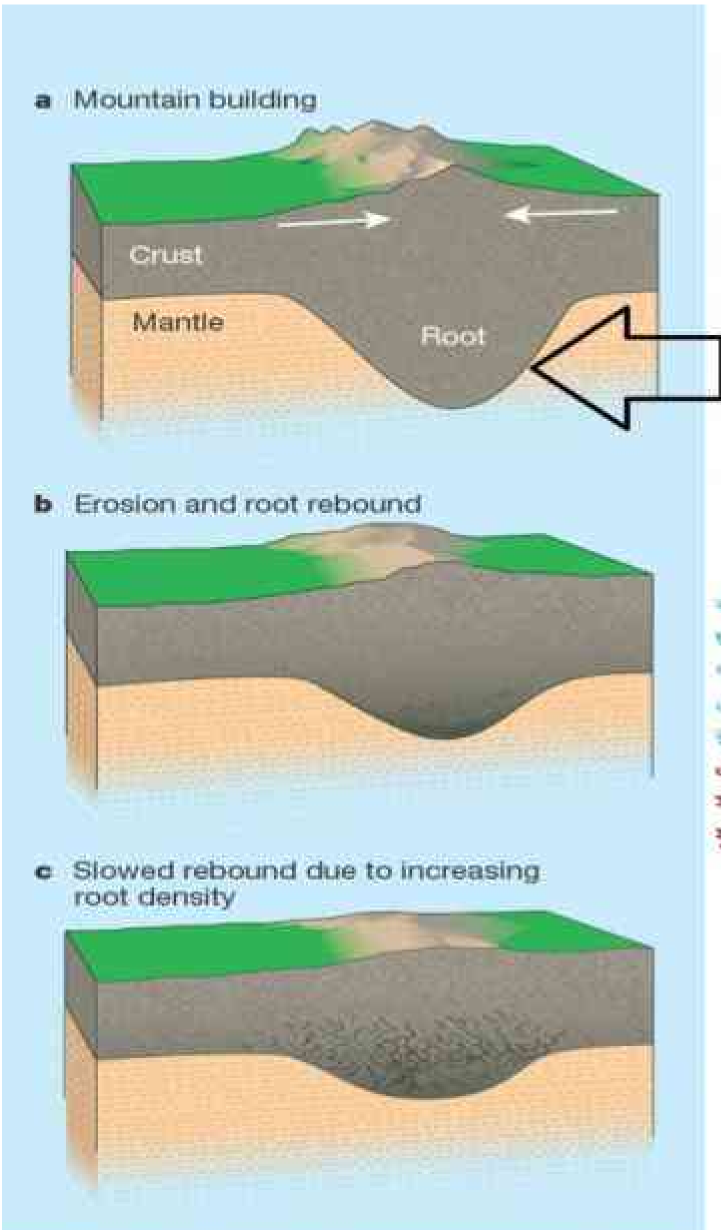
এই টাইপে পড়ে – ১ ,৩ ,৬ , ৮ , ৯, ১০

টাইপ ২ – পৃথিবীর উপরিতলের সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব হচ্ছে– এর উপরে মানুষ ফসলাদি ফলাতে পারে।উদ্ভিদ জন্মে।মানুষ সেখান থেকে জীবিকার সংস্থান করে।কারণ , ভূপৃষ্ঠ খুবই পাতলা , মাত্র ৩০ কিমি।যা মাত্র পৃথিবীর ১%।যেখানে সর্বমোট ৬৩৭৮ কিমি।কার্পেট বিছানাও পাতলা আস্তরণ।এইখান থেকে আপনি স্পষ্টই বুঝতে পারেন যে– এখানে পৃথিবীর উপরিতলকেই বুঝানো হচ্ছে – যে ক্রাস্টের কল্যাণেই আমরা চাষবাস করতে পারি।

এই টাইপে পড়ে – ১ , ২ , ৪ , ৯ , ১১

টাইপ ৩ – পাহাড় পর্বতকে খুঁটি হিসেবে বর্ণনা করার মধ্যে দিয়ে আবারো প্রমাণিত হয়– এখানে ভূপৃষ্ঠকেই বোঝানো হচ্ছে।প্রতিটা পাহাড়ের উপরে থাকে সামান্য অংশ – নিম্নাংশে থাকে – রুট।যা ভূ তত্ত্ববিদরা আবিষ্কার করেছেন -

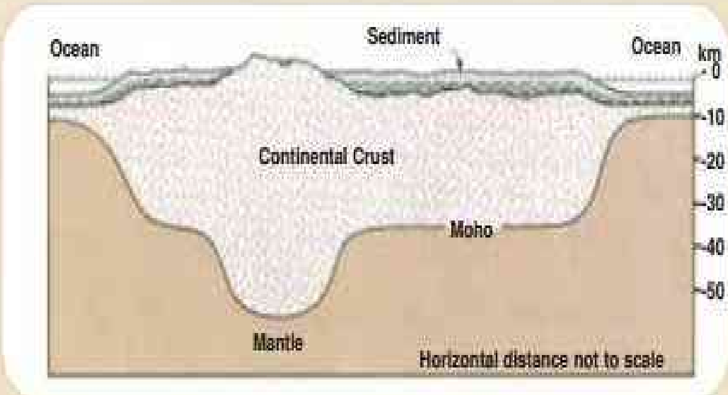
ভূমিকম্পের মাত্রা অনেক অনেক বেড়ে যেতো।পাহাড়-পর্বত গুলি তার রুট(নিম্নাংশ যা অনেকটুকু পর্যন্ত বিস্তৃত) দিয়ে ভূপৃষ্ঠকে ধরে রাখে – এতে ঘনঘন ভূমিকম্প হয় না।আর পাহাড়-পর্বতের এই নিম্নাংশকে বিজ্ঞানী গালভরা নাম– Root (রুট – যার অর্থ শেকড়) বলে ডাকে।বিজ্ঞানীরা একে শেকড় (রুট) বলে ডাকে আর কুরআন বলছে পেরেক।দুটোই একি অর্থ প্রকাশ করে।বরঞ্চ – পেরেকই সর্বোত্তম উদাহরণ হবে।কারণ … শেকড় ছড়িয়ে থাকে , আর পেরেক একমুখী হয়।পাহাড়ের রুটও একমুখী।



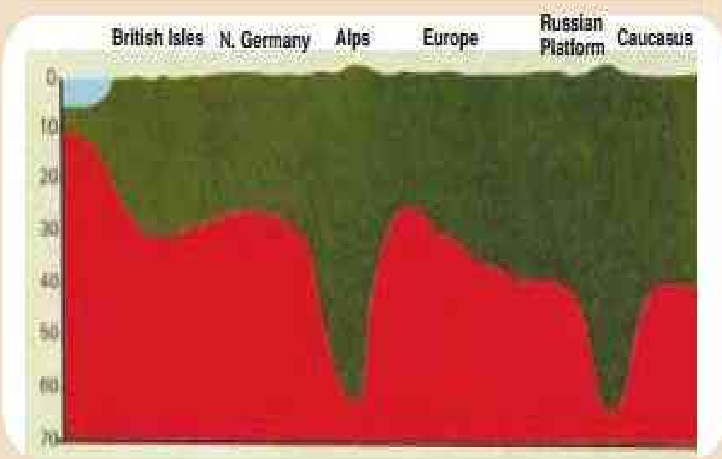
বিজ্ঞানীরা ডাকেন রুট , যার অর্থ শেকড়!! আর কুরআন বলে পেরেক।

অল দ্যা সেম! বরং পেরেকই পারফেক্ট শব্দ।

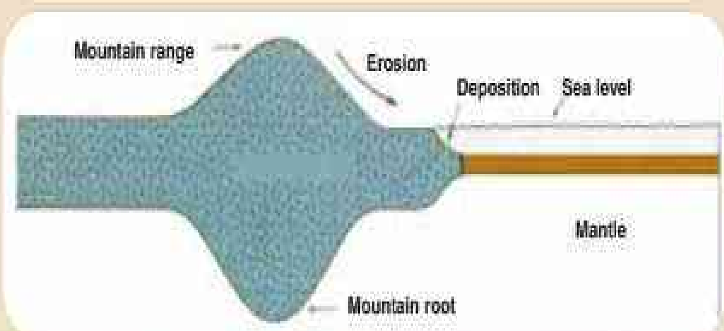
কারণ, শেকড় ছড়িয়ে থাকে , কিন্তু পাহাড়ের ক্ষেত্রে এমনটা নয়।।পাহাড়ের রুট একমুখী - তাই এটাকে পেরেকের সাথে তুলনা করাই যুক্তিপূর্ণ



Mountains have roots deep under the surface of the ground. (*Earth*, Press and Siever, p. 413)



Schematic section. Mountains, like pegs, have deep roots embedded in the ground. (*Anatomy of the Earth*, Cailleux, p.220)



Another illustration shows how mountains are peg-like in shape, due to their deep roots. (*Earth Science*, Tarbuck and Lutgens, p.158)

<u>পাহাড়-পর্বত ছাড়া লিথোস্পেরিক প্লেটগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ আরও বেশি বেশি এবং ভয়ানক হত। এর ফলে পাহাড়-পর্বতের কারণে ভূমিকম্পের মাত্রা হ্রাস পেয়েছে।</u>

সৃষ্টির শুরুতে আল্লাহ্ যদি লিথোস্পেরিক প্লেট গুলোর চরম সংঘর্ষের ফলে– পাহাড় পর্বতগুলি সৃষ্টির ব্যবস্থা না রাখতেন – তাহলে এই পৃথিবী আর বসবাসযোগ্য হত না।লিথোস্পেরিক প্লেটগুলির সংঘর্ষের মাধ্যমে পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হবার প্রক্রিয়ার ফলেই – পৃথিবীতে ভূমিকম্পের মাত্রা কমে এসেছে।এইসব প্লেটের সংঘর্ষে পাহাড় সৃষ্টির প্রক্রিয়া না থাকলে– এই পৃথিবীতে মোটেই বসবাস করা যেত না।কারণ , অসামান্য ভূকম্পনের জন্যে।কুরআনে উল্লেখিত– হেলে-দুলে পড়া বারবার ঘটতো।

এর সম্পর্কে আরও জানার জন্যে – পাহাড় অধ্যায়ে দেখুন।

এই টাইপে পড়ে – ২ , ৪ , ৭

টাইপ ৪ – পৃথিবীকে প্রসারণ করা হয়েছে – সে কথা বারেবারে বলা হয়েছে।এটা হচ্ছে – পৃথিবী আচমকা হঠাৎ করে এই শেপে চলে আসেনি।এই আকৃতিতে আসতে প্রসারিত হতে হয়েছে– পৃথিবীকে এজন্যেই এই আয়াতের অবতারণা।এই আয়াত দ্বারা যাতে সমতল না বোঝায় – সেজন্যে আল্লাহ্ - এই প্রসারণের স্বরূপ তার –

আর পৃথিবী -- এর পরে তাকে প্রসারিত করেছেন।এর থেকে তিনি বের করেছেন তার জল, আর তার চারণভূমি।

(৭৯:৩০-৩১)

উপরিউক্ত আয়াতে বলেছেন।এই প্রসারণের মাধ্যমেই – এই পৃথিবীর সবকিছু তিনি বের করে এনেছেন।পানি থেকে শুরু করে চারণভূমি।এর অর্থ কি দাঁড়ায় – এই প্রসারণের আগে – জল ও চারণভূমি কোনটাই ছিল না। এই প্রসারণের মাধ্যমেই এই জল এবং চারণভূমি বের হয়ে এসেছে।এর থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়– এটা পৃথিবী সৃষ্টির সময়কার প্রসারণের , সম্প্রসারণের কথা বলছে – সমতল বোঝাতে নয়।কারণ , সেই সম্প্রসারণের আগে তো কিছুই ছিল না।সমতল সেন্সে করলে – জল ও চারণভূমি বের করবার প্রশ্নই আসে না।

এছাড়াও আপনি নিশ্চিতভাবেই জানেননা – পৃথিবী প্রসারিত হচ্ছে।নাসার বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বের করেছেন যে – পৃথিবীর রেডিয়াস প্রতি বছরে বৃদ্ধি পাচ্ছে – ০.০০৪ ইঞ্চি করে (০.১ মি.মি)।এটা যদিও খুব সামান্য তবে – পৃথিবী বিলিয়ন বিলিয়ন বছরের ইতিহাসে – এটা খুবই উল্লেখযোগ্য।[9]

চিন্তা করতে পারেন – কোরআন সেই মহাসত্য ১৪০০ বছর আগে বলে গিয়েছে।

এখানে একটা বিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন করা হয় –

---

9 www.nasa.gov/topics/earth/features/earth20110816.html

আচ্ছা , আপনার সব কথা মানলাম।সবই মানলাম। এখানে সেটা প্রমাণ করা হয়েছে– যে বিছানা দ্বারা এখানে পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ অর্থাৎ ক্রাস্টকে বোঝানো হয়েছে।কিন্তু , এখানে বিছানা শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে কেন।

উত্তরটা হবে – আপনি যদি স্রস্টা হতেন – এই মহাবিশ্বের , তাহলে – এই ক্রাস্টকে কোন শব্দ দ্বারা বোঝাতেন।

সহজ ভাষায় – কার্পেট , বিছানা ছাড়া আর কিছুই নয়।১৫০০ বছর আগের এক অনগ্রসর মানবজাতির অনগ্রসর শব্দভাণ্ডারের জন্যে এটাই পারফেক্ট শব্দ।

এরপরই সেই চিরাচরিত প্রশ্ন – আমি এখানে বিছানা , কার্পেট বলতেতো বৃত্তাকার মানে স্ফেরিক্যাল বিছানা বুঝবো কিভাবে?আমরা তো সমতলই দেখি।

এই প্রশ্নটা আমার কাছে সবচেয়ে মজাদার।এর উত্তরটা সবচেয়ে মজাদার।আপনি যদি আয়াতগুলির দিকে ২ মিনিট তাকিয়ে থাকেন – তাহলে এখানে সবচেয়ে মজাদার।নিচের অংশটা না পড়ে ঐ ১২টি আয়াতের দিকে তাকিয়ে-দেখুন উত্তর পেয়ে যাবেন।না পেলে , নিচের অংশ দেখুন –

(১১)যে পবিত্র-সত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না। বস্তুত: এসব তোমরা জান।(২:২২)

(১২)আল্লাহ সপ্তা-কাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে, (৬৫:১২)

এই দুই আয়াতেই সব বলা হয়ে গিয়েছে।আমার আর কিছুই বলার প্রয়োজন নেই।

প্রথম কথা- পুরো কুরআনে আকাশকে ছাদ বলা হয়েছে।আমার এই বিষয়ে গবেষণার জন্যে– পুরো কুরআনে আমি প্রায় সব আয়াত পড়েছি।সব , সব জায়গায় কুরআনে আকাশকে ছাদ বলা হয়েছে।

কোথাও বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতও নেই – যে বলা হচ্ছে – ছাদ স্ফেরিক্যাল।সর্বদাই বলা হচ্ছে – ছাদ।জাস্ট ইট।আর কিছু না।

তাহলে কি আপনি বলবেন – কুরআনে বলা হচ্ছে – আকাশকে ছাদ।দ্যাট মিনস – কুরআন অনুযায়ী আকাশও সমতল।কারণ , আকাশকে ছাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে।সত্যি নয় কি ???? তার মানে কি ? আকাশ যে বৃত্তাকার আকৃতির সেটা মানুষ গুহা-যুগ থেকেই দেখছে।অথচ , একবারও বলা হয়নি – আকাশ হচ্ছে ছাদ , যা বৃত্তাকার।ভুলেও না।বারেবারে বলা হচ্ছে– আকাশ হচ্ছে – ছাদ।

<u>যে পবিত্র-সত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন,</u>আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না। বস্তুত: এসব তোমরা জান।(২:২২)

দেখুন , বলা হচ্ছে – ভূমি হচ্ছে বিছানা , আর আকাশ হচ্ছে তার ছাদ।

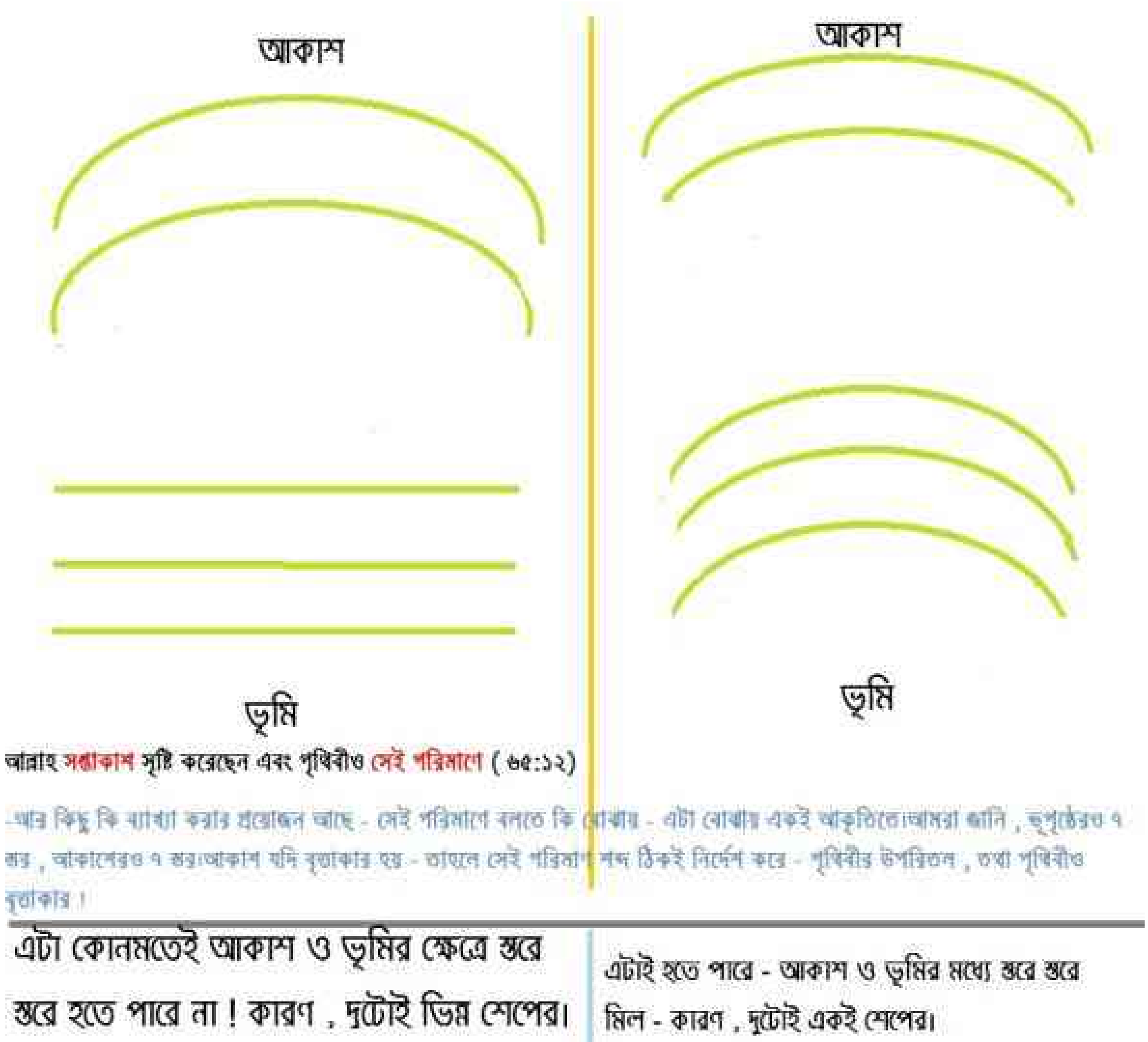
আকাশ যদি স্ফেরিক্যাল হয় – তাহলে ভূমিও হচ্ছে স্ফেরিক্যাল বিছানা।পারফেক্ট মিল।আর সিউর হতে দেখুন–

আল্লাহ সপ্তা-কাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে, (৬৫:১২)

আল্লাহ্ সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন – এর অর্থ আকাশের ৭ টা স্তর।তিনি পৃথিবীকেও সৃষ্টি করেছেন– সেই ৭ স্তরে।এর মানে কি দাঁড়ায় – স্তরে স্তরে কিভাবে হয় – এটা-তো স্পষ্ট ইঙ্গিত করছে – আকাশও বৃত্তাকার , তার মানে – ভূমীর বিছানাও বৃত্তাকার।এর বার চিন্তা করার জন্যে তো , আমাদের আর কোন ফ্লোর নেই।স্তর স্তর কিভাবে হয়।

আল্লাহ সপ্তা-কাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে(৬৫:১২)

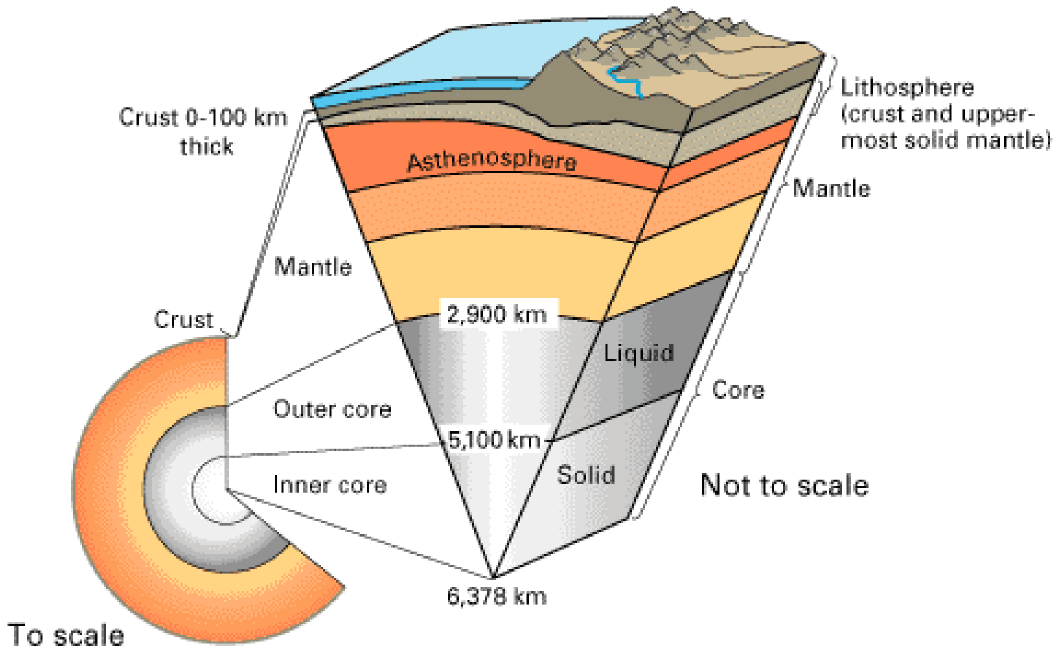
-আর কিছু কি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে - সেই পরিমাণে বলতে কি বোঝায় - এটা বোঝায় একই আকৃতিতে।আমরা জানি , ভূপৃষ্ঠেরও ৭ স্তর , আকাশেরও ৭ স্তর।আকাশ যদি বৃত্তাকার হয় - তাহলে সেই পরিমাণ শব্দ ঠিকই নির্দেশ করে - পৃথিবীর উপরিতল , তথা পৃথিবীও বৃত্তাকার !



------------------------ --------- সপ্তা-কাশের অনুরূপ পৃথিবীর স্তর ------- ---------------------------------

<u>যে পবিত্র-সত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন– এখান থেকে আর সুন্দরভাবে বৃত্তাকার পরিস্থিতি বোঝা যায়।</u>

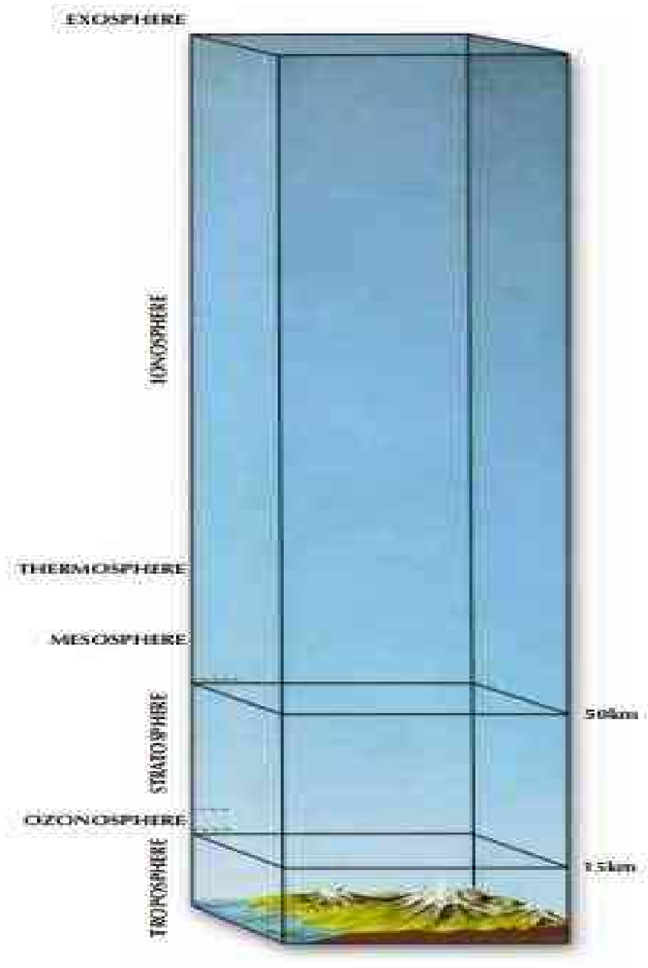
<u>পৃথিবী যে ৭ স্তরে বিভক্ত – সেটা কুরআন অনেক অনেক আগেই বলে গিয়েছে -</u>



উপরে হাতে আঙ্গুল দিয়ে গুনে দেখুন– স্তর ৭ টাই।ছবিটা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্র– উইকিপিডিয়া থেকেই নেয়া।কুরআন , ১৫০০ বছর আগে– এই ছবিটার অর্থই লিখে গিয়েছিলো - **আল্লাহ সপ্তা-কাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে(৬৫:১২) –**

তার মানে এখানে আবারো স্পষ্ট– পৃথিবীকে বিছানা বলতে– ও সাতটি স্তরের উপরের স্তরটিকেই বারেবারে বুঝানো হচ্ছে।

সপ্তা-কাশ হচ্ছে - 1. Troposphere , 2. Stratosphere , 3. Ozonosphere , 4. Mesosphere , 5. Thermosphere , 6.



The Layers of the Atmosphere

Ionosphere , 7. Exosphere

কেউ কেউ , আবার দুর্বল কণ্ঠে বলবার চেষ্টা করে- পৃথিবীর স্তর ৫ টা।এভাবে , আমি তিনটাও বলতে পারি ।শুধু নামকরণ বদলে দিয়ে।একটা স্তরের মধ্যে আরেকটা স্তর ঢুকিয়ে দিয়ে।এটা কোন সমস্যা না এটা শুধুমাত্রই নামকরণ।একটার মধ্যে আরেকটা ধুঁকিয়ে দিয়ে– যেমন কেউ সমুদ্রের ক্রাস্টকেই আলাদা ধরে , আবার ভূপৃষ্ঠকেও আলাদা ধরে।কুরআন এখানে সবগুলিকে ধরেই বলেছে।কাউকেই বাদ দেয়নি।বাস্তবে- বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ৭ টাই ধরা হয় (৮টি করা সম্ভব নয়)সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উইকিপিডিয়া থেকে নেয়া ছবিটিও আমাদেরকে সে কথাই বলছে।

আশা করি , এইবার আপনাদের বুঝাতে পেরেছি যে– পৃথিবীর উপরিতলকেই বাস্তবিক-ভাবে বিছানা কিংবা কার্পেট বলা হচ্ছে।এ বিষয়টি সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত

অধ্যায় ৯

জুলকারনাইনের চোখ অনুভূতি এবং আমাদের চোখ , অনুভূতি

২ – অভিযোগ:

জুলকারনাইন কি দেখেছিল - আর আমরা কি দেখি কিংবা জানি!!!!

এটা হচ্ছে - নাস্তিকদের প্রথম হাতিয়ার।তাই এটিকেই প্রথম বেছে নিলাম -

অভিযোগ:

অবশেষে তিনি সূর্যের অস্তাচল স্থলে পৌঁছলেন, তখন তিনি সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখলেন। সূরা-১৮:কাহফ, আয়াত:৮৬

নাস্তি-বাদীদের , দাবী এখানে নাকি - কুরআনে সায়েন্টিফিক এরর রয়েছে।এখানে নাকি দাবী করা হয়েছে- পৃথিবী সমতল।কারণ , তাদের দাবী সূর্য কি আবার অস্ত যায় নাকি।এ নিয়ে – নাস্তিবাদীরা প্রচুর লেখালেখি করেন।এটা থাকে তাদের - প্রথম হাতিয়ার।এখনই , দেখতে পাবেন , দাবী কতটা অসার।

উত্তর: অনেকভাবেই ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে - আপাতত সহজভাবেই দেই -

প্রথম পার্ট –

আরবি ভাষা-গত –

উপরিউক্ত আয়াতের আরবি উচ্চারণ হবে - Hatta itha balagha maghriba alshshamsi wajadaha

এখানে – ওয়াজদা শব্দের অর্থ - জুলকারনাইন পেল। মানে – জুলকারনাইন দেখতে পেলো।আপনি যেকোনো আরবি অভিধান খুলে দেখুন – দেখতে পাবেন লেখা আছে – সে পেল। ইংরেজিতে যা – ফাউন্ড।

সোজা ভাষায় বলি – এইখানে সেই অস্ত দেখতে পেল কে??

আল্লাহ্ না জুলকারনাইন।উত্তর হবে , জুলকারনাইন – আল্লাহ্ নয়।

তাহলে জুলকারনাইন কি দেখতে পারে বলে আপনি মনে করেন – জুলকারনাইন কি দেখবে পৃথিবী ঘূর্ণায়মান।তার পক্ষে কি দেখা সম্ভব পৃথিবী ঘূর্ণায়মান।সোজা বাংলায় সম্ভব না।তিনি যেটা দেখেছেন সেটাই বলেছেন।আপনি কি দেখেন?

২য় ভাবে – maghrib শব্দের অর্থ হয় দুটো।এই শব্দের অর্থ – স্থান এবং সময় দুটোই হয়।যখন সূর্যাস্তের কথা আসে তখন এটা – সময় বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়।উদাহরণ দিয়ে যেতে পারে –

সন্ধ্যা ছয়টায় সূর্য অস্ত গেল।

এখানে সময় এবং স্থান এর মধ্যে প্রাধান্য পায় – সময়।

জুলকারনাইনের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা হয়েছে।এখানে যা বোঝানো হচ্ছে– তাহলো – জুলকারনাইন সূর্যাস্তের সময় , পঙ্কিল জলাশয়ে সূর্যকে অস্ত যেতে দেখলেন।

কথাটা বিচার করুন – যা বোঝানো হচ্ছে –

জুলকারনাইন সূর্যাস্তের সময় অর্থাৎ সূর্য অস্ত যাবার স্থানে , পঙ্কিল জলাশয়ে সূর্যকে অস্ত যেতে দেখলেন।

এবং এটাই ঐ আয়াতের মর্মার্থ।

১ম পয়েন্ট – "পঙ্কিল জলাশয়ে সূর্যকে অস্ত যেতে দেখলেন।" –

ধরুন , আপনাকে আমি একটা গল্প বলছি -

"রহিম সমুদ্র সৈকতে গেলো।পড়ন্ত দুপুর।সূর্যের আলোয় বালিগুলো চিকচিক করছিলো।এজন্যে সে বালির দিকে তাকাতে পারছিলো না।"

- এইবার কি আপনি বলবেন – এই এফ জেড করিম বলেছে – বালি নাকি চিকচিক করে।সে একজন গাধা।আসলে এখানে কে কথাটা বলেছে – বলেছে – রহিম।দায় বর্তাবে রহিমের উপর।এফ জেড করিমের এখানে দায় নেই।এখানেও ঠিক তেমন – আল্লাহ্ , বলেছেন – জুলকারনাইন দেখতে পেয়েছিলো – সূর্য পঙ্কিল জলাশয়ে ডুবেছে।বাস্তবিক ভাবে – জুলকারনাইন কেন – সারা দুনিয়ার মানুষই দেখে সূর্য অস্ত যেতে।কেউই দেখে না– পৃথিবী তার কক্ষপথে ঘুরছে – এবং সেই ঘূর্ণায়মানতার কারণে – সূর্য অস্ত যাচ্ছে।আসলে – সূর্য প্রায় স্থির।আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি – খুব সম্ভবত অভিজিৎ এবং তার গ্যাংরা ছাড়া সবাইই এটি দেখে।তাদের ব্যাপারে আমি সিউর না।তবে – সারা-দুনিয়ার আমজনতা দেখে সূর্য অস্তই যাচ্ছে।

এখানেই তেমন – জুলকারনাইন দেখেছে – তার মানেই এটা আল্লাহ্‌র কথা না।এখানে – যদি আল্লাহ্ বলতেন – জুলকারনাইন দেখতে পেল যে – পৃথিবী ঘূর্ণায়মান , সে কারণে পৃথিবী সরে গিয়ে ঐ অংশে রাত হচ্ছে– তাহলে সেটাই হত – কুরআনের ভুল।কারণ সেটা হত অসম্ভব।এখানে – একজন মানুষ যা দেখেছে – তারই বর্ণনা করা হয়েছে।একজন মানুষের পক্ষে এর চেয়ে বেশি কিছু দেখা সম্ভব নয়।

কিন্তু আল্লাহ্ নিজে বর্ণনা করেছেন -

সূর্য ও চন্দ্র হিসেব মতো চলেছে।(৫৫:৫)

তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট-কাল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে (৩১:২৯)

আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে অনুগত করলেন। প্রত্যেকে আবর্তন করছে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে (১৩:২)

এখানে ব্যাবহার করা হয়েছে – ফালাক যার অর্থ – A spinning wheel – যার অর্থ ঘূর্ণায়মান। এখানে আল্লাহ্ বলছে – তাঁর সৃষ্টি সূর্য নিয়ে – যা ঘূর্ণায়মান।আর ঘূর্ণায়মান কিছু কখনও অস্ত যায় না।

২য় পার্ট: জুলকারনাইন সূর্যাস্তের সময় অর্থাৎ সূর্য অস্ত যাবার স্থানে

আগেও বলেছি – এখানে – ব্যবহৃত হয়েছে - maghrib শব্দের অর্থ হয় দুটো।এই শব্দের অর্থ – স্থান এবং সময় দুটোই হয়।যখন সূর্যাস্তের কথা আসে তখন এটা – সময় বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়।উদাহরণ দিয়ে যেতে পারে –

সন্ধ্যা ছয়টায় সূর্য অস্ত গেল।

অস্ত বলতে – এখানে একটা স্থানকে বোঝানো হচ্ছে।আর আসলে , সন্ধ্যার সময় বোঝাতেই এটা বোঝানো হচ্ছে।

হ্যাঁ , আপনি ঠিকই শুনেছেন – কুরআন বলছে – সূর্য অস্ত যাবার স্থানেই পৌঁছেছিলো।এখানেই ভুলটা বেশি হয়।প্রশ্ন উঠে সূর্য কি আদতেই অস্ত যায়।নোপ।সূর্য কখনো অস্ত যায় না।আমরা সবাই জানি সূর্য কখনই , কখনই অস্ত যায় না।পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান।যেটা ই-বুকে কুরআনের আলোকে প্রমাণ করেছি।

কুরআনও বারেবারে বলছে – সূর্য ঘূর্ণায়মান।একটা ঘূর্ণায়মান জিনিস কখনই উদয় , অস্ত যায় না।এটা দিনের আলোর মতই সত্য।

সূর্য ও চন্দ্র হিসেব মতো চলেছে।(৫৫:৫); তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট-কাল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে।(৩১:২৯); আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে অনুগত করলেন। প্রত্যেকে আবর্তন করছে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে (১৩:২);

৩য় পয়েন্ট –

প্রশ্ন - কুরআনে বলা হয়েছে – সূর্যের অস্ত যাবার এবং উদয় যাবার স্থানও রয়েছে ?

এই পরিস্থিতি টা ঠিক ইত্যাদির নানা-নাতির মত কথ।নানা বলছে– চল , হোটেলে ভাল মন্দ কিছু খেয়ে আসি?

নাতি বলছে – নানা, এইতো একটা ভুল কথা কইলা?(সবচেয়ে বেশিবার দেয়া ডায়ালগ)

নানা – আবার কি ভুল বললাম ?

নাতি – ভাল খাবা , সেটা ঠিক আছে ! মন্দও খাইতে হবে কেন ???

নানা – এইবার নাতির পিছনে দৌড় !

এই হচ্ছে অবস্থা – প্রচলিত শব্দকে ভাঙলে এরকম বহু "নানা – নাতি" টাইপ ভুল বের হবে।এখানেও , সূর্যাস্ত , সূর্যোদয়কে ভেঙ্গে ঠিক একই অবস্থার অবতারণা ঘটেছে ।যেমন ধরুন –

আমি বললাম – সূর্যাস্ত !

তাহলে – কি দাঁড়ালো – অস্ত যাওয়া মানে কি?

কোথাও এক জায়গায় যাওয়া।তাহলে – সূর্য অস্ত মানে কি ?

কোথাও এক জায়গায় – অস্ত অর্থাৎ - সূর্যের একটি নির্দিষ্ট স্থানে গমন করাকেই বোঝাচ্ছে !

আর উদয় মানে কি – আকস্মিক কোথাও এক জায়গা থেকে সূর্য উঠাকেই বোঝাচ্ছে?

এই দুইটা শব্দ – একটাই কথা বলছে – কোথাও সূর্যের গমন , আবার কোথাও সূর্যের আগমনকেই বোঝাচ্ছে।নাতির মত বিশ্লেষণ করেই এটা বের করলাম।

তাহলে কি এই শব্দ ভুল ? এই শব্দ বলছে – সূর্য কোথাও যায় , আবার কোথাও থেকে আসে ???

ধরাধামে এই শব্দের বিকল্প শব্দ এখনো বের হয় নি – হবেও না।নিশ্চিত থাকেন।অথচ ,এই শব্দটা শাব্দিক দিক থেকে ভুল।কুরআন ভুলে যান – সহজ মনে প্রশ্নের উত্তর দিন -

সূর্য অস্ত যাবার স্থান কোথায় ?

এই প্রশ্ন করলে – আপনি কি বলবেন ?

প্রথমে বলতে পারেন – আসলে , ভাই অস্ত যায় না।পৃথিবী ঘূর্ণায়মান।

আমি বলতে পারি – তাহলে , এই শব্দের ব্যবহার এখনো হয় কেন ?

আপনি উত্তর দিতে বাধ্য – কারণ , মানুষ যখন যেখানে থাকে – তখন সে যে জায়গায় সূর্যকে অস্ত কিংবা উদয় হতে দেখে – সেটাই হচ্ছে তার সাপেক্ষে সূর্য অস্তাচল , উদয়াচল !

হ্যাঁ, এটা বাস্তব , আমরা এখন এই শব্দ ব্যবহার করি – যখন আমরা যেখানে দেখি – সেটা আমাদের জন্যে – সূর্য অস্তাচল , এবং সূর্য উদয়াচল !

জুলকারনাইনের সেই আয়াতেও আমরা তেমনটা দেখি–

maghrib শব্দের অর্থ হয় দুটো।এই শব্দের অর্থ– স্থান এবং সময় দুটোই হয়।যখন সূর্যাস্তের কথা আসে তখন এটা– সময় বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়।উদাহরণ দিয়ে যেতে পারে–

সন্ধ্যা ছয়টায় সূর্য অস্ত গেল।

অস্ত বলতে – এখানে একটা স্থানকে বোঝানো হচ্ছে।আর আসলে , সন্ধ্যার সময় বোঝাতেই এটা বোঝানো হচ্ছে।

কুরআনে – এই শব্দটাই ব্যবহার করা হয়েছে– যে বলতে – সে যখন সূর্যের অস্তাচলে পৌঁছাল – তখন সূর্যকে সে কর্দমাক্ত জলাশয়ে ডুবতে দেখলো ?

এটাকে বলে লিটারাল ইন্টারপ্রেশন –

শাব্দিক-ভাবে এখানে ভুল ধরা মোটেও সঙ্গত নয়– কারণ – এখানে স্পষ্টই বলা হচ্ছে– যে সে দেখলো সূর্যকে পঙ্কিল জলাশয়ে ডুবতে।তার পক্ষে সেটাই তার জন্যে অস্তাচল।কারণ , সে সেখানে দেখেছে।তার পক্ষে সেটাই বাস্তব।

এখানে – কেউ কেউ মিনিং করে বের করেন– এখানে বলা হয়েছে- সূর্যের একটা অস্তাচল আছে– যেটা পঙ্কিল জলাশয়ের কিনারে।ওয়েল , যদি এইটা মনে করেন– তাহলে বলবো – আর একটু আগান – মাত্রও ৪ আয়াত পরেই উল্লেখ আছে–

পরে যখন তিনি সূর্য উদয় হওয়ার যায়গায় পৌঁছলেন, তিনি এটিকে দেখতে পেলেন উদয় হচ্ছে এক অধিবাসীর উপরে যাদের জন্য আমরা এর থেকে কোনো আবরণ বানাই নি, --(১৮:৯০)

তার মানে কি ঐ ক্ষেত্রে যদি অস্তাচল পঙ্কিল জলাশয় হয়– তাহলে কি অন্য ক্ষেত্রে উদয় হবার জায়গা কি– একদল অধিবাসী !! কস্মিনকালেও কোন পাগল এটা বলবে না– একদল অধিবাসীর উপর দিয়ে সূর্য উদয় হয়।একটু খোলা মনে চিন্তা করলেই বুঝবেন – যে এই আয়াতে বলা হচ্ছে –

সূর্যকে একদল অধিবাসীর উপর দিয়ে উঠতে দেখল– এর ফলে আমার ধারণা – এই আয়াত পড়েই আপনি বুঝতে পারছে– সূর্য উদয় হবার স্থান বলতে কি বোঝানো হয়েছে।আমার ধারণা পেরেছেন।যদিওবা ঐ আয়াতে বিভ্রান্ত হন– তাহলে – এই আয়াত পড়েই বিভ্রান্তি দূর হয়ে যাবার কথা।কারণ , এই আয়াত পড়ে আপনি ব্যাখ্যা ছাড়াই বুঝতে পারবেন– এখানে আদতে – উদয় স্থল , আর অস্তাচল বলতে– যে যেখানে দেখেছে– সেই অর্থে ব্যবহার হয়েছে।এর বেশি কিছুই না।

আশা করি – ক্লিয়ার করতে পেরেছি -

আর বাস্তবিক-ভাবে সূর্য উঠেও না , ডুবেও না।আমাদের পৃথিবী ঘূর্ণায়মান দেখে এমনটা হয়।আপনি আমি যে বলি– সূর্যোদয় , সূর্যাস্ত।এই কথা গুলি সঠিক নয়– তবে এগুলো কথ্য।পৃথিবীর কোথাও দেখবেন না যে লেখা আছে– পৃথিবী আজকে ঘুরে ঘুরে সরে যাবে– এবং সূর্য দেখা যাবে।স্পষ্ট বলা আছে- সূর্যোদয়– সূর্যাস্ত।এমনকি , পৃথিবীর সেরা বৈজ্ঞানিক ম্যাগাজিন , পত্র – পত্রিকা , মুখের ভাষায় এটিই বলা হয়– যে সূর্যোদয় , সূর্য অস্ত।
জাপানকে বলা হয় "ল্যান্ড অফ রাইজিং সান" ।তার মানে – জাপান কি জানতো না সেটা অবৈজ্ঞানিক।সেখানেই কি খালি সূর্য ওঠে।

স্বয়ং জাপান নামের অর্থ প্রথম সূর্যোদয়ের দেশ।কি বৈজ্ঞানিক দেশ সে?

আমি নাস্তিকদের সাথে মিলিওন ডলারের চ্যালেঞ্জ লাগবো– যে পৃথিবীর সবজায়গাতেই সূর্যোদয় , আর সূর্যাস্ত ছাড়া– আর কোন শব্দ ব্যাবহার হয় না।মানুষ আজীবনই ব্যবহার করে– সূর্যোদয় – সূর্যাস্ত।পৃথিবীর সেরা জার্নাল খুলে দেখুন– লেখা আছে – সূর্যোদয় , সূর্যাস্ত।

পত্রিকা খুলুন – বাঁপাশে লেখা আছে – আজ সূর্যোদয় , আজ সূর্যাস্ত।আমি ১০০ টাকা বাজি ধর বলতে পারবো - এমনকি আপনি নিজেও কোনদিন এই শব্দের বাইরে অন্য শব্দ ব্যবহার করেননি।

শুধুমাত্র – কুরআন ধরলেই ভুলে যান – এই শব্দটা অবৈজ্ঞানিক।কুরআন বন্ধ করলেই – আবার ব্যাবহার শুরু করেন – এই শব্দ ।আস্তিকরা দেখুন – তাদের ভুল ধরার নমুনা।

আপনি দুনিয়ার কোন বই-পত্র খুলেই দেখান না কেন– সবজায়গায় সূর্য উদয় – সূর্য অস্ত যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক ম্যাগাজিন খুলে দেখুন– দেখবেন বলা আছে আজ সূর্যোদয় সকাল ৫টায় , সূর্যাস্ত ৬টা।নিখাদ , আইনস্টাইনও বলতেন – তাঁর কাজ শুরু হত সূর্যোদয়ের শুরু থেকে।তাই বলে তিনি ভুল।মানুষ যেটা দেখে , সেটাই বলবে।এটাই স্বাভাবিক।এছাড়া , এখানে স্পষ্টই বলা আছে– জুলকারনাইন দেখেছে।

সূর্য অস্ত যাবার স্থানে – বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে সেটা আশা করি বুঝেছেন।এখানে– সূর্য অস্ত যাওয়া – বলতে আসলে – আমারা যেভাবে বুঝি সেইভাবেই আল্লাহ্ বলেছেন।আর , এটা দ্বারা অস্ত যাবার স্থানে মিন করলে কি দাঁড়ায়–

কিচ্ছুক্ষণ আগেই উদাহরণ দিলাম – সূর্য অস্ত যায় , সূর্য উদয় হয় – সবাই এটি বলে।সারা দুনিয়া।

আপনি কাউন্টার প্রশ্ন করুন – কোথায় অস্ত যায়।

উত্তর , আদতে যায় না – বাট – আমরা একেকসময় একেক জায়গায় দেখি।

এখানেও – একই ঘটনা – জুলকারনাইন পঙ্কিল জলাশয়ে দেখেছেন।পরবর্তীতে দেখেছেন–একদল মানুষের মাথার উপর দিয়ে।

এইবার বাস্তবে আসুন -

অবশেষে তিনি সূর্যের অস্তাচল স্থলে পৌঁছলেন, তখন তিনি সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখলেন। সূরা-১৮:কাহফ, আয়াত:৮৬

--- সোজা ভাষায় বলি – এইখানে সেই তিনি কে??

আল্লাহ্ না জুলকারনাইন।উত্তর হবে , জুলকারনাইন – আল্লাহ্ নয়।

তাহলে জুলকারনাইন কি দেখতে পারে বলে আপনি মনে করেন– জুলকারনাইন কি দেখবে পৃথিবী ঘূর্ণায়মান।তার পক্ষে কি দেখা সম্ভব পৃথিবী ঘূর্ণায়মান।সোজা বাংলায় সম্ভব না।তিনি যেটা দেখেছেন সেটাই বলেছেন।

ঐ অংশটি প্রথম পুরুষে লেখা। আল্লাহ্ প্রথম পুরুষে থেকে বর্ণনা করছেন।প্রথম পুরুষে লেখা কোন গল্প কি জীবনে পড়ে দেখেননি?

ধরুন , আপনাকে আমি একটা গল্প বলছি -

রহিম সমুদ্র সৈকতে গেলো।পড়ন্ত দুপুর।সূর্যের আলোয় বালিগুলো চিকচিক করছিলো।এজন্যে সে বালির দিকে তাকাতে পারছিলো না।

- এইবার বলুন , এই কথা দ্বারা কি প্রমাণ হল।এর দ্বারা কি প্রমাণ হল - বালি কি চিকচিক করে?চোখে যা দেখা যায় – তাই কি সত্যি।না, সত্যি নয়।কিছুক্ষণ পরে দেখবেন – জুলকারনাইন আরও কি কি দেখেছে।

গল্পের একটা লাইন তুলে এনে আমরা বুঝতে পারি না , গল্পটা কি?আপনি বিচ্ছিন্ন একটা লাইন তুলে এনে - দাবী করতে পারেননা , এটাই গল্পের সারমর্ম।

তাই , আমরা প্রথমে এই আয়াতের আগের কিছু অংশ এবং পরের কিছু অংশ দেখি-

আগের অংশগুলি বিবেচনা করে দেখি – আগের অংশেই আছে উত্তরের চাবিকাঠি।

"তারা আপনাকে জুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন: আমি তোমাদের কাছে তাঁর কিছু অবস্থা বর্ণনা করব।"

(সুরা কাহফ , আয়াত নং – ৮৩)

এই আয়াতে আল্লাহ্ নবীকে বলছেন – জুলকারনাইন সম্পর্কে আরববাসী তাঁকে জিজ্ঞেস করলে কি বলতে হবে।

আমি তাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের কার্যোপকরণ দান করেছিলাম।

(সুরা কাহফ , আয়াত নং – ৮৪)

--------পরের আয়াতে - আল্লাহ্-প্রথমেই জুলকারনাইন সম্পর্কে নবীর কাছে বলে নিলেন।

অতঃপর তিনি এক কার্যোপকরণ অবলম্বন করলেন। (সুরা কাহফ , আয়াত নং – ৮৫)

----এর পরের আয়াতে এইবার কাহিনী বলা শুরু করলেন । এইবার আপনার কাছে প্রশ্ন– এইখানে তিনি বলে কাকে বোঝানো হয়েছ???

সুস্থ মস্তিষ্কের হলে অবশ্যই বলবেন – জুলকারনাইন।

অবশেষে তিনি যখন সূর্যের অস্তাচলে পৌছলেন; তখন তিনি সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন।

(সুরা কাহফ , আয়াত নং – ৮৬)

আগের আয়াত অনুযায়ী এই অস্ত যাওয়া দেখলেন – জুলকারনাইন??তিনি যখন সূর্যের অস্তাচলে পৌছলেন – এই তিনি যদি হন – জুলকারনাইন , তাহলে পরের অংশে পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যাওয়া দেখেছেন – ঐ একি জুলকারনাইন।

এইবার ভাইদের কাছে আমার প্রশ্ন – জুলকারনাইনের পক্ষে কি এছাড়া আর কিছু দেখা সম্ভব।তার পক্ষে কি দেখা সম্ভব, পৃথিবী ঘূর্ণায়মান।আপনি কি দেখেন- পৃথিবী ঘুরছে?

একজন সাধারণ মানুষের চোখে-তো এর চেয়ে বেশি কিছু দেখা সম্ভব নয়।বাংলাদেশে একটা বিখ্যাত জায়গা আছে নাম কুয়াকাটা – সেখানে মানুষ যায় সূর্যাস্ত দেখতে।ওখানে নাকি– খুব সুন্দর সূর্যাস্ত হয়।বিদেশ থেকে পর্যটক পর্যন্ত আসে।আমারও যাবার ইচ্ছে রয়েছে।আচ্ছা , ওইখানেই কি সূর্যাস্ত হয় , আর কোথাও না??এটা বলা কি ভুল।আপনি যদি এই মুহূর্তে আমাকে কোথাও দেখাতে পারেন – যে লেখা আছে পৃথিবী ঘুরার ফলে ঐখানে দেখা যায় সূর্যাস্ত(আমরা সবাই এটি জানি , কিন্তু ভাষার দিক থেকেই এটা বলা হয় না) তাহলে এই মুহূর্তে আমি লেখা লেখি ছেড়ে দেবো।এটা লিটারেল

ইন্টেরপ্রেশন।আর এইখানে খুব খুব স্পষ্টই বলা হচ্ছে– জুলকারনাইন কি দেখেছে , কোথায় সূর্য উঠেছে , কোথায় সূর্য ডুবছে – এইগুলো-তো দেখছে – জুলকারনাইন – আল্লাহ্ ও না , মুহাম্মদ সা: ওঁ নন।তাই , তার পক্ষে এটাই স্বাভাবিক দেখা।এমনকি আমরাও দেখি।

উত্তরটা অবশ্যই পেয়েছেন।

এইবার ভুয়া যুক্তির কফিনে শেষ পেরেকটা ঠুকা যাক ...

আর জানি , নাস্তিবাদিরা কখন এগুলো ভেবে দেখেননি...তারা , ভুল ধরার জন্যে - চোখ , কান বন্ধ করে ঝাঁপিয়ে পড়েন।চোখ কান বন্ধ না থাকলে আরেকটি জিনিস চোখে পড়ত।

ঐ একই সূরার - আরও ৪ আয়াত পরে উল্লেখ আছে-

" পরে যখন তিনি সূর্য উদয় হওয়ার জায়গায় পৌঁছলেন, তিনি এটিকে দেখতে পেলেন উদয় হচ্ছে এক অধিবাসীর উপরে যাদের জন্য আমরা এর থেকে কোনো আবরণ বানাই নি, --

"- সূরা কাহফ - ৯০

(“Until, when he came to the rising of the sun, he found it rising on a peoplefor whom We had provided no covering protection against the sun....” – 18 -90)

এইবার কি আবার ভুল ধরতে আসবেন।এখান থেকেই স্পষ্ট- সূর্য ঐ অধিবাসীর মাথার উপরে উঠছে!!

চিন্তা করুন - ব্যাপারটা বলছে - সূর্য অধিবাসীর মাথার উপর দিয়ে উঠছে!!!

এটাও কি সায়েন্টিফিক এরর।

যারা পঙ্কিল জলাশয় থেকে সূর্য উদিত হবার ঘটনা বলে , তারা কি এই আয়াত দেখে নাই ।তারাও তো প্রশ্ন করতে পারে - আসলে আল্লাহ্-মনে করেছেন - মানুষের পিছন থেকেই সূর্য উদিত হয়!!এটা আসলে চোখের বিভ্রাট– মানুষ একেকসময় একেক স্থানে দেখে।(আল্লাহ্-ক্ষমাকারী)

আর যাদের উপর কোন আবরণ বানাইনি– এই শব্দের অর্থটা হচ্ছে– এটা এক বিরান প্রান্তরের ঘটনা।যেখানে আশেপাশে কোন বড় স্থাপনা , পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি নেই।

যার ফলে এটা দিনের আলোর মতই পরিষ্কার– যে জুলকারনাইন একেকসময় একেক-জায়গায় দেখেছেন।আর তিনি যে স্থানে সেটা অস্ত যেতে দেখেছেন– সেটাকে অস্তাচল আর উদয়-স্থানকে উদয়াচল হিসেবে বলা হয়েছে।এটা হচ্ছে – ভাষা-গত ব্যাখ্যা।

যেমন আমরা বলি – সূর্য অস্ত যায় ???

মানে হচ্ছে – কোন একটা স্থানে অস্ত যায়।মানে , ডুবে যায়।

বাস্তবে প্রশ্ন করুন – কোথায় ডুবে ? তাহলে আর উত্তর খুঁজে পাবেন না।

সহজ ভাষায় উত্তর আসবে – আমরা যেখানে দেখি ??? একেকসময়।একেকসময় পানির মধ্যে , একসময় মানুষের মাথার উপর দিয়ে , আরেকসময় রবীন্দ্রনাথের কুঠীবাড়ীর বারান্দা থেকে দেখা পদ্মা নদীতে (আমি দেখেছিতো)।

আর একটা কথা আগেকার সময়ে প্রচলিত ছিলো যে – সূর্য পৃথিবীর একদিকে অস্ত যেয়ে আরেকদিকে উঠে।কুরআন বলছে – সূর্য ঘূর্ণায়মান।ভাল কথা – কেউ মনে করতে পারেন – এখানে হয়ত বলা হয়েছে – একদিকে অস্ত গিয়ে – ঘুরে এসে ঠিক ঘূর্ণায়মান পথে পৃথিবীর অন্যদিকে উঠে আসা।কিন্তু , দেখেন , জুলকারনাইন একদিনের ব্যবধানে– এই জিনিস দেখেছিলেন।কোন পাগলও বলবে না – জুলকারনাইন , এক-দুই দিনের ব্যবধানে – দুনিয়ার অন্য পাশে চলে গিয়েছিলেন।

এফ জেড করিম এবং একজন নাস্তিকের সাথে কথা হতে পারে –

নাস্তিক – ঐ আয়াতে অর্থাৎ ১৮:৮৬ অর্থাৎ সূরা কাহফ এর ৮৬ নং আয়াতে রয়েছে– “তিনি সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন !” – তার মানে কুরআনে বলা আছে – সূর্য পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যায়।

এফ জেড – না ভাই , ওইখানে বলা নাই – সূর্য পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যায় না – ওইখানে বলা আছে , তিনি দেখেছেন – অস্ত যেতে।আমরা যেমন দেখি - একেক-জায়গায়।

নাস্তিক – নোপ ! আপনি কিভাবে সিউর হলেন – সেখানে একেক জায়গায় উঠে ! এখানে আসলে মুহাম্মদ সা: ধারণা করেছিলেন – সূর্য পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যায় !

এফ জেড – হ্যাঁ , আমি সিউর হয়েছি – ক্রস চে-কিং করে।কারণ দেখুন , এখানে সূর্যকে তিনি পঙ্কিল জলাশয়ে ডুবতে দেখলেন – এরপরই , ১৮:৯০ অর্থাৎ - সূরা কাহফের পঙ্কিল জলাশয়ের আয়াতের ৪ আয়াত পরেই– অর্থাৎ - ৯০ নং আয়াতে তিনি আবার সূর্যকে একজন অধিবাসীর উপর দিয়ে উঠতে দেখলেন।তাহলে– কি আপনি বলবেন – কুরআন বলেছে – সূর্য উদয় হয় – একজন অধিবাসীর মাথার উপর দিয়ে !!!!

নাস্তিক – উত্তর নেই !

এফ জেড – আসলে – কুরআন বলছে – সূর্য অধিবাসীর মাথার উপর দিয়ে উঠছে ! বাস্তবিক-ভাবে – এর ব্যাখ্যা হল – আমরা যেমন একেকসময় একেক জায়গায় সূর্যকে উদয়য়-অস্ত হতে দেখি।জুলকারনাইনও তেমনটা দেখেছেন।

এফ জেড করিম এবং একজন নাস্তিকের সাথে কথা হতে পারে –

নাস্তিক – ঐ আয়াতে অর্থাৎ ১৮:৮৬ অর্থাৎ সূরা কাহফ এর ৮৬ নং আয়াতে রয়েছে – "তিনি সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন !" – তার মানে কুরআনে বলা আছে – সূর্য পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যায়।

এফ জেড - না ভাই , ওইখানে বলা নাই - সূর্য পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যায় না - ওইখানে বলা আছে , তিনি দেখেছেন - অস্ত যেতে।আমরা যেমন দেখি - একেকজায়গায় - একেকসময়।

নাস্তিক - নোপ ! আপনি কিভাবে সিউর হলেন - সেখানে একেক জায়গায় উঠে ! এখানে আসলে মুহাম্মদ সাঃ ধারণা করেছিলেন - সূর্য পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যায় !

এফ জেড - হ্যাঁ , আমি সিউর হয়েছি - ক্রস চেকিং করে।কারণ দেখুন , এখানে সূর্যকে তিনি পঙ্কিল জলাশয়ে ডুবতে দেখলেন - এরপরই , *১৮:৯০* অর্থাৎ - সূরা কাহফের পঙ্কিল জলাশয়ের আয়াতের ৪ আয়াত পরেই - অর্থাৎ - ৯০ নং আয়াতে তিনি আবার সূর্যকে একজন অধিবাসীর উপর দিয়ে উঠতে দেখলেন।তাহলে - কি আপনি বলবেন - **কুরআন বলেছে - সূর্য উদয় হয় - একজন অধিবাসীর মাথার উপর দিয়ে !!!!**

নাস্তিক - উত্তর নেই !

এফ জেড - আসলে - কুরআন বলছে - সূর্য অধিবাসীর মাথার উপর দিয়ে উঠছে ! বাস্তবিকভাবে - এর ব্যাখ্যা হল - আমরা যেমন একেকসময় একেক জায়গায় সূর্যকে উদয়-অস্ত হতে দেখি।জুলকারনাইনও তেমনটা দেখেছেন।

THE END



আসল কথা হচ্ছে - জুলকারনাইন একেক সময়ে একেক জায়গায় - সূর্যকে দেখছেন।আমরাও একই জিনিস দেখি।এইখানে সেই সূরার পুরো অনুচ্ছেদেই জুলকারনাইন সম্পর্কে বলা হয়েছে।জুলকারনাইন কি দেখেছে, কি করেছে - এইসব।পুরো অনুচ্ছেদটিই প্রথম পুরুষে বর্ণিত একটি অংশ।বিভিন্ন গল্প কবিতায় আমরা হরহামেশাই দেখতে পাই।কোন সময়ে পঙ্কিল জলাশয়ে , আবার কোন সময়ে মাথার উপরে উঠার ঘটনাটাও তেমন।

আর বাস্তবিক-ভাবে সূর্য উঠেও না , ডুবেও না।আমাদের পৃথিবী ঘূর্ণায়মান দেখে এমনটা হয়।আপনি আমি যে বলি– সূর্যোদয় , সূর্যাস্ত।এই কথা গুলি সঠিক নয়– তবে এগুলো কথ্য।পৃথিবীর কোথাও দেখবেন না যে লেখা আছে– পৃথিবী আজকে ঘুরে ঘুরে সরে যাবে– এবং সূর্য দেখা যাবে।স্পষ্ট বলা আছে- সূর্যোদয়– সূর্যাস্ত।এমনকি , পৃথিবীর সেরা বৈজ্ঞানিক ম্যাগাজিন , পত্র– পত্রিকা , মুখের ভাষায় এটিই বলা হয়– যে সূর্যোদয় , সূর্য অস্ত।
জাপানকে বলা হয়তারমানে কি পৃথিবীতে সেইখানেই শুধু সূর্য ওঠে ।"ল্যান্ড অফ রাইজিং সান"?

স্বয়ং জাপান নামের অর্থ প্রথম সূর্যোদয়ের দেশ।কি বৈজ্ঞানিক দেশ সে?

আর , আমাকে প্রায় জুলকারনাইন নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন করতে আসে–

আমি তাকে বলি– ভাই , আমারে একটু সময় দেন?আমি ভাল করে হেসে নেই।হাসতে হাসতে পড়ে গেলে– একটু ধরবেন।

ভদ্রলোক একটু বিরক্ত হয়। বলে , দেখি– আপনার কত প্রজ্ঞা!!

আমি বলি , ভাই– আপনার কথা এখানে কুরআনে বলা হচ্ছে– সূর্য পঙ্কিল জলাশয়ে ডুবে যাচ্ছে বলে মুহাম্মদ সা: বলছেন– আচ্ছা , আপনি তো জানেন , মুহাম্মদ সা: অত্যন্ত ধূর্ত প্রকৃতির মানুষ(নাউজুবিল্লাহ)!!

হ্যাঁ , অবশ্যই , তিনি এইসব বানিয়ে বানিয়ে বলেছেন– তার ধারনা নাকি সূর্য পঙ্কিল জলাশয়ে ডুবে।

আচ্ছা , ভাই– সূর্য একটা আগুনের পিণ্ড বলেই জানতো প্রাচীন মানুষেরা।মুহাম্মদ সা: বললেন– যে সূর্য পঙ্কিল জলাশয়ে ডুবে।আগুনের পিণ্ড পানির তলে ডুবে– এই কথা মুহাম্মদ সা: কেন , আমাদের বাড়ির পাশের শোভা পাগলী বলবে না। মুহাম্মদ সা: বৈজ্ঞানিক মতামত– ধরেন বানিয়েই দিলেন!!তাই বলে আগুনের পিণ্ড– পানির তলে ডুবে!!

মাথা নষ্ট না হলে , কেউ এরকম কথা বলে না।

মাথা আপনার ঠিক আছে তো।তাড়াতাড়ি ধরেন– হাসতে হাসতে তো পড়ে যাবো।

ভদ্রলোক এর ফেসবুকের সবুজ বাতি নিভে গেলো। আর আমি এই লেখার বাকী অংশ পাঠিয়ে দিলাম।

(এখানে যে জুলকারনাইন নিজ চোখে পঙ্কিল জলাশয়ে ডুবা দেখেছেন– এইটা তার বড় প্রমাণ।সূর্যোদয়ের স্থান , সূর্যাস্তের স্থানও যে তিনি দেখেছেন– এটাও তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।মুহাম্মদ সা: কেন , কোন পাগলও বলবে না যে সূর্য পঙ্কিল জলাশয়ে ডুবে।আগেকার যুগে লোকেরা বলতো পাহাড়ের আড়ালে যায়।এটাতে তাও অন্তত একটু লজিক আছে।তাই বলে পানিতে ডুবা।আগুন ডুবে পানিতে!!!এই আমাকে কেউ– হেমায়েতপুরের একটা টিকেট এনে দাওতো।বলেছিলাম না– ধর্মগ্রন্থ বুঝবার জ্ঞান লাগে।এদের যে সেটি নেই– তা আবারো আবারো প্রমাণিত।ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে যে নূন্যতম কমন্সেন্স লাগে– সেটা এদের বিন্দুমাত্রই নেই।মানুষকে বিভ্রান্ত করাতেই এদের পরম আনন্দ।)

আচ্ছা ভাই , আপনাদের কমন সেন্সের এতো অভাব কেন?? ধর্ম নিয়ে আলোচনা করার সময় যে নাস্তিকেরা সহজ কথাও বুঝে না– এইটা তার একটা বড় প্রমাণ।

"লিটারেল ইন্টারপ্রেশন" বিশ্লেষণ করতে বলা হয়েছে।ওই সূরাটি যে পুরো"লিটারেল ইন্টারপ্রেটেশন" এ ভর্তি , তাঁর প্রমাণ হল জুলকারনাইনের এই সূরারই কিছু অংশ পরে উল্লেখ আছে–

বলো -- "সাগর যদি কালি হয়ে যেত আমার প্রভুর কলিমাহ্র জন্য তবে নিশ্চয়ই সাগর নিঃশেষ হয়ে যেত আমার প্রভুর কলিমাহ্ শেষ হওয়ার আগে'', -- যদিও বা আমরা তার মতো আরেকটি আনতাম যোগ করতে।(সূরা কাহফ , ১০৯)

এইবার দেখুন , কিভাবে রূপকীয় কথা-বার্তা বলা হচ্ছে– ঐ সুরাতে।সূর্যোদয়ের কথাটা – ঠিক এরকমই।এইখানে বিজ্ঞানের কিছু নেই।

কুরআন নিজেই বলছে –

তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে তারা অনুসরণ করে ফিতনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশে তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলেন: আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এই সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বোধশক্তি সম্পন্নেরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। (৩:৭)

বুঝে নিন - "তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক।"

যেগুলি সম্পর্কে আল্লাহ্ ছাড়া কেউই শতভাগ জানেন না।তবে– একমাত্র জ্ঞানীরাই সেগুলো সম্পর্কে বোঝে।আর কেউ না।বোধ শক্তি সম্পন্নরা ছাড়া আর কেউই বোঝে না।জুলকারনাইনের ঘটনাটাও ঠিক তেমন।

আপনি দুনিয়ার কোন বই-পত্র খুলেই দেখান না কেন– সবজায়গায় সূর্য উদয় – সূর্য অস্ত যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক ম্যাগাজিন খুলে দেখুন– দেখবেন বলা আছে আজ সূর্যোদয় সকাল ৫টায় , সূর্যাস্ত ৬টা।নিখাদ , আইনস্টাইনও বলতেন – তাঁর কাজ শুরু হত সূর্যোদয়ের শুরু থেকে।তাই বলে তিনি ভুল।মানুষ যেটা দেখে , সেটাই বলবে।এটাই স্বাভাবিক।এছাড়া , এখানে স্পষ্টই বলা আছে– জুলকারনাইন দেখেছে।

এরও চেয়ে বড় কথা ,যদি এখানে স্রস্টা তাঁর সৃষ্টি সূর্য সম্পর্কে বলতেন– তাহলে কখনই বলতেন না – সূর্য মানুষের মাথার পিছন থেকে উঠে!!!!!!!

এখান থেকেই প্রমাণিত - দাবিটি কতটা অসার।কুরআনের ভুল ধরতে গিয়ে , নিজেরাই যে কতটা ভুল , তা নিশ্চয়ই দেখাতে পেরেছি।

এখন , আপনাদের বিবেচনার বিষয় - যারা এই ধরনের মোটা মাথার বুদ্ধি নিয়ে চলে - এবং জনসম্মুখে ভুল-ভাল প্রচার করে বেড়ায় -- তাদের আর কোন কথা কি বিশ্বাস করা যায়?তাদের আইওয়াশের নমুনা তো দেখলেনই।

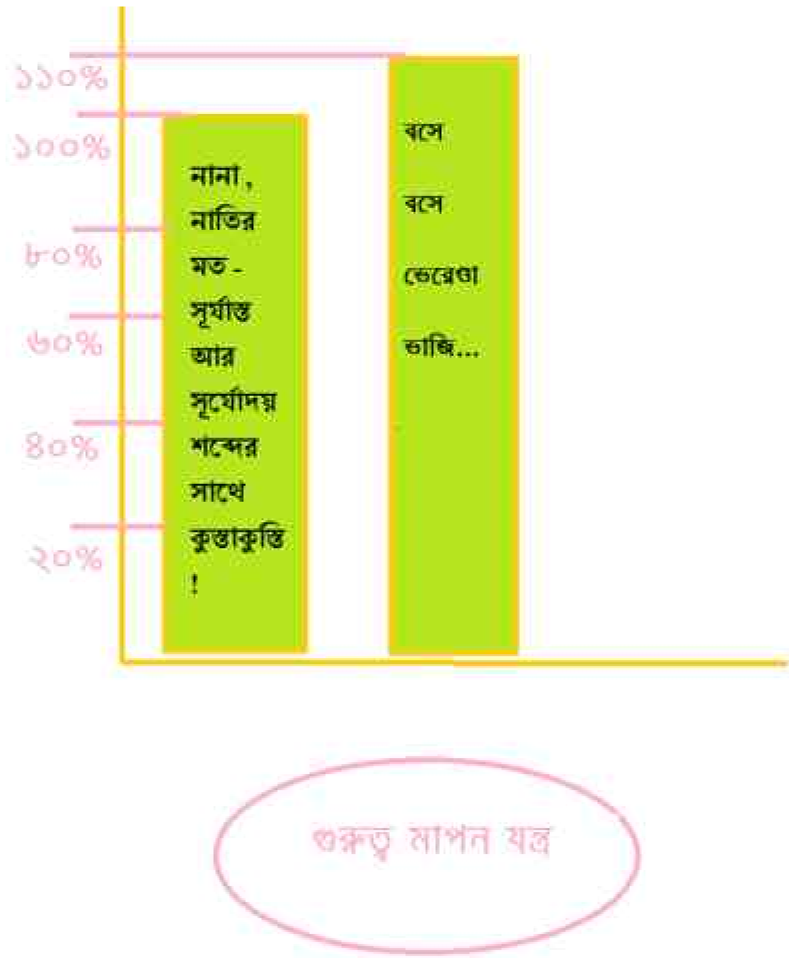
আর চলুন ভাই – আমরা একটা আন্দোলন শুরু করি – যেখানে দাবী করা হবে সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয় এই শব্দদ্বয় ঘোরতর অবৈজ্ঞানিক।আমরা এটা বদল দেখতে চাই – বলাই বাহুল্য এই ধরনের দাবী জানালে সরকার আমাদের ডিরেক্ট হেমায়েতপুর , পাবনায় পাঠিয়ে দেবে- উয়িদাউট অ্যানি হেজিটেশন।আপাতত , মুক্তমনার চিপায় এইগুলা চালাতে হবে।

পৃথিবীর কোথায় – সূর্যোদয় অথবা সূর্যাস্ত শব্দটির অন্য প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হলে(এমনকি নেচার সাময়িকীতেও হলে চলবে) মুক্তমনার পক্ষ থেকে আমাকে যেন একটা ধারাপাত বই দেওয়া হয়।সেগুলো পড়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জন ব্যতীত আর লেখালেখি করবো না।

আসলে , এরকম কিছুই নেই।সবজায়গায় , সর্বদা সূর্যোদয় , সূর্যাস্ত শব্দ ব্যবহার হয়।

বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতায় থাকা – জাপান , গর্বভরে প্রচার করে আমরাই " the land of rising sun" । ওদের ফ্ল্যাগেও সেই সূর্যোদয়ের ছবি।আমি , আপনি যদি যেয়ে সেখানে সেটাকে অবৈজ্ঞানিক বলি– তাহলে লাঞ্ছিত হবার প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে।Wikipedia তে যান – দেখুন জাপান নামের পাশেই জ্বলজ্বল করছে – ল্যান্ড অফ রাইজিং সান।

এইগুলি লিটারাল ইন্টেরপ্রেশন – এইগুলির ভুল ধরতে যাওয়া , আর ভেরেণ্ডা ভাজি করা – উভয়ই একই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।তবে , ভেরেণ্ডা ভাজি আপনি চুপচাপ করলে – কেউ কিচ্ছু বলবে না – কিন্তু ভুল ধরার ক্ষেত্রে হাস্যাস্পদ হতে হয়।



কুরআন ছিল - পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য।

আরবি ভাষায় এর মাধুর্য এতোটাই ছিল যে - হজরত উমর (রা:) খাপছাড়া তলোয়ার নিয়ে মহানবীকে হত্যা করতে গিয়ে - বোন ভগ্নীপতির মুখে কুরআনের আয়াত শুনে , এতটাই চমৎকৃত হয়েছিলেন যে - সেই খাপছাড়া তলোয়ার মহানবীর পায়ের সামনে রেখে - ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছিলেন।আরবের হাতে গোনা শিক্ষিত তরুণদের একজন ছিলেন তিনি।একজন পৌত্তলিক যুবক যার সারাজীবন পৌত্তলিকতায় কেটেছে - সে সেই কুরআন শুনে সব এক নিমেষেই ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলো।

মহানবী (সা:) জীবনে কোন শিক্ষা গ্রহণ করেননি।এমনকি কুরানের অবতীর্ণের আগে লিখতেও জানতেন না- তিনি কিভাবে এই ভুবন-মোহন সাহিত্য মুখে মুখে রচনা করতে পারলেন।

আমরা সে কুরআনের সাহিত্য মাধুর্য কিছুই - অনুভব করতে পারিনা।ঐ-তো , সেদিন হোর্হে বোর্হেস এর সেরা ছোট গল্পগুলি পড়লাম।স্প্যানিশ ভাষায় নাকি , উনার শব্দচয়ন , এবং সাহিত্য মান অসাধারণ।কিন্তু , আমি স্প্যানিশ জানিনা।তাই , কবির চৌধুরীর অনুবাদ পড়লাম।কিন্তু , এতটাই ফালতু লাগলো যে - পড়তে গিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলাম।রবার্ট ফ্রস্টের অনুবাদগুলোর অবস্থাও আরও নিম্নমানের।আসলে - সেই আসল সাহিত্য-মান কখনোই অনুবাদে পাবো না।পাওয়া সম্ভবও

নয়।কবির চৌধুরী বলেছিলেন – তাঁর অনুবাদ বইতে – দুধের স্বাদ ঘোলে মিটানো , আর অনুবাদ দিয়ে আসল কর্ম বিবেচনা একই। মুনতাসীর মামুনের “দি আউট সাইডার” আলবিয়র কাম্যুর লেখা বইটির অনুবাদের মত জঘন্য অনুবাদ পড়েও বই ফেলতে বাধ্য হয়েছি।একবার এক মনিষী – বলেই ফেলেছিলেন – কবিতা অনুবাদ , মানে কবিতাকে গলাটিপে হত্যা করা।ও , হ্যাঁ – মনে পড়েছে – টমাস ট্রান্সট্রয়মোর বলেছিলেন।নোবেল বিজয়ী কবি।অবশ্য , মাঝে মাঝে অনুবাদ ভালোও হয়।আরনেস্ট হেমিংওয়ের “দ্যা ওল্ড ম্যান এন্ড দ্যা সী” বইয়ের অনুবাদটা বেশ সুন্দর।তবে , জীবনে শত শত অনুবাদ বই পড়ার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি – বাস্তবিক-ভাবে – অনুবাদ সর্বদা হয় – জঘন্য নাহয় মাঝারি।ভালো হয় – কোটিতে একবার!

সেরকমই , অনুবাদ পড়ে কুরআনের সেই সাহিত্য-মান আমরা কখনই খুঁজে পাবো না। যে সাহিত্য শুনে, চরম শত্রুর জন্য উত্থিত তলওয়ার হাত থেকে পড়ে যাবে।

অধ্যায় ১০

পাহাড়ের রুট বলবেন না পেরেক বলবেন!!!!

অভিযোগঃ পাহাড় পর্বতকে নাকি পেরেকের সাথে তুলনা করা হয়েছে– এছাড়া নাকি পাহাড়-পর্বতকে নাকি ভূমিকম্প সহনীয় বলা হয়েছে!!!এতে করে নাকি সমতলকে বুঝানো হয়েছে...

জবাব -

ভূ তত্ত্ববিদদের মতে-, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় ৩৭৫০ মাইল।আমরা যে ভূপৃষ্ঠে বসবাস করি, তার বিস্তার মাত্র ১ মাইল থেকে ৩০ মাইল।যেহেতু, ভূস্তরটি পাতলা, সেহেতু ভূমিকম্পের ফলে ভূকম্পন প্রকট আকার ধারণ করতেপারে।তাই, এই পাতলা স্তরটিকে স্টেবল রাখতে পাহাড়ের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।এছাড়াও আমি উপরে ক্রাস্ট সম্পর্কে বলেছি ...
সূরা নাবায় ৬ ও ৭ এ তাই বলা হয়েছে–

"আমি কি ভূমিকে বিছানা করিনি, এবং পর্বতমালাকে পেরেক।"

দেখি বিজ্ঞান কি বলে:

EARTH হচ্ছে সারা-পৃথিবীতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূতত্ত্ব বিষয়েব্যবহৃত প্রাথমিক রেফারেন্স বই।এই বইয়ের অন্যতম লেখন ফ্রাঙ্ক প্রেস যিনি ১২ বছর যাবত আমেরিকার ACADEMY OF SCIENCEs – এর প্রেসিডেন্ট এবং সাবেক আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন।এই বইয়েতিনি যা বর্ণনা দেন – তাঁর সারসংক্ষেপ করলে -

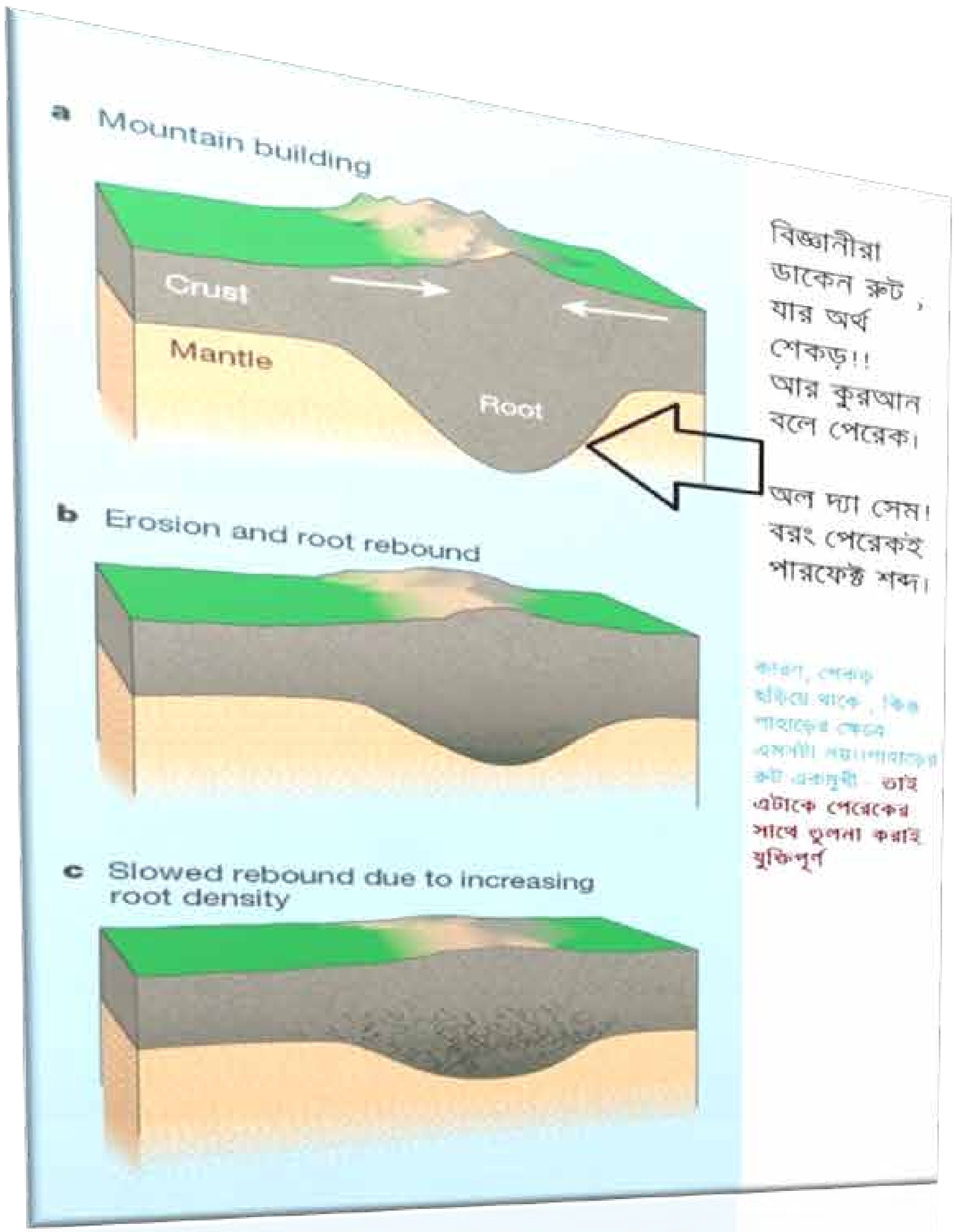
পাহাড়-পর্বতসমূহ পেরেকাকৃতি এবং এগুলো অবিভক্ত বস্তুর এক ক্ষুদ্র অংশ-মাত্রযার মূল ভূ পৃষ্ঠের উপরিভাগ থেকে নীচ-পর্যন্ত দৃঢ় ভাবে বিস্তৃত।এক কোথায় ডঃ প্রেসের মতে –

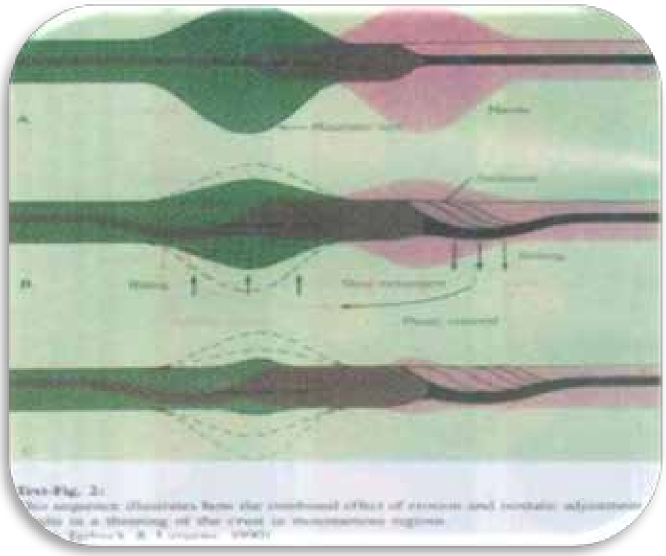
পৃথিবীর কঠিন উপরিতলকে সুস্থিত (stable) রাখতে পাহাড়-পর্বত সমূহের বিরাট ভূমিকা রাখছে।যা বিশ্ববিখ্যাত বই আর্থ এ উল্লেখ করা হয়েছে –

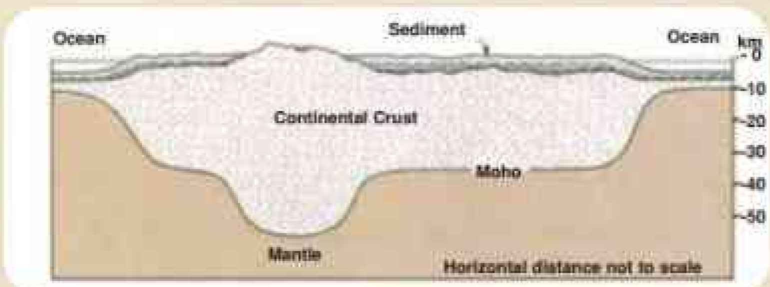
One of the authors of this book is Frank Press, who was the President of the Academy of Sciences in the USA for 12 years and was the Science Advisor to former US President Jimmy Carter. In this book he illustrates the mountain in a wedge-shape and the mountain itself as a small part of the whole, **whose root is deeply entrenched in the ground.** ***According to Dr. Press, the <u>mountains play an important role in stabilizing the crust of the earth.</u>***

Earth, Press and Siever, page. *435*

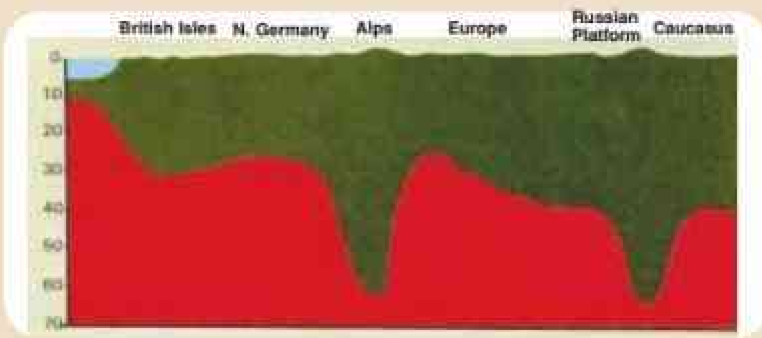
ভূমিকম্পের মাত্রা অনেক অনেক বেড়ে যেতো।পাহাড়-পর্বত গুলি তার রুট(নিম্নাংশ যা অনেকটুকু পর্যন্ত বিস্তৃত) দিয়ে ভূপৃষ্ঠকে ধরে রাখে – এতে ঘনঘন ভূমিকম্প হয় না।আর পাহাড়-পর্বতের এই নিম্নাংশকে বিজ্ঞানী গালভরা নাম– Root (রুট – যার অর্থ শেকড়) বলে ডাকে।বিজ্ঞানীরা একে শেকড় (রুট) বলে ডাকে আর কুরআন বলছে পেরেক।দুটোই একি অর্থ প্রকাশ করে।বরঞ্চ – পেরেকই সর্বোত্তম উদাহরণ হবে।কারণ ... শেকড় ছড়িয়ে থাকে , আর পেরেক একমুখী হয়।পাহাড়ের রুটও একমুখী।


a Mountain building
Crust
Mantle
Root
b Erosion and root rebound
c Slowed rebound due to increasing root density
বিজ্ঞানীরা ডাকেন রুট, যার অর্থ শেকড়!!
আর কুরআন বলে পেরেক।
অল দ্যা সেম! বরং পেরেকই পারফেক্ট শব্দ।
কারণ, শেকড় ছড়িয়ে থাকে, কিন্তু পাহাড়ের ক্ষেত্রে এমনটা নয়। পাহাড়ের রুট একমুখী তাই এটাকে পেরেকের সাথে তুলনা করাই যুক্তিপূর্ণ

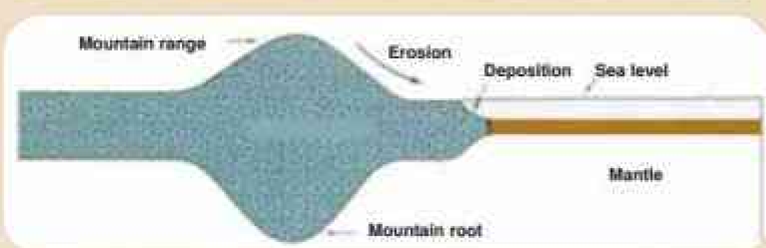




Mountains have roots deep under the surface of the ground. (*Earth*, Press and Siever, p. 413)



Schematic section. Mountains, like pegs, have deep roots embedded in the ground. (*Anatomy of the Earth*, Cailleux, p.220)



Another illustration shows how mountains are peg-like in shape, due to their deep roots. (*Earth Science*, Tarbuck and Lutgens, p.158)

পৃথিবীর উপরিভাগ বিভিন্ন-সংখ্যক প্লেটে বিভক্ত।এগুলোর ঘনত্ব প্রায় ১০০ কিমি। Aesthenosphere নামের একটি ভূগর্ভস্থ অংশে – গলিত মণ্ডলে এই প্লেটগুলি ভাসমান।প্লেটগুলির সীমানায় পাহাড়-পর্বত গঠিত হয়।সমুদ্রের নিম্নে ক্রাস্ট মাত্র ৫ কিমি পুরু।আর , উপরিতল হতে – ৩০ কিমি।আর পাহাড় থেকে **প্রায় ৮০ কিমি।** তাহলে নিজেই চিন্তা করে দেখুন – কেন পাহাড়-পর্বত কে পেরেক এবং দৃঢ়ভাবে বা মজবুত-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়েছে –

আর পাহাড়-পর্বত -- তিনি তাদের মজবুত-ভাবে বসিয়ে দিয়েছেন -- (সূরা আন-নাযিয়াত-৩২)[10]

এছাড়াও – কুরআনের –

আর পাহাড়-পর্বতের দিকে -- কেমন করে তাদের স্থাপন করা হয়েছে (৮৮:১৯)

তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে(ভূমিকম্প) (৩১:১০)

এবং তিনি পৃথিবীর উপর বোঝা রেখেছেন যে, কখনো যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে-দুলে(ভূমিকম্প) না পড়ে এবং নদী ও পথ তৈরি করেছেন, যাতে তোমরা পথ প্রদর্শিত হও। (১৬:১৫)

নদী আর পথ কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় – এখানে পৃথিবীর উপরিতল অর্থাৎ ক্রাস্টের কথা বলা হয়েছে – আর এরউপরেই পাহাড়-পর্বত স্থাপনের কথা বলা হয়েছে।

এছাড়া এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে একটি অতি বিখ্যাত বই পড়ে দেখবেন –

The geological concept of Mountains in the Quran – written by Z.R. EL Naggar

ঐ বইয়ের ৬০ নং পেজে উল্লেখ করা হয়েছে-

“The role of mountains as stabilizers for the Earth’s crust can be clearly seen in their very deep roots , and can be clearly seen in their very deep roots , and can be justified by the fact that the motions of the *lithospheric plates only come to halt when a continent collides with another* , producing a collisional type mountain , which is believed to be the last phase in mountain building . Without mountains , the movement of lithospheric plates would have been much faster and their collision more drastic.”

এখানে বলা হচ্ছে -

পাহাড়-পর্বত ছাড়া লিথোস্পেরিক প্লেটগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ আরো বেশি বেশি এবং ভয়ানক হত। এর ফলে পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টি কারণে ভূমিকম্পের মাত্রা হ্রাস পেয়েছে।

---

[10] তোমরা কি ভেবে দেখ নি আল্লাহ্ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন সাধু কথাকে উৎকৃষ্ট গাছের সঙ্গে, যার শিকড় হচ্ছে মজবুত ও যার ডালপালা আকাশে, (১৪:২৪) – ঐ আয়াতের অনেক আগেই কুরআন বলে দিয়েছে – যে “ শিকড় বোঝাতে মজবুত” কি অসামান্য মিল – এখানেও তেমনি – মজবুত বলতে পাহাড়ের রুট অর্থাৎ শিকড়কেই বুঝানো হচ্ছে।এছাড়া । উপরের , “ভাবছো” – অংশটি দেখুন।

সৃষ্টির শুরুতে আল্লাহ্ যদি লিথোস্পেরিক প্লেট গুলোর চরম সংঘর্ষের ফলে – পাহাড় পর্বতগুলি সৃষ্টির ব্যবস্থা না রাখতেন – তাহলে এই পৃথিবী আর বসবাসযোগ্য হত না।লিথোস্পেরিক প্লেটগুলির সংঘর্ষের মাধ্যমে পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হবার প্রক্রিয়ার ফলেই – পৃথিবীতে ভূমিকম্পের মাত্রা কমে এসেছে।এইসব প্লেটের সংঘর্ষে পাহাড় সৃষ্টির প্রক্রিয়া না থাকলে – এই পৃথিবীতে মোটেই বসবাস করা যেত না।কারণ , অসামান্য ভূকম্পনের জন্যে।কুরআনে উল্লেখিত – হেলে-দুলে পড়া বারবার ঘটতো।এই প্রসঙ্গেই –

www.elnaggarzr.com/en/main.php?id=54

বিস্তারিত দেখতে – উপরের লিঙ্কে

এজন্যই কুরআনে বারে বারে পাহাড় সম্পর্কিত আয়াত গুলি বলা হয়েছে।

এইবার বুঝতে পারছেন তো – যেই অংশগুলি অবৈজ্ঞানিক লাগতো – সেই অংশটি আসলে – আরো ঘোরতর বৈজ্ঞানিক।আপনি যদি –ভূগোলের ছাত্র হতেন তাহলে অবশ্যই এইগুলি আগে থেকেই বুঝে যেতে পারতেন।কিন্তু , অল্প বিদ্যা নিয়ে কখন সবকিছু বিচার করতে নেই।করতে গেলে এরকম ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক।তাই , বেশি বেশি জানার বিকল্প নেই।

এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে – সূরা আনকাবুতের , ৪৩ নং আয়াতের -

এ সকল উদাহরণ আমি মানুষের জন্যে দেই; কিন্তু জ্ঞানীরাই তা বোঝে।

আমারাও প্রজ্ঞার সাথে চিন্তা করলে বুঝতে পারি – এইগুলি।

রেফারেন্স দেখুন -

1/ *Earth, Press and Siever, page. 435*

2/ *Earth Science, Tarbuck and Lutgens, page. 157- 158.*

3/ The geological concept of Mountains in the Quran – written by Z.R. EL Naggar. page – 60

পৃষ্ঠাসহ উল্লেখিত।এইবার কি বলবেন।

কোন বিষয় সম্পর্কে লেখালেখি করতে হলে একটু জেনে রাখতে হয়– আপনি সেই নিয়মকে বরাবরের মত উপেক্ষা করেছেন।ধর্ম বধের আনন্দতে চোখ – কান বুঝে লাফঝাপ দিতে হলে- অবশ্যই একটু দেখে শুনে দিবেন।

আশা করি , পরামর্শটা মনে রাখবেন।[11]

11 http://geoscience.wisc.edu/~chuck/Classes/Mtn_and_Plates/mtn_roots.html পাহাড়-পর্বতের নিম্নাংশ অর্থাৎ রুট সম্পর্কে সম্পর্কে জানতে দেখুন ...
এছাড়াও বিস্তারিত জানতে দেখুন - http://www.answering-christianity.com/mountains.htm অংশটি।

অধ্যায় ১১

আকাশ নিয়ে ইতং বিতং

আকাশ সম্পর্কে কুরআনে কিছু আয়াত দেখি–

আর আমরা আকাশকে করেছি এক সুরক্ষিত ছাদ। কিন্তু তারা এর নিদর্শনা-বলী থেকে বিমুখ থাকে (২১:৩২)

কুরআনে এরকম আরো কিছু আয়াত আছে– যেগুলো বলছে – আল্লাহ আকাশকে করেছেন – সুরক্ষিত ছাদ।নাস্তিকরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে – এই আয়াত দ্বারা ছাদকে শক্তসমর্থ কিছু বোঝানো হচ্ছে।অথচ , আমরা জানি আকাশ একটি বায়বীয় আস্তরণ বৈকি আর কিছুই নয়।হ্যাঁ , কথা আসলেই সত্য।এখানে– আকাশকে ছাদ বলার কারণ , একমাত্র তারাই বুঝবে – যাদের এই সম্পর্কে জ্ঞান আছে।

এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে – আমরা জানতে পেরেছি – আকাশ আসলেই সুরক্ষিত একটি ছাদ।আসুন দেখি -

১ – আকাশের নামক যে বায়বীয় আস্তরণ রয়েছে– আমাদের উপরে সেটা এতোটাই আমাদের পৃথিবীকে সুরক্ষা দিতে পারে যে – অনেক ছোট বড় ধ্বংসপ্রাপ্ত উল্কাপিণ্ড পৃথিবীতে এসে পড়তে চায়– এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আকাশ আমাদের সুরক্ষা দেয়।



This illustration shows meteors that are about to crash into the earth. The celestial bodies wandering in space could pose a serious threat to the Earth. Yet, God, He Who creates most perfectly, has made the atmosphere a protective roof. Thanks to this special protection, most meteoroids do not harm the Earth, as they fall to pieces in the atmosphere.

২- যেসব রশ্মি বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আমাদের মধ্যে এসে পড়তে চায়– বায়ুমণ্ডল সেগুলোকে ফিল্টার করে।মজার বিষয় – একমাত্র ক্ষতিকর রশ্মিগুলোকে বায়ুমন্ডল ঢুকতে দেয় না – এছাড়া সকল প্রয়োজনীয় রশ্মিকে ঢুকতে দেয়।নিয়ার আলট্রা ভায়োলেট রে যা সালোকসংশ্লেষণ এর জন্যে দরকারি সেটাকে আকাশ ঢুকতে দিলেও– ক্ষতিকর আলট্রা ভায়োলেট রে কে

বায়ুমন্ডলের ওজোন স্তর ঢুকতে দেয় না।কারণ , সেটা প্রাণের জন্যে ক্ষতিকারী।আল্ট্রাভায়োলেটরশ্মির অত্যন্ত সীমিত আর অতি প্রয়োজনীয় অংশ ভূ-পৃষ্ঠে এসে পোঁছে। বাকি টুকুকে আর বায়ুমণ্ডল ঢুকতে দেয়না।

৩ – বায়ুমণ্ডল আমাদের আবহাওয়াকে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা করে– আবহাওয়াকে প্রাণের জন্যে অনুকূল করে রাখে। বায়ুমণ্ডল , মহাশূন্যের শীতল তাপমাত্রা যা -২৭০ডিগ্রি থেকে আমাদের রক্ষা করে– প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা বজায় রাখে।

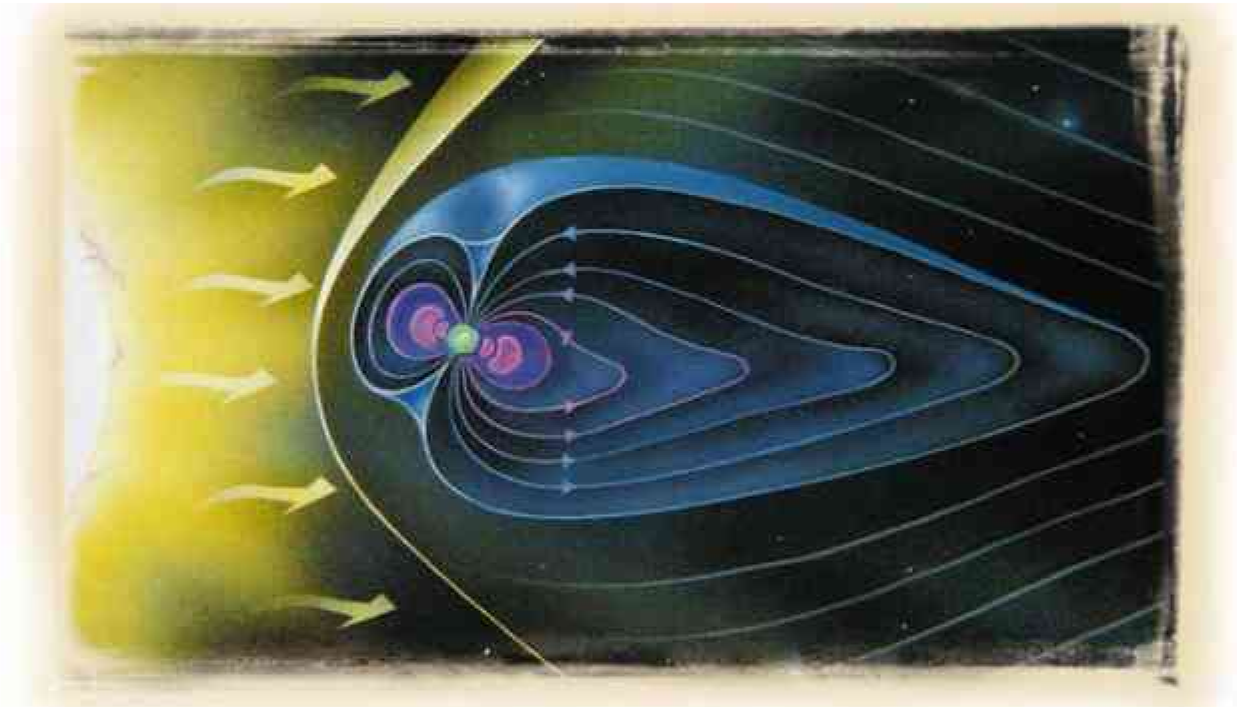


As we move from the Earth, which is perfectly fitted for human life, beyond the atmosphere into the space, we come across a freezing cold. The world is protected from the freezing cold of space, which is around -270 degrees, by the help of the atmosphere.

৪ - সূর্যে প্রতি মিনিটে বিস্ফোরণের ফলে নির্গত শক্তি যে কি পরিমাণ ক্ষমতা রাখে তা মানুষ কখনই চিন্তা করতে পারবে না।এর একটিমাত্র বিস্ফোরণ হিরোশিমায় পতিত ১০০বিলিয়ন এটম বোমার সমান। বায়ুমণ্ডল আর ভ্যান এলেন বেল্টের জন্য এই শক্তির ক্ষতিকর দিক থেকে মহাবিশ্বে আমরা নিরাপদ থাকতে পারি।

৪ - ম্যাগনেটোস্ফিয়ার স্তর ,যা পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ড দ্বারা তৈরি– একটা প্রতিরক্ষা বর্ম হিসেবে কাজ করে পৃথিবীকে ক্ষতিকর রশ্মি - মহাশূণ্যজাত বস্তুর ক্ষতিকর কসমিক রশ্মি এবং কণাসমূহ থেকে নিরাপদে রাখার কাজ করে।ছবিতে ম্যাগনেটোস্ফিয়ার লেয়ার ,যা ভ্যান এলেন বেল্ট নামে পরিচিত।এইসব বেল্ট পৃথিবীর প্রায় হাজার কিমি উপরে অবস্থিত হয়ে - মারাত্মক ক্ষতিকর শক্তি থেকে পৃথিবীর জীব জগতকে রক্ষা করে যাচ্ছে।এবার , আপনিই বলুন – যদি – আপনি এই আকাশের স্রস্টা হতেন , এবং এইভাবে আপনার সৃষ্টিকে রক্ষা করতেন– তাহলে কি আপনি বলতেন না – আকাশ একটি সুরক্ষিত ছাদ।অবশ্যই বলতেন।মহান আল্লাহ – তাইই করেছেন।তিনি আকাশকে একটি সুরক্ষিত ছাদ হিসেবে বলেছেন।

আর বাস্তবিকই আমরা আকাশে দুর্গ তৈরি করেছি, আর তা সুশোভিত করেছি দর্শকদের জন্য। (১৫:১৬) – বাস্তবিকই – এর চেয়ে বড় কোন দূরগ মানুষ কখনও সরিসটি করতে পারবে না।



The magnetosphere layer, formed by the magnetic field of the Earth, serves as a shield protecting the earth from celestial bodies, harmful cosmic rays and particles. In the above picture, this magnetosphere layer, which is also named Van Allen Belts, is seen. These belts at thousands of kilometres above the earth protect the living things on the Earth from the fatal energy that would otherwise reach it from space.
All these scientific findings prove that the world is protected in a very particular way. The important thing is that this protection was made known in the Qur'an in the verse "We made the sky a preserved and protected roof" 1,400 years ago.

৫ – আকাশের ৭টি স্তর রয়েছে।আধুনিক বিজ্ঞানীরা এদের নামকরণ করেছেন– ১. ট্রপোস্ফিয়ার ; ২. স্ট্রাটোস্ফিয়ার ; ৩. ওযোনোস্ফিয়ার ; ৪. মেসোস্ফিয়ার ; ৫. থার্মোস্ফিয়ার ; ৬. আয়নোস্ফিয়ার ;৭. এক্সোস্ফিয়ার–

এদের প্রত্যেকের আলাদা নামকরণ করা হয়েছে- কারণ , এদের প্রত্যেকের কাজ আলাদা আলাদা।কুরআন শরিফে তারই উল্লেখ আছে -

তারপর তিনি তাদের সম্পূর্ণ করলেন সাত আসমানে, দুই দিনে[12], আর প্রত্যেক আকাশে তিনি আদেশ করেছেন তার করণীয়। (৪১:১২)

আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন – এক এক আকাশের স্তরের এক , এক কাজ।

বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করত সক্ষম হয়েছেন যে - , বায়ুমণ্ডল বিভিন্ন স্তর নিয়ে গঠিত। চাপ ও গ্যাসের প্রকারের মত ভৌত গুণাবলী দ্বারা এইসব স্তরগুলো ভাগ করা হয়েছে।আমাদের ভূপৃষ্ঠের সবচেয়ে কাছের স্তরটি হল ট্রপোস্ফিয়ার। বায়ুমণ্ডলের প্রায় ৯০% নিয়ে এই স্তরটি গঠিত হয়েছে। ট্রপোস্ফিয়ার এর উপরের স্তরটি হল - স্ট্রাটোস্ফিয়ার। ওজোন স্তর হচ্ছে স্ট্রাটোস্ফিয়ারের একটি অংশ যেখানে অতি বেগুনী রশ্মি শোষিত হয়ে থাকে। স্ট্রাটোস্ফিয়ারের উপরের স্তরটিকে চিহ্নিত করে বলা হয় মেসোস্ফিয়ার। মেসোস্ফিয়ারের উপরিস্থলে থাকে থার্মোস্ফিয়ার। এই স্তরে আয়নে পরিণত গ্যাসগুলো একটি স্তর তৈরি করে যার নাম - আয়নোস্ফিয়ার। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে বাইরের স্তরটি– এক্সোস্ফিয়ার, যা ৪৮০ কিলোমিটার থেকে ৯৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত।

এইবার এক নাস্তিকের প্রশ্ন – সবই বুঝলাম – কিন্তু , এখানে আল্লাহ , আকাশকে সলিড কোন পদার্থ বুঝিয়েছেন।অভিযোগ করতে গিয়ে – আঙ্গুল কয়েকটি আয়াতের দিকে –

যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে(৮২:১)

যখন আকাশ খণ্ডবিখণ্ড হবে,(৮৪:১)

আর যখন আকাশ ভেঙ্গে পড়বে,(৭৭:৯)

আর যখন আকাশের ঢাকনি খুলে ফেলা হবে,(৮১:১১)

---

[12] এখানে – দিন বলতে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে(ইয়ম' ব্যবহার না করে 'আইয়াম' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। পুরো 'আইয়াম' শব্দের অর্থ লম্বা সময়) – সেটা আমাদের দিনের মত নয় – এটা হচ্ছে – দুইটি নির্দিষ্ট সময়। আমাদের মহাবিশ্বকে – আল্লাহ বলেছেন , ছয় দিন অর্থাৎ ছয়টা নির্দিষ্ট সময়ে তৈরি করেছেন – আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের তাইই বলে – এই ছয়টা পিরিয়ড হল –

1| Time Zero
2| Inflation
3| Annihilation
4| Proton and Neutron
5| Atomic Nuclei
6| Stable atom

আর আকাশ বিদীর্ণ হবে, ফলে সেইদিন তা হবে ভঙ্গুর;(৬৯:১৬)

আকাশ হবে বিদীর্ণ? তাঁর ওয়াদা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।(৭৩:১৮)

আর সেই দিন আকাশ বিদীর্ণ হবে মেঘমালার সঙ্গে(২৫:২৫)

উপরের আয়াতগুলি হচ্ছে – আকাশকে নাকি কুরআনে সলিড বলা হয়েছে– সেই প্রোপাগান্ডার অস্ত্র।এখানে – আয়াতগুলির দিকে খেয়াল করুন – এখানে বলছে – যখন হবে।আয়াতগুলি আগে পরে পড়লে– আমরা জানতে পারি যে , এটা মহাপ্রলয়ের সময়কার ঘটনা।সে সময় এমনটা ঘটবে।কি কি ঘটবে?এখানে বলছে– আকাশ বিদীর্ণ হবে।এর মানে হচ্ছে – আকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।আমরা এখন জানি – দিনে দিনে আমাদের ওজোন লেয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।মহাপ্রলয়ের সময়– আল্লাহ আমাদেরকে আকাশ দিয়ে যেভাবে সুরক্ষিত করছে– ঠিক মহাপ্রলয়ের দিন – সেই সুরক্ষিত ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়া হবে।কারণ , সেদিন সব ধ্বংস করে দেয়া হবে।"ঢাকনি খুলে ফেলা"- এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে – সেই সুরক্ষিত ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে।আমাদের যে লেয়ার সুরক্ষা দিচ্ছে– সেটা ধ্বংস হয়ে যাবে।আকাশ ভেঙ্গে পড়বে – মানে সেই সুরক্ষিত ছাদ ধ্বংস হয়ে যাবে – যেটা আমাদের প্রটেক্ট করছে।ইচ্ছাকৃত ভাবেই আল্লাহ আমাদের উপর থেকেই , মহাপ্রলয়ের দিনে সেই সুরক্ষিত ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিবেন।প্রোপাগান্ডা চালাতে গিয়ে আরো বড় সত্যই বের হয়ে আসে।[13]

নাস্তিক ব্যক্তিটি আবারো প্রশ্ন করতে পারে – আচ্ছা বুঝলাম – কিন্তু , এখন মনে সংশয় – এখানে সলিড না বলা হলে – অন্য জায়গায় কি কিছু বলা হয়েছে – যাতে আমরা সিউর হতে পারি যে – আকাশ , কুরআন অনুযায়ী সলিড নয়।

---

[13] এখানে নাস্তিকদের আরো একটা প্রপাগান্ডা হচ্ছে - আল্লাহ আকাশকে নিয়ে একটা আয়াত বলেছেন -
"আর 'আমরা আকাশে আড়ি পাততাম, কিন্তু আমরা তাকে দেখতে পেতাম কড়া প্রহরী ও অগ্নিশিখা দিয়ে ভরপূর,'আর আমরা (জীন) নিশ্চয় তার মধ্যের বসবার জায়গাগুলোয় বসে থাকতাম গুনবার জন্য, কিন্তু যে কেউ শুনতে চায় সে এখন দেখতে পায় তার জন্য রয়েছে অগ্নিশিখা অপেক্ষারত্ (সূরা জীনঃ১৮)
এখানে আসলে – বলা হয়েছে রূপক অর্থে।এখানে –জিন যখন আল্লাহর ওহী সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করতো – তখন তাঁরা দেখতো – উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপিত হচ্ছে।বাস্তবিক আমরা জানি – অগ্নিপিণ্ড অর্থাৎ মহাকাশে উল্কাপাত হয়ে থাকে।এখানে , আমাদের ঊর্ধ্বাকাশ বোঝানো হয়নি – এখানে বোঝানো হয়েছে – অনন্ত মহাকাশকে(৬৭:৫)এ দেখুন - আর আমরা নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করে রেখেছি প্রদীপমালা(তারকামন্ডল) দিয়ে, আর আমরা তাদের বানিয়েছি শয়তানদের জন্য ভাঁওতার বিষয়; আর আমরা তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি(৬৭:৫)।এখানে কড়া প্রহরী বলতে – বলা হয়েছে – ফেরেশতাকে।এই আয়াতের রূপক অর্থ হচ্ছে – ফেরেশতা যা কল্যাণের প্রতীক এবং জিন যা অকল্যাণের প্রতীককে উল্কাপাতের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হয়।এখানে– উল্কাপাতের কথাই বলা হচ্ছে – যা অকল্যাণকে ধ্বংস করে।আল্লাহ , ঠিক এভাবেই – দুর্যোগকে বলেছেন – আল্লাহর পক্ষে থেকে রোষ।কিন্তু , আমরা এটা জানি – এটা প্রাকৃতিক অবস্থা , বায়ুর চাপ সহ ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণে ঘটে।আসলে – আল্লাহ্ই , ঠিক এরকম প্রাকৃতিক অবস্থা সৃষ্টি করে।মহাকাশে অগ্নিশিখা অর্থাৎ উল্কাপাতের মাধ্যমে– আল্লাহ এখানে জিন জাতির প্রয়াস অর্থাৎ অকল্যাণকে ধ্বংস করবার কথাই রূপক অর্থে বলেছেন।[13]

এখানে – প্রসঙ্গত একটা কথা না বলে থাকতে পারলাম না।নাস্তিকরা বলে– শবে মেরাজ , জিন , শয়তান – এসবের অস্তিত্ব বিজ্ঞান এখনো প্রমাণ করতে পারেনি।তাই বিশ্বাস করতে পারলাম না।হ্যাঁ , যৌক্তিক কথা।তবে উত্তর হবে– বিজ্ঞান এখনো সংজ্ঞায়িত করতে পারেনি , প্রমানের কথা তাই আসছে না।আচ্ছা– প্রবাবিলিটির অঙ্ক কি জানেন?এটা জানানো প্রয়োজন মনে করছি– পৃথিবীতে পরম সত্য এবং পরম মিথ্যা দুইটা সম্পূর্ণ দুই জিনিস।একটা জিনিস আরেকটার সাথে মিশবে না।তেল জলের মত।যেমন – স্রস্টা থাকলে – বিবর্তনবাদ সত্যি হবে না।আর যদি – স্রস্টা না থাকে – তাহলে যতই অযৌক্তিক , অপ্রমাণিত বিবর্তনবাদ হোক না কেন– সেটা সত্যই হবে।যদি কোন জিনিস – ৯৯% সত্য হয় – তাহলে তার সাথে যে ১% অপ্রমাণিত রয়েছে– তা অচিরেই প্রমাণিত হবে।যদি , প্রমাণিত না হয়ও – তবুও ভুল হবে না।আসুন দেখি – সত্য ৯৯% হলে ১% অসংজ্ঞায়িত হলে– উত্তর হবে – সত্যটার সাথে ঐটা মিলবেই।আর মিথ্যা ৯৯% হলে– আর ১% অসংজ্ঞায়িত হলে – সেটা অবধারিত ভাবে মিথ্যাই হবে।যেমন , ফ্লায়িং স্পেগেটি মনসটাররা বলে– জলদস্যু কমলে কেয়ামত হবে।আমাদের এর সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষমতা নেই– যেমনটা আমাদের ক্ষেত্রেও ঈসা আঃ এলেই কেয়ামত হবে।দুটোই বিশ্বাস – এবং অসংজ্ঞায়িত।কিন্তু , দেখতে হবে – স্পেগেটি মনস্টার অনুসারীদের বর্তমানে কতটুকু সত্যি হাতে আছে।উত্তর – ০% , ৯৯% ই মিথ্যা।ওদের রীতি-নীতি ঠিক নেই।গ্রন্থ মানুষের হাতে লেখা।গ্রন্থে কোন মিরাকল নেই।নিজেরাই নিজেরাই এইসব বের করেছে।প্রফেসি নেই।মানে – ওদের নিয়ে গবেষণা করলে- ৯৯% ই মিথ্যা পাওয়া যাবে।তাই– জলদস্যু কমার ১% অসংজ্ঞায়িত কথাও সেই মিথ্যার ভাগাড়ে যাবে।কারণ ,পরম সত্য মিথ্যা মিশ খায় না।অন্যদিকে – ইসলামের যে ৯৯% আছে– সেগুলো প্রতিনিয়ত সত্যি হচ্ছে।কুরআন থেকে ভুল বের করার চেষ্টা বৃথা।হাজার হাজার মিরাকল। তার মানে – ৯৯%ই সত্য।তাহলে – ঐ ১% সত্যি হতে বাধ্য।এভাবেই – জিন , ঈসা আঃ , শয়তান এগুলোর উপরে যৌক্তিক ভাবে বিশ্বাস স্থাপিত হয়।এটা , মোটেও অযৌক্তিক নয় – বরং সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।(দৃষ্টিভঙ্গি সংশয়ী ধাচে লেখা , মুসলিম ভাইরা ভুল বুঝবেন না।)

- হ্যাঁ , আল্লাহ বলেই দিয়েছেন – আকাশ আসলে সলিড নয়। সেদিনের ঘটনা – অর্থাৎ , মহাপ্রলয়ের দিন বলা হয়েছে – সেই সুরক্ষিত ব্যবস্থা ধ্বংস হবে।আকাশ বিদীর্ণ হবে।

- সুতরাং তুমি অপেক্ষা কর সেই দিনের যখন আকাশ নেমে আসবে **প্রকাশ্য ধোঁয়া** নিয়ে, -- (৪৪:১০)

আকাশ যে সলিড নয় – বরং বায়ুমণ্ডল।সেটা বলা হয়েছে – উপরের আয়াতে।আকাশ নেমে আসবে , তার প্রকাশ্য ধোয়া , অর্থাৎ এটা বুঝাচ্ছে – আকাশ মোটেই সলিড নয়।আকাশ হচ্ছে – বায়বীয় একটা আস্তরণ।

আকাশ যে সলিড নয় – বরং একটি শূন্যগর্ভ – সেটা আল্লাহ বলেছেন – নিচের আয়াতে -

- তারা কি পাখিদের লক্ষ্য করে না -- **আকাশের শূন্যগর্ভে** ভাসমান? আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ ওদের ধরে রাখে না। নিঃসন্দেহ এতে প্রকৃত নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা বিশ্বাস করে।(১৬:৭৯)

আকাশ যে কোন সলিড কিছু নয় – বরং একটি বায়ুমণ্ডলের আবরণ সেটা আমরা নিচের আয়াতেই দেখি –

- যখন **আকাশের আবরণ অপসারিত** হবে, (৮১:১১)

এই আয়াত দ্বারা , আমাদের কাছে – আবারো পরিষ্কার যে – মহাপ্রলয়ের দিনে – যে আকাশ ধ্বংস হবে – সেটা কোন সলিড কিছু নয়।বরং – সেটা হচ্ছে – একটা বায়বীয় আবরণ।

এরপর কুরআন আরো একটা তথ্য দিলো –

আল্লাহ, যিনি উর্ধ্বদেশে স্থাপন করেছেন আকাশমন্ডলীকে স্তম্ভ ব্যতীত। তোমরা সেগুলো দেখ।(১৩:২)

আগেকার যুগে , মানুষ মনে করতো – আকাশ কোন একটা পিলারের উপরে দাঁড়িয়ে আছে।কিন্তু , বাস্তবে , এমনটা নয়।বাস্তবে – আকাশ অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলকে ধরে রাখা হয়েছে – গ্রাভিটির মাধ্যমে।অর্থাৎ - মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মাধ্যমে।

হ্যাঁ , কুরআনে সেই কথাই বলা হয়েছে – কয়েক সূরা পরে।

- আর আকাশকে, -- তিনি তাকে সমুচ্চ করেছেন, আর তিনি স্থাপন করেছেন ***দাঁড়িপাল্লা।***(৫৫:৭)

আল্লাহ আকাশকে সৃষ্টি করে – মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মাধ্যমে – আমাদের উপরে তুলে ধরে রেখেছেন।আল্লাহ , সুকৌশলে– বলেছেন – দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করেছেন।আকাশের আয়াতে দাঁড়িপাল্লার আগমন– এর কারণ , অত্যন্ত সুস্পষ্ট।১৪০০ বছর আগে – আকাশের সাথে দাঁড়িপাল্লার সম্পর্ক খুঁজতে গেলে– হয়রান হয়ে ফিরতে হত।কিন্তু , আজকে আমরা জানি– আল্লাহ দাঁড়িপাল্লা (সে সময়ে মাধ্যাকর্ষণ শব্দের উৎপত্তি হয়নি) স্থাপন করেই– আমাদের আকাশকে কোন স্তম্ভ বা পিলার ছাড়াই তুলে ধরে রেখেছেন।এটা কুরআনের আরো বড় একটা মিরাকল।

আমার পরিচিত একজন নাস্তিক আছে– যে কিছুক্ষণ তর্ক বিতর্ক করে ক্ষান্ত হয়ে গিয়ে– বলে – এই যে আমি তাফসীর খুললাম – কই , কোথাও-তো ব্যাখ্যা নেই!

এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনা-বলী প্রদর্শন করাব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ কোরআন সত্য। আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্য-দাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়? (সূরা-ফুসিলাত- ৫৩)

আল্লাহ , বলেই দিয়েছেন – কুরআন যে সত্যি – তার নিদর্শনা-বলী – আল্লাহ আমাদের ভবিষ্যতে দেখাবেন।তাফসীর– হচ্ছে – ব্যাখ্যা।যা , আমরা একেকজন ব্যাখ্যাকারীর একেকরকমের মত দেখি।যে সময়ে লেখা , সে সময়ের মতাদর্শ ঢুকে যায়।

আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনা-বলী প্রদর্শন করাব– এর মাধ্যমে , আমরা বুঝে যে – নিদর্শনা-বলী এখন অনেক দেখা হয়নি – যতই আমাদের জ্ঞান বাড়তে থাকবে – ততই আমরা , বুঝতে পারবো – কুরআনের আয়াতগুলি।আর কুরআনের আয়াত সম্পর্কে – আল্লাহ বলেছেন –

তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিতনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশে তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর।(৩:৭)

হ্যাঁ , যাদের অন্তরে কুটিলতা আছে– তারাই এর অপব্যাখ্যা করতে থাকবে।করতেই থাকবে।এতে কিছু আসে যায় না।এধরনের মানুষ অনেক কম।আমি এই বইয়ে অপব্যাখ্যাগুলির– ময়নাতদন্ত করে – সঠিক ব্যাখ্যাগুলি আপনাদের সামনে হাজিরের চেষ্টা করেছি।কতটুকু সফল হয়েছি জানিনা , তবে অনেককেই বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে– এই কুরআন আসলেই সত্যও।অপব্যাখ্যা করতে গেলে– সঠিক ব্যাখ্যাটিই বের হয়ে আসবে।যা আমরা প্রতি পদে পদেই দেখেছি।

অধ্যায় ১২

নামাজের সময় , কিবলা

দিক নির্ণয় নিয়ে কিছু দুর্বল মস্তিষ্কের হাস্যকর আস্ফালন ...

অনেকে বলেন – উত্তর মেরু – দক্ষিণ মেরুতে এক এক দিন ছয়মাসের সমান– সেখানে মানুষ কিভাবে নামাজ পড়বে।আসলে - সরল মনে প্রশ্ন করে থাকলে কোনই সমস্যা ছিল না।কারণ পুরো উত্তর মেরুতে ৭০ জনের বেশি বসবাস করে না।তাঁর মধ্যে ৯৫%ই আবার অস্থায়ী পাইলট।কিন্তু , অন্তরের কুটিলতা নিয়ে চলা– এই মানুষদের প্রশ্ন - তাহলে ইসলাম যেহেতু এদের বিধান দেয়নি – তাঁর মানে নবী সা: এর ধারনা ছিলো – পৃথিবী সমতল।বড়ই মজার বিষয়।নাস্তিকদের কল্পনাশক্তি প্রশংসনীয়।অতি প্রশংসনীয়।

প্রথম কথা উনারা জানেনই না – ইসলাম এই সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান হাদিসেই দিয়ে দিয়েছেন।একটা হাদিসের একাংশে – উল্লেখিত -

সুনানু ইবনে মাজাহ্ :: হাদিস ৪০৭৫

ফিতনা অধ্যায়

“...আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! যে দিনটি এক বছরের সমান হবে তাতে একদিনের নামায পড়লেই কি তা আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বলেন: তোমরা সে দিনের সঠিক অনুমান করে নিবে এবং তদনুযায়ী নামায পড়বে।...”

উপরের হাদিস থেকেই - সুস্পষ্ট – যে ইসলাম এই সম্পর্কিত বিধান দিয়ে দিয়েছে।অথচ , নাস্তিকরা বলে– এটা নাকি কুরআন হাদিসে নেই।আমাদের আর অপেক্ষা করবার প্রয়োজন নেই– সেই স্থানে গেলে – ঘড়ি দেখেই আমরা আমাদের নামাজ সময়মত পড়ে নিবো।

আসলে – এইসব প্রশ্ন আজন্ম হিন্দুরা যারা নাস্তিক ছদ্মবেশে – ইসলামের সমালোচনায় মুখর।সমালোচনা করুক – তবে না জেনে শমশেরের মত কথা বললে মাঝে মাঝেই বিরক্ত হই।যাকে বলি– মহা-বিরক্ত।এইসব সমস্যার সমাধান – কোন ইসলাম বিশেষজ্ঞ থেকেই নিয়ে নিলেই হয়।

ইসলাম হচ্ছে – পৃথিবীর শেষ ধর্মগ্রন্থ।একাধারে – নবুয়তের শেষ হয়েছে – ২ লাখ কিংবা ১ লক্ষ ৪০ হাজার নবীদের মাধ্যমে। সেইসব ধর্মগ্রন্থে – আপডেট সিস্টেম না থাকলেও – ইসলামে আছে ।সেটা হল – কিয়াস।যেকোনো মুমিন মুসলিম – ইসলামের কুরআন , হাদিস ও ইজমার আলোকে নিজ থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।তবে– সেটা ক্রমিক গুরুত্ব অনুসারে পরস্পরবিরোধী হতে পারবেনা।সৌভাগ্যবশত – এখানে – হাদিসেই সেই সমস্যার সমাধান দিয়ে দেয়া হয়েছে।নাস্তিকরা হয়ত এটা আশা করেনি!!!

এখানে আরজ আলী মাতুব্বরের একটা বই – “সত্যের সন্ধানে” – তিনি উল্লেখ করেছেন – রোজার সময় নিয়ে কথা।তিনি রোজা রেখে প্লেনে করে অন্য জায়গায় গেলে কি হবে।উত্তর খুবই সোজা– তিনি যেখানে সূর্যোদয় হতে দেখবেন – সেখানেই রোজা রাখবেন।আর যেখানেই – সূর্যাস্ত সেখানেই রোজা ভাঙবেন।এটাই নিয়ম।যত টাইম কম হোক , বেশি হোক। আসলে – এগুলো – হচ্ছে অন্তরের সুতীব্র কুটিলতা।

- দিক নির্ণয় না জানা কিছু মানুষের গল্প –

কিছু মানুষ আছে – যারা একটু অতি-উৎসাহী ভুল ধরতে।একবার সেরকমই একজন অতি উৎসাহী নাস্তিকের সাথে ফেইসবুকে দেখা হয়ে গেলো।তিনি দাবী করে বসলেন –

আসলে , কুরআন কেবলা বলতে – মক্কা শরিফের কাবা ঘরের কথা কেন বলা হয়েছে।

আমি বললাম – ইউনিটির জন্যে।একটা কেন্দ্র থাকলে সর্বদাই সুবিধা।কারণ , নানা মুনির নানা মতের মত– কিবলা নির্ধারিত না থাকলে – যে যার মত যেদিকে নামাজ পড়লে – সেটা হবে অনৈক্যের কাজ।ঐক্য ধরে রাখতেই এই সিদ্ধান্ত।

ভদ্রলোক – এবার আমাকে সেই বোকা-সুলভ প্রশ্ন করে বসলো – তার মানে কুরআন অনুযায়ী পৃথিবী সমতল। কারণ , একমাত্র সমতলের কথা চিন্তা করে এই কথা বলা হয়েছে।আপনি পশ্চিম দিকে ফিরলে – তো সেটা হবে আকাশের দিকে।কারণ , পৃথিবী গোলাকার।

আমি – ভদ্রলোকের বোকামিতে অবাক হলাম।এইবার একটু কৌশলী পন্থা নিলাম – বললাম – ভাই , আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি দিচ্ছি।আগে , আমার প্রশ্নের জবাব দেন – আমেরিকা আমাদের কোনদিকে?ভদ্রলোক , মনে হয় ঢোক গিললেন।উত্তর দিলেন – পশ্চিমদিকে।

আমি উত্তর দিলাম – ভাই আমি কনফিউজড।পশ্চিম হয় কিভাবে – আমাদের সামনের দিকে আঙ্গুল তুললে – সেটাতো হবে – আকাশে দিকে। সবাই পশ্চিম বলে কেন?(যেকোনো দিক নির্ণয় করতে গেলেও আঙ্গুল আকাশের দিকে!)

ভদ্রলোক – ফাঁদে পড়ে গিয়েছিলেন।বললেন – আসলে দিক নির্ণয়ের ব্যাপারে আমার জানাশোনা কম! কম্পাস , অক্ষাংশ , দ্রাঘিমাংশ এগুলো সম্পর্কে এদের নূন্যতম ধারনাও নেই।ইসলামের নিন্দা (সমালোচনা আর নিন্দার মধ্যে বিস্তর ফারাক) করতে গিয়ে – দিক নির্ণয় নিয়ে অ , আ , ক , খ না জেনে কথা বলতে আসলে আনন্দই লাগার কথা।সুড়সুড়িয়ে পালিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখা যায় যে।

হ্যাঁ , যারা এ বিষয়ে প্রশ্ন করে – তাঁদের দিক নির্ণয় সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞানও নেই।অপরিণামদর্শী – এইসব মানুষ আমাদের হাসির খোরাক হয়েই থাকুক।

কাবা শরিফকে কেন্দ্র ধরে – যে কেউ যেদেশেই থাকুক সেদিকে ফিরে নামাজ পড়বে। বাংলাদেশে থাকলে– পশ্চিমদিকে।আমেরিকায় থাকলে – আমাদের উল্টো দিকে। সাউথ আফ্রিকায় থাকলে – উত্তর দিকে।এভাবে – আপনি যেখানেই থাকবেন – উন্নত প্রযুক্তি দিয়ে সহজেই দিক নির্ণয় করতে পারবেন।কম্পাস দিয়েও পারবেন।মক্কার - ভৌগলিক অবস্থান হচ্ছে – ২১ডিগ্রি২৫’২১.১৫”N ৩৯ডিগ্রি৪৯'৩৪.১”E। একুরেট এই অবস্থান , আপনার অবস্থানের থেকে সর্ব-নিম্নতম দূরত্ব যেদিকে হবে – সেদিকেই হবে আপনার জন্যে নির্দিষ্ট দিক।এভাবেই – দিক নির্ণীত হয়ে থাকে।আমাদের দেশ থেকে – এই মুহূর্তে মক্কা প্রায় ৫০০০+ কিমি দূরে , পশ্চিমদিকে।তাই , আমরা সেদিকে ফিরেই নামাজ পড়বো।

আশা করি নাস্তিকরা – পরবর্তীতে দিক নির্ণয়ের হাতে খড়ি নিবেন।নইলে – উনাদের কাছে , আজীবনই মনে হবে – দিক বের করতে গেলে – আকাশের দিকে আমরা তাকাই – দিক কিভাবে নির্ণয় করবো!!! হা হা হা...

এফ জেড করিম

অধ্যায় ১৩ - শয়তানের শিং আসলে – একটা খারাপ কিছুর প্রতি ইঙ্গিত করা !

ফারাবি ভাইয়ের সাথে একবার চ্যাটের সময় – শয়তানের শিং নিয়ে আলোচনা করেছিলাম।ফারাবি ভাইয়ের সাথে একমত হয়েছিলাম যে – নাস্তিকদের হাদিস , কুরআন নিয়ে জ্ঞান শূন্যের তলায়।এতোই নিচে যে– কাক পাথর দিয়েও তুলতে পারবে না।ট্রাকভর্তি পাথর এনে সামনে রাখলেও – কাক সারাদিন ফেলেও সে জ্ঞানকে উঠিয়ে আনতে পারবে না(নুড়ি পাথরের পাহাড়ের মধ্যে কাক থাকলেও সম্ভব না)।তাদের জ্ঞান ফসল (সর্যিে , আগাছা হবে) ফলাবে মুক্ত-মনার চিপাচাপায় – আর ১৬/১৭ বছরের ডিজুস প্রজন্মের মাথায়!

বিভিন্ন ফিতনা ও কিয়ামতের নিদর্শন::

সহিহ মুসলিম :: বই ৪১ :: হাদিস ৬৯৩৮

কুতায়বা ইবনে সাইদ (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইবনে রুমহ (র)......ইবনে উমর (রা:) থেকে বর্ণিত I তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (সা) পূর্বমুখী ছিলেন I এমতাবস্থায় তিনি রসুলুল্লাহ (সা) -কে বলতে শুনেছেন, **ফিতনা এদিক থেকে, ফিতনা এদিক থেকে-যেদিক থেকে শয়তানের শিং উদিত হবে I**

বিভিন্ন ফিতনা ও কিয়ামতের নিদর্শন::

সহিহ মুসলিম :: বই ৪১ :: হাদিস ৬৯৩৯

উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর আল কাওয়ারিরী, মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (অন্য সনদে) উবায়দুল্লাহ ইবনে সাইদ (র)....... ইবনে উমর থেকে বর্ণিত I তিনি বলেন, একদা রসুলুল্লাহ (সা) হাফসা (রা:)-এর দরজার নিকট দণ্ডায়মান ছিলেন I **এ সময় তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা প্রাচ্যের দিকে ইংগিত করে বললেন, ফিতনা এ দিক থেকে-যেদিক থেকে শয়তানের শিং উদিত হবে I** এ কথাটি তিনি দুই বা তিনবার বলেছেন I বর্ণনাকারী উবায়দুল্লাহ ইবনে সাইদ (র) তার বর্ণনার মাঝে উল্লেখ করেছেন যে, রসুলুল্লাহ (সা) আয়েশা (রা:)-এর দরজার নিকট দণ্ডায়মান ছিলেন I

বিভিন্ন ফিতনা ও কিয়ামতের নিদর্শন::

সহিহ মুসলিম :: বই ৪১ :: হাদিস ৬৯৪০

হারমালা ইবনে ইয়াহইয়া আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) থেকে বর্ণিত I তিনি বলেন, একদা রসুলুল্লাহ (সা) প্রাচ্য-মুখী হয়ে বললেন: ফিতনা এদিক থেকে -ফিতনা এদিক **থেকে-অবশ্যই ফিতনা এদিক থেকে-যেদিক থেকে শয়তানের শিং উদিত হবে I**

বিভিন্ন ফিতনা ও কিয়ামতের নিদর্শন::

সহিহ মুসলিম :: বই ৪১ :: হাদিস ৬৯৪১

আবু বকর ইবনে আবু শায়বা (র)...... ইবনে উমর (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসুলুল্লাহ (সা) আয়েশা (রা:)-এর গৃহ থেকে বের হয়ে বললেন: তিনি মাথা এদিক **থেকে-যেদিক থেকে শয়তানের শিং উদিত হবে**। অর্থাৎ প্রাচ্যের দিক থেকে।

ফিতনা অধ্যায় ::

সহিহ বুখারী :: খণ্ড ৯ :: অধ্যায় ৮৮ :: হাদিস ২১৪

আলী ইবন আবদুল্লাহ্(র) .... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্(সা) আলোচনা করছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন: হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য আমাদের সিরিয়ায় বরকত দাও। হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য আমাদের ইয়ামানে বরকত দাও। লোকেরা বলল, আমাদের নজদেও। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আমাদের সিরিয়ায় বরকত দাও। হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য বরকত দাও আমাদের ইয়ামানে। লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের নজদেও। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার মনে হয়, তৃতীয়বারে তিনি বললেন: সেখানে তো কেবল ভূমিকম্প আর ফিতনা। **আর তথা হতে শয়তানের শিং উদিত হবে।**

তার মানে এখনো উদিত হয়নি ! হবে ?

তাহলে – সূর্য উঠে কিভাবে ?

কিতাবুল ঈমান অধ্যায় ::

সহিহ মুসলিম :: খণ্ড ১ :: হাদিস ৮৩

আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইবনে নুমায়র,আবু কুরায়ব এবং ইয়াহইয়া ইবনে হাবীব আল হারিসী (র)……আবু মাসঊদ (রা:) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা:) তাঁর হাত দিয়ে ইয়ামনের দিকে ইশারা করে বললেন: জেনে* রাখ, ঈমান সেখানেই। কঠোর ও পাষাণ-হৃদয় হচ্ছে শয়তানের দুই শিং এর স্থলে বসবাসকারী সেসব লোক, দ্বারা উটের লেজের গোড়ায় থেকে চিৎকার দিয়ে থাকে, অর্থাৎ রাবীআ ও মূযার গোত্র।

যেখানে সূর্য উদয় হয় – সেখানে কি মানুষও বসবাস করে ????বলা হচ্ছে – রাবি আর মুযা গোত্রের মধ্যে শয়তানের শিং থাকে ????তাহলে কি ওইখান থেকেই সূর্য উঠে!

সেই সে হাদিস

সৃষ্টির সূচনা অধ্যায় ::

সহিহ বুখারী :: খণ্ড ৪ :: অধ্যায় ৫৪ :: হাদিস ৪৯৪

মুহাম্মদ (ইবন সালাম) (র)................ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যখন সূর্যের এক কিনারা উদিত হবে, তখন তা পরিষ্কারভাবে উদিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সালাত আদায় করা বন্ধ রাখ। আবার যখন সূর্যের এক কিনারা অস্ত যাবে তখন তা **সম্পূর্ণ অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা সালাত আদায় করা বন্ধ রাখ।** আর তোমরা **সূর্যোদয়ের সময়কে এবং সূর্যাস্তের সময়কে তোমাদের সালাতের জন্য নির্ধারিত করো না।** কেননা, তা শয়তানের দু'শিং-এর মাঝখান দিয়ে উদিত হয়। বর্ণনাকারী বলেন, হিসাম (র) কি 'শয়তান' বলছেন না 'আশ-শয়তান' বলেছেন তা আমি জানি না।

মসজিদ ও স্বলাতের স্থান অধ্যায় ::

সহিহ মুসলিম :: খণ্ড ৪ :: হাদিস ১২৭৫

আহমদ ইবনে ইবরাহীম আদ-দাওরাকী (র).................. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সূর্য চলে যাওয়ার পর যোহরের ওয়াক্ত হয় এবং মানুষের ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া ও আসরের ওয়াক্ত না হওয়া পর্যন্ত তা রয়েছে। আসরে ওয়াক্ত সূর্য হলুদ না হওয়া পর্যন্ত রয়েছে। মাগরিবের ওয়াক্ত শাফাক গায়েব না হওয়া পর্যন্ত রয়েছে। এশার ওয়াক্ত রয়েছে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত। এবং ফজরের ওয়াক্ত রয়েছে ঊষার উদয়কাল হতে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত। আর যখন সূর্য উদয় হতে থাকে তখন সালাত থেকে বিরত থাকবে। কেননা, সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের দিয়ে উদিত হয়।

সুনান আবু দাউদ :: কিতাবুস স্বলাত অধ্যায় ২

হাদিস ৪১৩

আল্কানাবী আল-আলা ইবনে আব্দুর রহমান (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা যোহরের নামায আদায়ের পর আনাস ইবনে মালিক (রা:) -র নিকট গিয়ে দেখলাম তিনি আসরের নামায আদায় করছেন। তাঁর নামায সমাপ্তির পর আমরা তাকে বললাম, নামায বেশী আগে আদায় করা হয়েছে। অথবা (আনাস) নিজেই নামায আগে আদায়ের কারণ বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি (আনাস) বলেন, এটা মুনাফিকদের নামায, এটা মুনাফিকদের নামায, এটা মুনাফিকদের নামায, এদের কেউ বসে থাকে অতঃপর সূর্যের রং যখন হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং তা শয়তানের উভয় শিংয়ের উপর অবস্থান করে (সূর্য অস্তগামী হয়) তখন সে নামায আদায় করার জন্য দণ্ডায়মান হয়ে চারটি ঠোকর দিয়ে থাকে (অতি দ্রুত নামায সম্পন্ন করে, যাতে রুকু-সিজদা ঠিক মত আদায় হয় না) এবং সে ঐ নামাযের মধ্যে আল্লাহতা'আলার জিকির অতি সামান্যই করে থাকে- (মুসলিম, মালিক, নাসাঈ, তিরমিযী)।

আসলে আপনাদের এতক্ষণে বোঝাতে পারলাম যে – মহানবী শয়তানের শিং বলতে কি বুঝিয়েছেন।তিনি এটা বলতে মানুষের খারাপ অভ্যাসকে বুঝিয়েছেন।অশুভ কিছুর ইঙ্গিত দিয়েছেন।তিনি এসময় নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন।কারণ , এ সময় নামাজের জন্যে উপযুক্ত নয়।

যাদের ব্রেইন একটু দুর্বল , তারা হুট করে মনে করে বসতে পারে !!!

এখানে মনে হয় শয়তানের শিং এর কথা বলা হচ্ছে– যার মধ্যে দিয়ে সূর্য উঠবে , অস্ত যাবে।বাস্তবিক-ভাবে সেটার উত্তর না।

আপনি উপরের হাদিসের দিকেই দেখুন – বলা হচ্ছে – সিরিয়া ইয়েমেন থেকে শয়তানের শিং উঠবে???

যদি সে সময়েই উঠে ? তাহলে এখন সূর্য উদয় হয় কিভাবে ?

আবার রাবি মূযা গোত্র নাকি এই শিং এর মধ্যেই বসবাস করে থাকে !

যদি সে সময়েই উঠে ? তাহলে এখন সূর্য উদয় হয় কিভাবে ? তার মানে তো এখন নেই।রাবি আর মুযা গোত্রের যেখানে সূর্য উদয় হয় – সেখানে কি মানুষও বসবাস করে ????বলা হচ্ছে – রাবি আর মুযা গোত্রের মধ্যে শয়তানের শিং থাকে ? তাহলে কি ওইখান থেকেই সূর্য উঠে!অথচ , সেটা উনাদেরই পড়শি।

আসলে – শয়তানের শিং এখানে রূপক একটা বার্তা।এর দ্বারা বোঝানো হচ্ছে – একটা অ-পছন্দনীয় সময়।আল্লাহ্‌র নবী কোন কারণে – সূর্য অস্ত যাবার সময় , অথবা সূর্য উদয় হবার এক্সেট সময়কে নামাজের জন্যে পছন্দ করেন না।কারণ , এ সময়টা একটা অ-পছন্দনীয় সময়।এ সময়ে নামাজের কোন যৌক্তিকতা নেই।এজন্যে আল্লাহ্‌ র নবী বিশেষভাবে এটা মানা করে দিয়েছেন।এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে খারাপের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।এই সময়টাকে মানা করার কারণ– খুবই স্পষ্টও।নামাজ সবাইকে এক কাতারে , একই সময়ে পড়বার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।সূর্যোদয়ের সময়– মানুষ দিনের শুরুর কাজগুলি সেরে নেয়।দিনের শুরুতে ঘুম থেকে উঠেই মানুষের অবশ্য কিছু কাজ থাকেই।সেই সময়ের কাজ সেরে– মসজিদে যেতে বলা হয়েছে।সূর্যাস্তের সময় – দিনের শেষ সময়ের কাজ সেরে – সবাইকে একজায়গায় মিলিত হতে বলা হয়েছে।আর , এখানে সেই সময়ের প্রচলিত একটা রূপক টার্ম– শয়তানের শিংকে বেছে নেয়া হয়েছে।যা আমরা অন্য হাদিসেও দেখি – কখনো , কোন পার্শ্ববর্তী গোত্রের মধ্যে দিয়ে– কখনো প্রাচ্যকে দেখিয়ে , যেটা কাকের কলসীর পানির লেভেলের একটু উপরের জ্ঞান থাকলেই বুঝা যায়।

রিয়াযুস স্বা-লিহীন :: বই ১ :: হাদিস ৪৩৮

একই কথা আছে – শয়তানের শিং – সেখানে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে –

5. The times when Salat is unpraiseworthy are as follows:

a. After the Salat of Fajr to the time of sunrise.

b. At the time when the sun begins to decline.

c. After the Salat of `Asr to the time of sunset.

d. When the sun is rising or setting.

6. Wudu' and Salat expiate for sins. For this reason this Hadith has been mentioned in this chapter.

শয়তানের শিং এখানে আলোচ্য বিষয় নয় – এখানে আলোচ্য বিষয় নামাজের সময়।

সুনান আবু দাউদ :: জিহাদ অধ্যায় ১৫

হাদিস ২৬০৪

আহমদ ইবনে আবু শু'আয়ব আল্ হাররানী -জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা:) বলেছেন, তোমরা সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে তোমাদের পশুদের চারণভূমিতে ছেড়ে দিও না, যে পর্যন্ত রাতের প্রাথমিক অন্ধকার দূরীভূত না হয়। কারণ শয়তানের দল সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে রাতের প্রাথমিক অন্ধকার ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত অনিষ্ট কাজে লিপ্ত থাকে।

শয়তান ইসলামে একটা টার্ম যা – মানুষের মনে খারাপ কাজের প্রেরণা দেয়।

আর শয়তানের শিং হচ্ছে – খারাপ সময় , খারাপ কাজে করাটাই।

আশা করি বোঝাতে পেরেছি

অধ্যায় ১৪

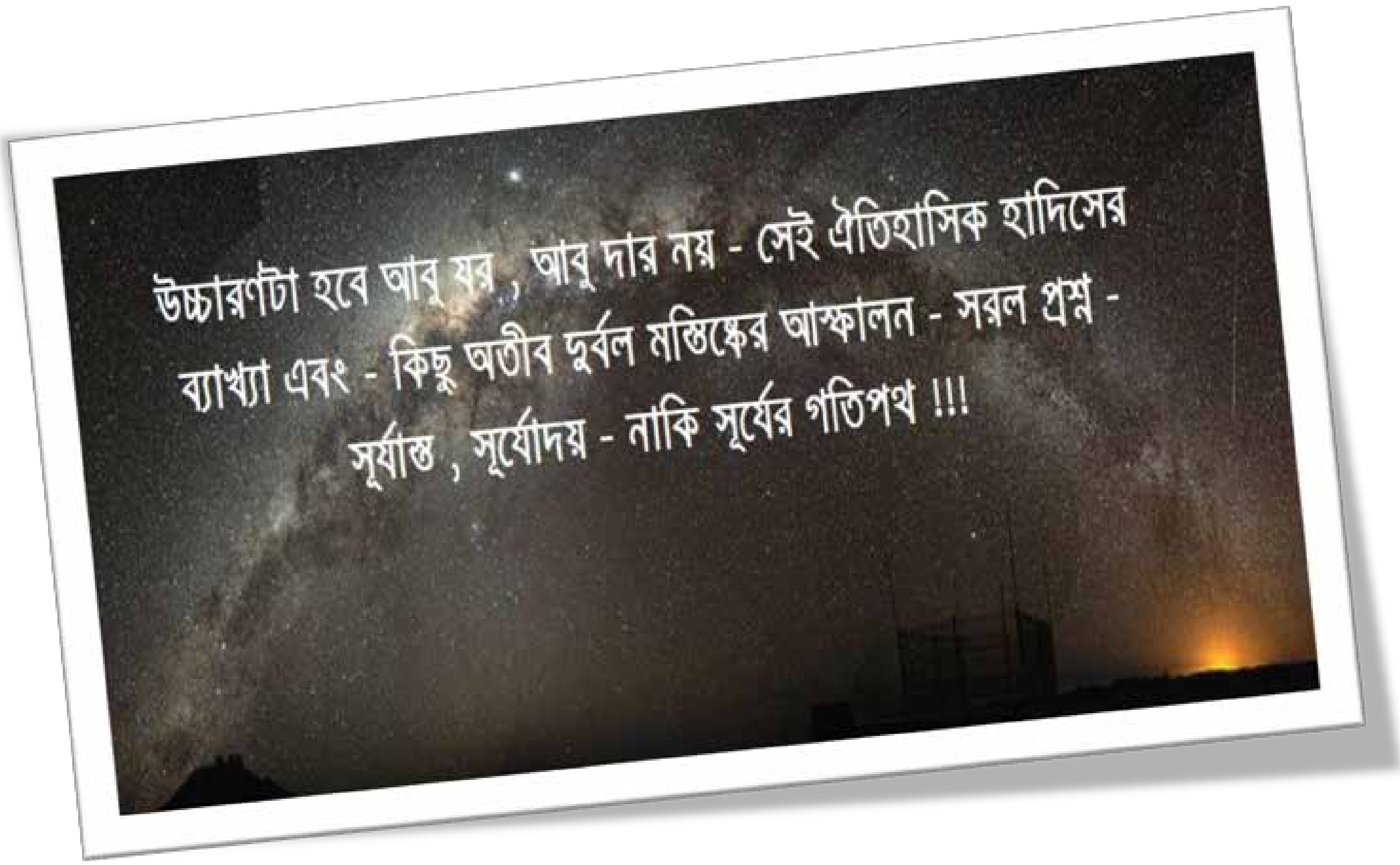
আবু দারের পৌরাণিক কিংবা বৈজ্ঞানিক সূর্যের সেজদা – বুমেরাং

আমরা এখন বুমেরাং শব্দের বাস্তবপ্রয়োগ দেখবো

আবু দারের পৌরাণিক কিংবা বৈজ্ঞানিক সূর্যের সেজদা- বুমেরাং

আমরা এখন বুমেরাং শব্দের বাস্তবপ্রয়োগ দেখবো

উচ্চারণটা হবে আবু যর , আবু দার নয় – সেই ঐতিহাসিক হাদিসের ব্যাখ্যা এবং – কিছু অতীব দুর্বল মস্তিষ্কের আস্ফালন – সরল প্রশ্ন – সূর্যাস্ত আর সূর্যোদয় – সূর্যের গতিপথ !!!



এই হাদিসটি বাংলা ব্লগস্ফিয়ারে দেখেননি– এমন মানুষ হয়তো খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।এই হাদিসটি উল্লেখ করে– সাধারণ মুসলিমদের একটু বিভ্রান্ত করতো।আপনার যদি – একটি বারের মত মনোযোগ দিয়ে হাদিসটি পড়তেন– তাহলে আপনার বিভ্রান্তি দূর হয়ে যেতো।কিন্তু – প্রশ্ন উত্থাপন করতেই নাস্তিকদের চরম আনন্দ– প্রশ্নের উত্তরটা দেখতে নয়।

এই হাদিসটি দেখিয়ে নাস্তিকরা দাবী করে – এখানে নাকি বলা হচ্ছে –

সূর্য অস্ত গেলে কোথায় যায় , আবার সূর্যোদয় হলে কোথা থেকে আসে।

এখানে নাকি বলা হয়েছে - আরশের নিচে গিয়ে সূর্য সিজদা করে?

সব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে – চেয়ারে বসুন – পেজ স্ক্রোল করা শুরু করুন , যারা এতদিন এই হাদিসটি নিয়ে জেনে কিংবা না জেনে ব্লগে ব্লগে কপি করে বেড়িয়েছেন – তাদের জ্ঞানের বহরটা একবার ঝালিয়ে নিন।

ফ্রান্সিস বেকন – একবার একটা মহান উক্তি দিয়েছিলেন –

"বিজ্ঞান সম্পর্কে অল্প জানলে মানুষ নাস্তিক হয় , আর বেশি জানলে আস্তিক হয়'

সূর্য সম্পর্কে আপনার ভয়ানক কম জানাশোনা – যে কতটা তলানিতে তা এখনি দেখবেন।সূর্য যে সিজদাও দেয় – সেটা এখনি দেখবেন ;) !

প্রথমেই দেখে নেই সেই হাদিসটি – যাকে অবৈজ্ঞানিক বলতে গিয়ে আসলে ধরা পড়ে আরও বৈজ্ঞানিক কিছু ...

সহীহ বুখারী ভলিউম ৪ , অধ্যায় ৫৪ , হাদিস নং ৪২১[14] –

হাদিসটি আবু যর (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সূর্য অস্ত যাবার সময় রসূল(সা:) আমাকে বললেন, "তুমি কি জান সূর্য **কোথায় গমন করে?"** আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, এটা যায় (ভ্রমণ করে অর্থাৎ যেতে যেতে) আরশের নিচে পৌঁছে সিজদা করে (অর্থাৎ নিজেকে নিচু করে দেয়) এবং পুনরায় উদিতহওয়ার (অর্থাৎ উঠবার জন্য) অনুমতি চায় এবং তাকে অনুমতি দেয়া হয়। এবং অচিরেই(এমন এক সময় আসবে) যখন সে প্রায় সেজদা নত হবে কিন্তু তা গৃহীত হবে না এবং নিজস্ব পথে যাত্রা করার অনুমতি চাইবে; কিন্তু আর অনুমতি মিলবে না, (বরং) তাকে নির্দেশ দেয়া হবে, সেই পথেই ফিরে যেতে - যে পথে সে এসেছে। এবং তখন সেপশ্চিম দিকে উদিত হবে। এটাই হলও আল্লাহ-তায়ালার এই বাণীর মর্ম: আর সূর্য তার গন্তব্য পথে বিচরণ করে। এটিই মহাশক্তিশালী সর্বজ্ঞাতার নির্ধারিত বিধান। (৩৬:৩৮)

---

[14] Sahih Bukhari Volume 004, Book 054, Hadith Number 421.
Sahih Bukhari Book 54. Beginning Of Creation
Narrated By Abu Dhar: The Prophet asked me at sunset, "Do you know where the sun **goes** (at the time of sunset)?" I replied, "Allah and His Apostle know better." He said, "It goes (i.e. travels) till it prostrates Itself **underneath the Throne** and takes the permission to rise again, and it is permitted and then (a time will come when) it will be about to prostrate itself but its prostration will not be accepted, and it will ask permission to go on its course but it will not be permitted, but it will be ordered to return whence it has come and so it will rise in the west. And that is the interpretation of the Statement of Allah: "And the **sun runs its fixed course** for a term (decreed). That is The Decree of (Allah) The Exalted in Might, The All-Knowing." (36.38)

এই হাদিসটা আপনি মুক্তমনা সহ বিভিন্ন ইসলাম-বিদ্বেষী সাইটে দেখবেন। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার দেখবেন– তারা হাদিসটির অংশবিশেষ লিখে – শেষের কুরআনের আয়াত যেটা মহানবী উল্লেখ করেছেন– সেটা ভুলেও উল্লেখ করে না।

অথচ এই হাদিসটি বর্ণিতই হয়েছে – ঐ আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে –

যেটা দেখা যায় -

সহিহ বুখারীর - ভলিউম ৬ , অধ্যায় ৬০ , নং– ৩২৭ এ উল্লেখ হয়েছে[15] -

আবু যর কর্তৃক বর্ণিত –

আমি আল্লাহ্‌র রসূলকে একদা জিজ্ঞেস করলাম , *আল্লাহ্‌র আয়াত সম্পর্কে ; " আর সূর্য তার গন্তব্য পথে বিচরণ করে। এটিই মহাশক্তিশালী সর্বজ্ঞাতার নির্ধারিত বিধান।(৩৬:৩৮)*"তিনি বললেন **"এটার নির্দিষ্ট পথ হচ্ছে আল্লাহর আরশের নিচে** (এখানে সিজদা বলতে সূর্য , গাছপালা, তারা যা বলা হয়েছে কুরআন এবং হাদিসে , তা আমাদের সিজদার মত নয় , বরং এটা নির্দেশ করে যে এইসব সৃষ্টি , তাদের স্রস্টা প্রতি অনুগত এবং তারা সর্বদাই স্রস্টার নির্দেশ মেনে চলে– যেজন্যে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে)।

ভুলেও ভাববেন না – ব্র্যাকেটের অংশটা আমি লিখেছি– এটা ইমাম বুখারী রা: ই লিখেছেন।

এ সম্পর্কিত আরেকটা হাদিস হল –

ভলিউম ৬ , অধ্যায় ৬০ , হাদিস নং ৩২৬ [16]

আবু যর হতে বর্ণিত -

একদা আমি আর রসূল সা: সূর্যাস্তের সময় মসজিদে বসেছিলাম।রসূল বললেন , আবু যর তুমি কি জান , সূর্য কোথায় অস্ত যায় ? আমি উত্তর দিলাম , " আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ভাল জানেন "।তিনি বললেন " এটা চলে যতক্ষণ না আরশের নিচে

---

[15] Volume 6, Book 60, Number 327: Narrated Abu Dharr:
I asked the Prophet about the Statement of Allah: 'And the sun runs on fixed course for a term (decreed),' (36.38) He said, **'its course is underneath 'Allah's Throne.'** (Prostration of Sun trees, stars. mentioned in Qur'an and Hadith does not mean like our prostration but it means that these objects are obedient to their Creator (Allah) and they obey for what they have been created for)
এছাড়াও আছে এ সম্পর্কিত-Sahih Muslim Book 001, Number 0297

[16] Volume 6, Book 60, Number 326: Narrated Abu Dharr:
Once I was with the Prophet in the mosque at the time of sunset. The Prophet said, 'O Abu Dharr! Do you know where the sun sets?' I replied, 'Allah and His Apostle know best.' He said, 'It goes and prostrates underneath (Allah's) Throne; and that is Allah's Statement: 'And the sun runs on its fixed course for a term (decreed). And that is the decree of All-Mighty, the All-Knowing....' (36.38)

যায় এবং আরশের নিচে সেজদা দেয় এবং এর জন্যেই আল্লাহ বলেন -আর সূর্য তার গন্তব্য পথে বিচরণ করে। এটিই মহাশক্তিশালী সর্বজ্ঞাতার নির্ধারিত বিধান।(৩৬:৩৮)

শেষের অংশ বাদ কেন?

হোয়াই ??????

উত্তর: কারণ হাদিসের শেষাংশ থাকলেই যে ধরা খেয়ে যেতে হবে।হাদিস আর কুরআনের মধ্যে সম্পর্কটা আপনাদের বুঝতে হবে – কুরআন হচ্ছে আসল অর্থ , আর হাদিস হচ্ছে তার যথাসম্ভব সরল ব্যাখ্যা।

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলি তার “ বাইবেল , কুরআন , আধুনিক বিজ্ঞান” , বই যেটা উনি ৫৫ বছর বয়সে আরবি শিখে লিখেছেন – সেখানে তিনি লিখেছেন , সে সময়ে একটা পড়ালেখা থেকে বঞ্চিত আরব সম্প্রদায়কে শিক্ষা দেবার জন্যে– আল্লাহ তার নবীকে দিয়ে যথাসম্ভব সহজ ভাষায়– কুরআন , হাদিস শিক্ষা দিয়েছিলেন।এবং , এইসব সহজ ভাষা– এখন আমাদের খুব ভালোভাবেই বুঝে নেবার সামর্থ্য রয়েছে।

প্রথম বিচ্যুতি – যারা এই হাদিস উল্লেখ করে , তারা কোনদিন কোন কালে হাদিস শাস্ত্র না পড়েই– ইংরেজি ওয়েবসাইটগুলি থেকে কপি করেছে – যার প্রমাণ –

Abu Dhar কে এরা আবু দার উচ্চারণ করে লিখছে– অথচ তা হবে আবু যর । কি পরিমাণ আরবি শাস্ত্রে এরা অজ্ঞ সেটা আর নাহয়, নাই বললাম।মুক্তমনা নামক সাইটটিতে কোনদিনও কাউকে দেখবেন না– যে এরা উচ্চারণ করেছে – আবু যর।চিন্তা করুন।যাদের জ্ঞান আরবি সম্পর্কে এতো কম – তাদের দেয়া সিদ্ধান্ত আপনি গ্রহণ করবেন কিনা সেটা আপনার ব্যাপার।তিক্ত ফলাফলও আপনার।

দুই নং বিচ্যুতি – এরা শেষ আরবি আয়াতটা উল্লেখ করে না কেন?? ব্যাপারটা এমন হল যে– আইনস্টাইন হাস্য-ছলে সাধারণ মানুষদের আপেক্ষিকতা বুঝাতে গিয়ে বলেছেন (ভাগ্যিস আমাদের নবী সাধারণ মানুষদের ঐভাবে জটিল জিনিস বুঝানোর চেষ্টা করেননি , যদিও সব বিজ্ঞানীরা এইভাবেই সাধারণদের বুঝিয়েছেন– তাহলে আজকে মুক্তমনাদের আরও সুবিধা হত!) – সুন্দরী সামনে এক ঘণ্টা বসে থাকলে যেমন মনে হয় ১ মিনিট বসে আছেন , তেমনি আগুনের সামনে ১ মিনিট বসে থাকলে মনে হবে এক ঘণ্টা বসে রয়েছেন।এরপর তিনি বললেন তার আপেক্ষিকতার সূত্র।

আর আপনি সুন্দরী আর আগুনের অংশ বলেই উল্লেখ করলেন– আর বাকী শেষ লাইন অর্থ উপপাদ্য না উল্লেখ করেই মুক্তমনা সাইটে সেটা উল্লেখ করে দিন – আইনস্টাইন ভুল প্রমাণিত হয়ে যাবে।

এইবার নিজের কাছে প্রশ্ন করুন – শেষ লাইনটা বাদ পড়ল কেন ??

পুরো অঙ্ক উল্লেখ করে – উত্তরটা বাদ রইল কেন ??

তার মানে "কুছ গড়বড় হোতা হ্যাঁয়!!!"

যাক এইবার প্রমাণে আসি – আপনি কি মনে করেন এখানে টিপিক্যাল সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের কথা বলা হয়েছে?

যদি মনে করেন। তাহলে আপনি চূড়ান্ত রকমের ভ্রান্তির মধ্যে আছেন।আমি যত ভাইকে এই হাদিস উল্লেখ করতে দেখেছি – তারা সবাই মনে করে এখানে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের কথা বলা হচ্ছে– এখানেই চূড়ান্ত ভ্রান্তি।এই ভাইদের সমস্যাটা হল – তাদের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অনেকটাই কম।

কারণটা দেখি -

এখানে – বলা হচ্ছে –

"তিনি বললেন, এটা যেতে যেতে আরশের নিচে পৌঁছে সিজদা করে'

মুহাম্মদ সা: বলছেন যে – এটি যেতে যেতে আরশের নিচে যায়। কথাটা বলা হয়েছে সূর্যাস্তের সময় । আপনি ধরে নিলেন– সূর্য অস্ত গিয়ে আরশের নিচে যায় – অথচ , সূর্য তো অস্তই যায় না – তাই এটি অবৈজ্ঞানিক!!!

আপনার ধারনা চূড়ান্ত রকমের ভুল। কারণ – এখানে যা বলা হয়েছে , আপনি মোটেও ধরতে পারেন নি।

এখানে যে আরশের কথা বলা হচ্ছে – সেটা কি ??

আমি প্রশ্ন করি – হোয়াট ইজ আরশ ? আরশ কি , এবং আরশ কোথায় ?

তারা উত্তর দিতে পারেন না – তখন আমি তাদের সহায়তা করি।(আরশ কোথায় থাকে– এটা জানলে তো তারা আর ভ্রান্তিতে পড়তো না।)

আরশ একটা আরবি শব্দ – এটা হচ্ছে স্রস্টার সিংহাসন।আল্লাহ তাঁর বিশ্বজগতের উপরে – এই আরশে সাময়িকের জন্যে অধিষ্ঠান করেন।

আরশ হচ্ছে সবকিছুর উপরে এক স্থান।

আল্লাহর আরশ হলও আসমান সমূহের ওপর অবস্থিত...... সূনান আবু দাউদ, বই-৪০, হাদিস- ৪৭০৮

সকল কিছুর ওপর আল্লাহর আরশ অবস্থিত..... সহি বুখারী, বই-৫২, হাদিস-৪৮

কুরআনে আছে–

বস্তুত: আল্লাহ্ মহিমান্বিত মহারাজাধিরাজ, চিরন্তন সত্য, তিনি ব্যতীত অন্য উপাস্য নেই,সম্মানিত আরশের অধিপতি তিনি। (২৩:১১৬)

অর্থাৎ - আরশ হচ্ছে আমাদের পৃথিবীর অনেক অনেক উপরের একটা স্থান।এটা ব্রেইনে ঢুকিয়ে নিন।

এইবার আমরা হাদিসটা আবার পড়ি – যেখানে মহানবী বলছেন সূর্যাস্তের সময়ে –

তিনি বললেন, এটা যেতে যেতে<u>আরশের</u> নিচে পৌঁছে সিজদা করে'

আর সূর্যোদয়ের সময়ে –

এবং পুনরায় উদিত হওয়ার (অর্থাৎ উঠবার জন্য) অনুমতি চায় এবং তাকে অনুমতি দেয়া হয়।

অর্থাৎ , সূর্যোদয়ের সময় আরশ থেকে নিচে নেমে আসবে।

অর্থাৎ ঘটনা দাঁড়ালো দুটো –

সূর্যাস্তের সময় আরশের নিচে চলে যায়!

আর

সূর্যোদয়ের সময় আরশ থেকে নেমে আসবে।

নাস্তিকরা এখানেই প্রাইম ভুল করে – কারণ তাদের কুরআন , হাদিস সম্পর্কে জ্ঞান কলসির তলায় (ফাটা কলসি বাজে বেশী!) থাকায় তারা মনে করে আরশ পৃথিবীর তলায় অথবা ধারে কাছে গোছের কিছু একটা। আসলে তা নয়।

আরশ হচ্ছে – সবচেয়ে উপরের একটা অবস্থান –

আমি যাদের সাথে তর্ক করি এ বিষয়ে তারা মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ পরেই সরে যায়– প্রথমে গলা উপরে থাকলেও !!

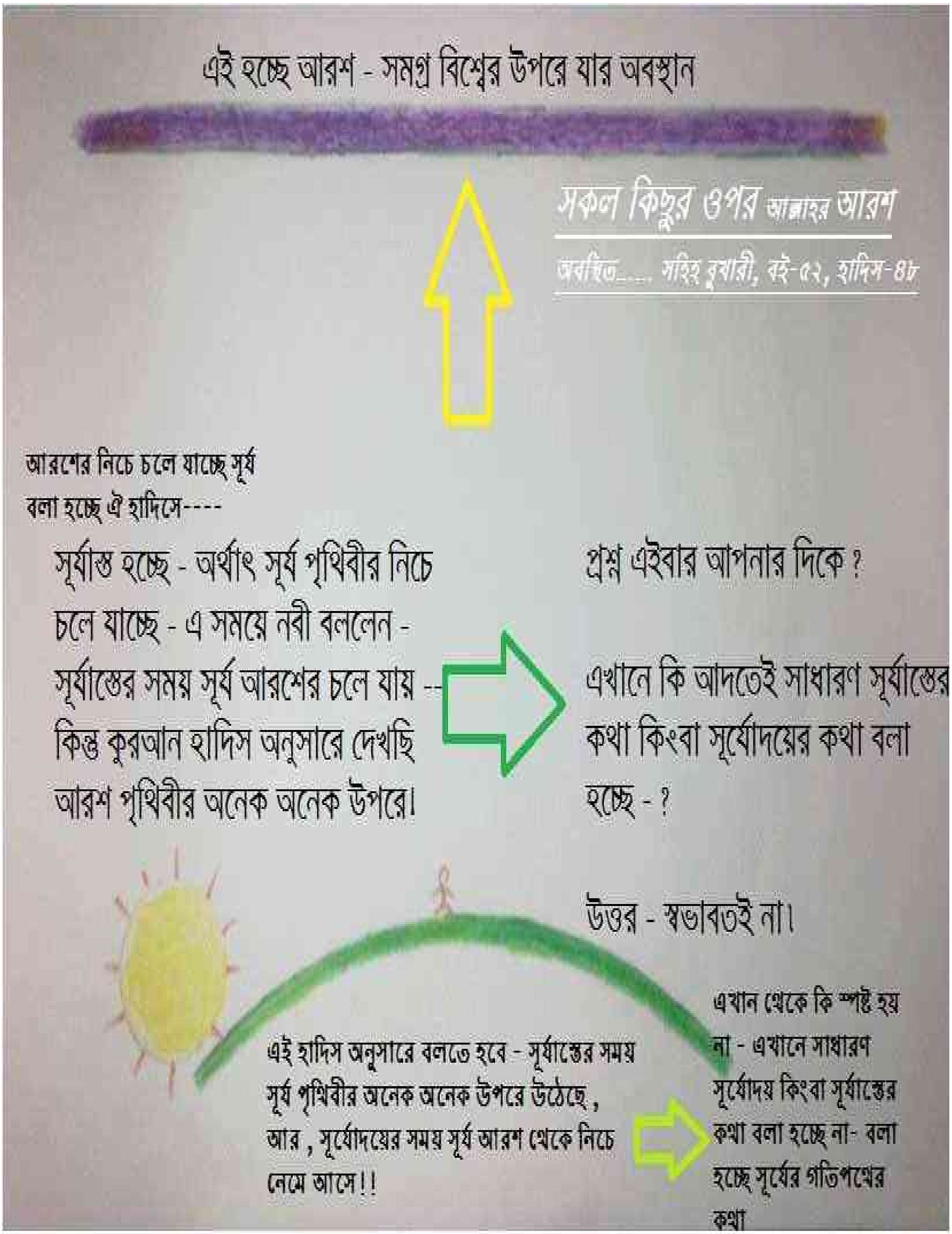
এই হাদিস দ্বারা আমরা কি বুঝি!আসুন একটু বিশ্লেষণ করি -

মহানবী বললেন, এটা যেতে যেতে আরশের নিচে পৌঁছে সিজদা করে।

আরশ হচ্ছে – সবচেয়ে উপরের একটা অবস্থান –

সূর্যাস্তের সময় আমরা সবাই দেখি – সূর্য পৃথিবীর নিচে চলে যাচ্ছে - অর্থাৎ যাই হোক পৃথিবীর নিচে চলে যায়।গ্রিকরা বলে অলিম্পিক পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে যায় , হিন্দু-ধর্মগ্রন্থগুলি বলে পৃথিবীর নিচে চলে যায়–

সবাই সিমিলিয়ার কিছুই বলে – কিন্তু , কেউ কোন কালে বলবে না যে – সূর্য অস্ত যাবার সময় সবচেয়ে উপরে (আরশে) উঠে যায় !



সাধারণ,সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্ত নয় - এখানে বলা হচ্ছে সূর্যের গতিপথের কথা ...

আবার এটাও বলবে না যে – সূর্য উদয় এর সময়ে সূর্য আরশের নিচ থেকে নেমে আসে।অর্থাৎ উপর থেকে নিচে নেমে আসে – আরশ থেকে নিচে নেমে আসে।অথচ – আমরা দেখি , নিচ থেকে উপরে উঠে।কিন্তু , এই হাদিস অনুসারে উপর থেকে নিচ নামে!!!

মুহাম্মদ সা: কেন – দুনিয়ার সবচেয়ে বড় পাগলও এই কথা বলবে না –

যে সূর্য অস্ত যাবার সময় উপরের দিকে অর্থাৎ আরশের দিকে উঠতে থাকে !

আর উদয়ের সময় উপরের অর্থাৎ আরশের থেকে নিচে নামতে থাকে !

এইধরনের ইন্সেন কথা – কোন পাগলেও বলবে না – যে সূর্যাস্তের সময় সূর্য আরশের দিকে অর্থাৎ উপরে উঠতে থাকে !!!!

আবু যরেরও সেটা বুঝবার কথা – তাহলে অর্থ কি দাঁড়ায় – আদপে এখানে সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্তের কথাই বলা হচ্ছে না।যা পরের আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় -

আর সূর্য তার গন্তব্য পথে বিচরণ করে। এটিই মহাশক্তিশালী সর্বজ্ঞাতার নির্ধারিত বিধান। (৩৬:৩৮)

এখানে স্পষ্টই বলা হচ্ছে – এটা হচ্ছে সূর্যের গতিপথের কথা।সাধারণভাবে সূর্যাস্তের কিংবা সূর্যোদয়ের কথা যে এখানে আদপে বলাই হয় নি – সেটা আরশের উল্লেখ থেকে বোঝা যায়।

এই হল প্রথম পার্ট – যুক্তির খাতিরে লিখাটিকে দুইভাগে ভাগ করলাম – যাতে কোন নাস্তিকদের কেউ তাদের লম্বা লম্বা লেঞ্জাবিশিষ্ট প্রাইমেটদের মত ডালপালা পরিবর্তন না করতে পারে। আমার সাথে কিংবা আপনাদের সাথে যদি কেউ এ বিষয়ে কথা বলতে আসেন –

তাহলে তাকে যে পয়েন্টগুলি ক্লিয়ার করতে হবে –

পয়েন্ট ১ – এখানে আপনার শেষ আয়াত বাদ দেন কেন?যেখানে – এই হাদিসটি মুহাম্মদ সা: ই বলছেন – ঐ আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে।

পয়েন্ট ২ – আপনি কোনদিনই হাদিস গ্রন্থ খুলে এই হাদিসটি দেখেননি – আপনি একজন কপি-কারক – কারণ আপনি কৌশলে শেষ বাদ দেয়া আয়াতটি দেখেননি – আর আপনি উচ্চারণটাই জানেন না – কথা কি সত্য ?

পয়েন্ট ৩ – এখানে উল্লেখিত আরশের অবস্থান কোথায় আপনি জানেন?

পয়েন্ট ৪ – এখানে উল্লেখিত সূর্যাস্ত , সূর্যোদয় অনুসারে বলা হচ্ছে - যে সূর্য অস্ত যাবার সময় উপরের দিকে অর্থাৎ আরশের দিকে উঠতে থাকে !

আর উদয়ের সময় উপরের অর্থাৎ আরশের থেকে নিচে নামতে থাকে ! ---- এটা কি কোনমতেই কোন পাগল লোকও বলবে?

পয়েন্ট ৫ – আমি দাবী করলাম – এখানে কোনমতেই টিপিক্যাল সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্তের কথা বলা হচ্ছে না– আপনি কি এর বিপক্ষে কোন যুক্তি দিতে পারবেন – যেখানে সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্তের সাথে আরশ সংযুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে! যার ফলে দাঁড়াচ্ছে – সূর্যাস্তের সময় সূর্য উপরের দিকে উঠতে থাকে , আর সূর্য উদয়ের সময় সূর্য উপর থেকে নিচে নামতে থাকে!!

পয়েন্ট ৬ – আপনি ব্যাখ্যা করবেন কিভাবে - সূর্যাস্তের সময় সূর্য উপরের দিকে উঠতে থাকে , আর সূর্য উদয়ের সময় সূর্য উপর থেকে নিচে নামতে থাকে!! – অথচ মানব চক্ষু ঠিক তার উল্টাটা দেখে। - এটা কি যথেষ্ট নয় যে , এখানে টিপিক্যাল সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্তের কথা না বলে -

এই পয়েন্ট গুলি ক্লিয়ার করেই দ্বিতীয় পার্টে যাবেন নতুবা নয় ...এটা মনে রাখবেন– ৬টা পয়েন্টের উত্তর দিয়েই পরের পার্টে যেতে হবে।আমরা যুক্তিতে বিশ্বাস করি।অন্ধ কিছুতে নয়।

আপনি বলে দিন: অতএব, পরিপূর্ণ যুক্তি আল্লাহরই। (৬:১৪৯)



<u>২য় পার্ট</u>

১৫০০ সালের কিছু পরে কোপার্নিকাস তাঁর মতবাদ – হেলিওসেন্ট্রিক তত্ত্ব দেন – যেখানে বলা হয় – ***<u>পৃথিবী স্থির নয়, পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান!! তবে সূর্য স্থির!!</u>***

১৫৪৩ সালে তিনি তাঁর "On the revolution of the celestial spheres" বইতে তিনি লিখেন – "রাজকীয় সিংহাসনে বসে সূর্য তার সৌর পরিবারের গ্রহদের নিয়ন্ত্রণ করে।" বলাই বাহুল্য, তিনি সূর্যকে স্থির বলেছিলেন- যদিও তা নয়- আমরা কিছুদিন আগে থেকে এখন জানি সূর্যেরও কক্ষপথ রয়েছে!!!

কিন্তু ,উপরের **১৫০০** বছর আগের হাদিসটি বলছে - ভিন্ন কথা– হাদিসটি বলছে – সূর্যেরও একটা নির্দিষ্ট গতিপথ রয়েছে– সূর্য সেই গতিপথ ধরে চলাচল করে...

আর সূর্য তার গন্তব্য পথে বিচরণ করে। এটিই মহাশক্তিশালী সর্বজ্ঞাতার নির্ধারিত বিধান।(৩৬:৩৮) [17]

এখানে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে - সূর্য স্থির তো নয়ই বরং তার নির্দিষ্ট পথে চলছে।

The Bible, The Quran and Science এর **১১১** পৃষ্ঠায় মরিস বুকাইলি উল্লেখ করেছেন –

হাদিসে উল্লেখিত এই আয়াত সম্পর্কে

সোলার এপেক্স[18] –

এখানে সূর্যের নির্দিষ্ট অবস্থান সম্পর্কে কুরআনে সূরা ইয়াসিন এ আলোচনা করা হয়েছে -

আয়াত: - আর সূর্য তার গন্তব্য পথে বিচরণ করে। এটিই মহাশক্তিশালী সর্বজ্ঞাতার নির্ধারিত বিধান (৩৬:৩৮)

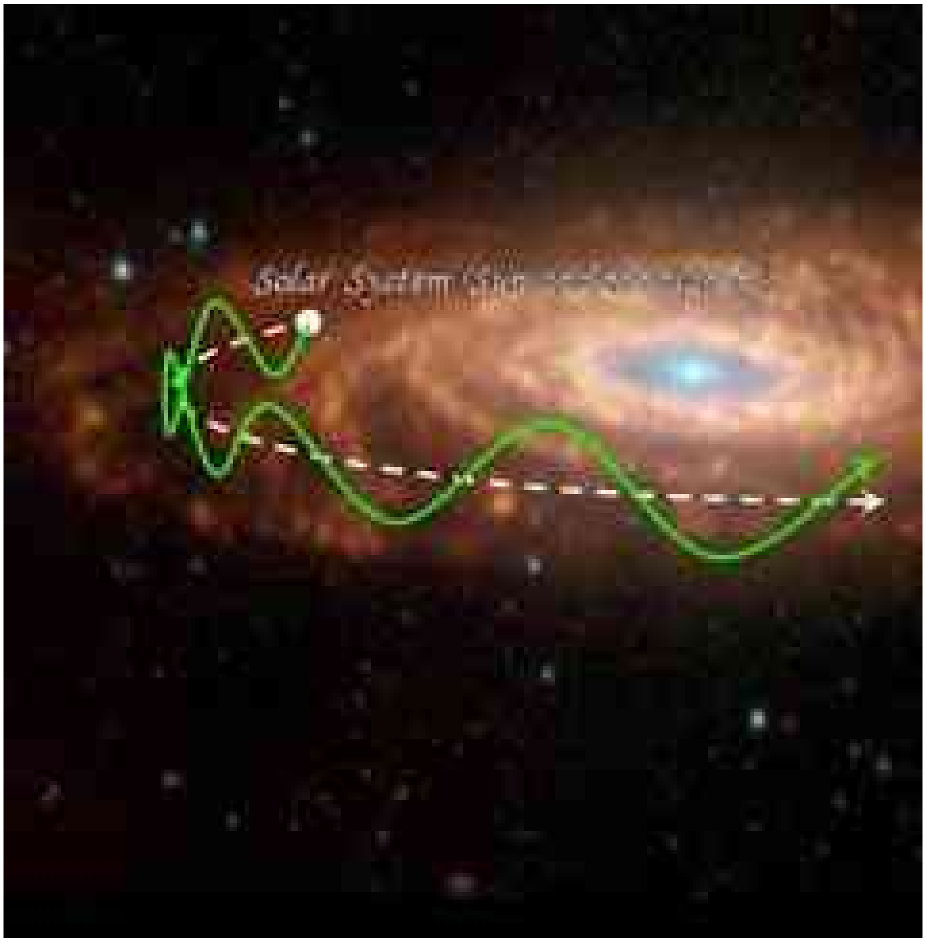
---

[17] এছাড়াও একই কথা উল্লেখ আছে – ১৩৩৯ , ১৩:৩৫ , ২৯:৩১ , ২::৫ আয়াতে।

[18]

<u>The Solar Apex</u>
The notion of a settled place for the sun is vividly described in chapter Yaa Seen of the Qur'ân (interpretation of the meaning):
"The sun runs its course to a settled place that is the decree of the Almighty, the All Knowing." Holy Qur'ân 36:38
"Settled place" is the translation of the word 'mustaqarr', which indicates an exact appointed place and time. Modern astronomy confirms that the solar system is indeed moving in space at a rate of 12 miles per second towards a point situated in the constellation of Hercules (alpha lyre) whose exact location has been precisely calculated. Astronomers have even given it a name, 'the solar apex.' *(page 110-111)*

"নির্দিষ্ট অবস্থান" হচ্ছে আরবি "মুস্তাকার" এর অনুবাদ , যেটা বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট অবস্থান এবং সময়।আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা আমাদেরকে বলে যে – সূর্য মহাশূন্যে আবর্তন করছে প্রতি সেকেন্ডে ১২ মাইল গতিতে - একটি নির্দিষ্ট দিকে যা অবস্থান করছে হারকিউলিস(হারকিউলিস[19] - আধুনিক ৮৮টি তারামণ্ডলের মধ্যে পঞ্চম বৃহত্তম তারামন্ডল) কন্সটালেইশন(নক্ষত্রপুঞ্জ) এর দিকে I যার নির্দিষ্ট অবস্থান জ্যোতির্বিদরা সঠিকভাবে বের করেছেন।জ্যোতির্বিদরা এক্ষেত্রে নাম দিয়েছেন – সোলার এপেক্স[20] I (The solar apex (Apex of the Sun's Way) is the direction that the sun travels) I



ছবি ক্রেডিট - http://www.centauri-dreams.org/?p=1378 - উঁচু নিচু সেই ঢেউ খেলানো পথ...

মহাশূন্যে পৃথিবী , সূর্য , চন্দ্র , অন্যান্য গ্রহ সহ উপগ্রহ গুলি প্রায় বৃত্তাকার নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে। সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী , সহ সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহ সাথে সাথে উপগ্রহ গুলোও আবর্তন করছে।কিন্তু , সূর্য স্থির নয়।সূর্য নিজেও আমাদের এই ছায়াপথ অর্থাৎ মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি (আকাশ গঙ্গা)র কেন্দ্রকে ঘিরে আবর্তন করছে প্রতি সেকেন্ডে ১২ মাইল গতিতে।

[19] http://en.wikipedia.org/wiki/Hercules_%28constellation%29
[20] http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_apex - The solar apex (Apex of the Sun's Way) is the direction that the Sun travels –

সোলার এপেক্স বলতে বোঝায় – সূর্য যে পথে মিল্কিওয়ে দিয়ে ভ্রমণ করে(আকাশ গঙ্গা)।ছায়াপথের কেন্দ্রের দিকে প্রায় ৬০ স্কাই ডিগ্রি কোণে সূর্য ছুটছে একটি সুনির্ধারিত উপবৃত্তাকার অবস্থানে। সূর্য আবর্তন করছে - কন্সটালেইশন(নক্ষত্রপুঞ্জ) অব হারকিউলিস এর ভেগা(অভিজিৎ) নামক নক্ষত্রের এর দিকে।

এজন্যেই কুরআনের এই আয়াতের অবতারণা –

আর সূর্য তার গন্তব্য পথে বিচরণ করে। এটিই মহাশক্তিশালী সর্বজ্ঞাতার নির্ধারিত বিধান। (৩৬:৩৮)

এর অর্থ হচ্ছে – সূর্য তাঁর গন্তব্য পথে বিচরণ করছে।এবং এটি আল্লাহ দ্বারা নির্ধারিত গন্তব্য পথ।

আমরাও তাই জানি – সূর্য তার নির্ধারিত গন্তব্যপথে বিচরণ করছে – যেটা কন্সটালেইশন(নক্ষত্রপুঞ্জ) অব হারকিউলিস এর ভেগা(অভিজিৎ) নামক নক্ষত্রের এর দিকে।

এই আয়াতটির ব্যাখ্যা হচ্ছে এটি – মুহাম্মদ সা: এর ব্যাখ্যা হিসেবে উক্ত হাদিসটির অবতারণা করেন – যেটা বিষয়টাকে বুঝতে আর আর সহজ করেছে।

আপনাদের ইতিমধ্যেই বুঝাতে পেরেছি – যে এখানে আমরা যে ধরনের সাধারণ সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্ত দেখি – সে সম্পর্কে এখানে বিন্দুমাত্রও বলা হয়নি।যেটা আপনি – আমি এই মুহূর্তে নিশ্চিত(আপনি যদি এখনো সন্দেহ থাকে তাহলে প্রথম পার্ট পড়ে দেখুন – ৬টা পয়েন্ট ক্লিয়ার করুন।সন্দেহ থাকলে বুঝতে হবে – আপনি প্রথম পার্টের ৬টা পয়েন্ট না বুঝেই এখানে এসে পড়েছেন!)।

হাদিসটা আবার পড়ার সময় এসেছে –

ঐ হাদিসে বলা হয়েছে – সূর্যের সিজদার কথা।সিজদা বলতে আমরা সাধারণত – কি বুঝি ভাই?

মাথা নিচু করা – এরপর আবার তুলে ফেলা।এটাই হচ্ছে সিজদা।আপনি নিশ্চয়ই জানেন না – সূর্যও ঠিক একি কাজ করে – সূর্য যখন আবর্তন করে – তখন সূর্যও একবার নিচু হয় , আবার উপরে উঠে –

উইকিপিডিয়ার নিবন্ধে উল্লেখ রয়েছে -

The Sun's orbit around the Galaxy is expected to be roughly elliptical with the addition of perturbations due to the galactic spiral arms and non-uniform mass distributions.

"In addition the Sun oscillates up and down relative to the galactic plane[21] approximately 2.7 times per orbit."

এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে - সূর্য চলার পথে দিক পরিবর্তন করে একবার উপরে একবার নিচে প্রায় প্রতি সম্পূর্ণ আবর্তনে ২.৭ বার।

অর্থাৎ সৌরজগত সহ সূর্য প্রতিবার নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর আমাদের ছায়াপথ মিল্কি ওয়ে এর গ্যালাক্টিক প্ল্যানের উপর দিয়ে উঠছে আবার নিচে নামছে আবার উঠছে–

এই কথা উল্লেখ আছে[22] –

en.wikipedia.org/wiki/Milky_Way

*en.wikipedia.org/wiki/**Sun***

একই কথা উল্লেখ আছে , আর অনেক অনেক জায়গায়– একবার শুধু গুগলে সার্চ করে দেখুন। (মুক্তমনারা নিশ্চিন্ত থাকুন– অ্যারা-বিয়ানদের পেট্রো-ডলার খেয়ে সূর্য গতিপথ পরিবর্তন করে ফেলেনি– কিংবা দুনিয়ার তাবৎ বিজ্ঞানী ভুল করেও এ কথা বলে ফেলেনি!)

নিচের ছবিতে দেখুন ব্যাপারটি -

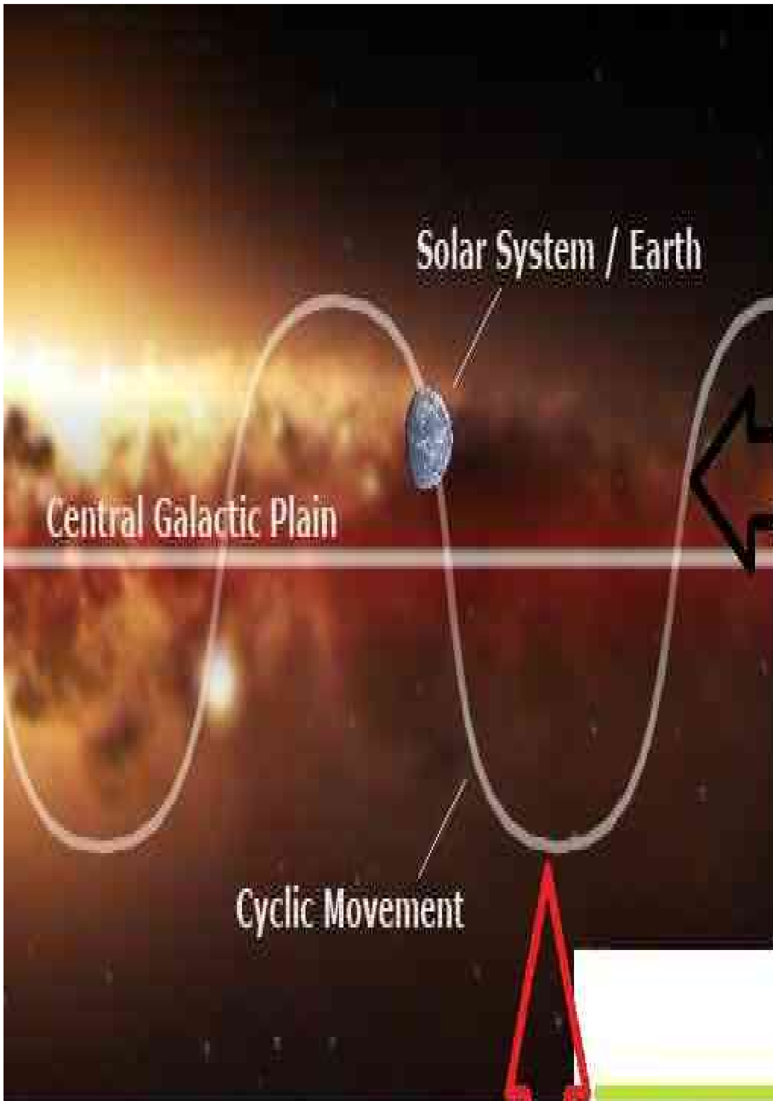
---

[21] *en.wikipedia.org/wiki/**Galactic_plane***

[22] উইকিপিডিয়ায় রয়েছে -

The *Apex of the Sun's Way*, or the solar apex, is the direction that the Sun travels through space in the Milky Way, relative to other nearby stars. The general direction of the Sun's galactic motion is towards the star Vega in the constellation of Lyra at an angle of roughly 60 sky degrees to the direction of the Galactic Center.

The Sun's orbit around the Galaxy is expected to be roughly elliptical with the addition of perturbations due to the galactic spiral arms and non-uniform mass distributions. In addition the Sun oscillates up and down relative to the galactic plane approximately 2.7 times per orbit. It has been argued that the Sun's passage through the higher density spiral arms often coincides with mass extinctions on Earth, perhaps due to increased impact events.[127] It takes the Solar System about 225–250 million years to complete one orbit of the galaxy (a *galactic year*), [128] so it is thought to have completed 20–25 orbits during the lifetime of the Sun. The orbital speed of the Solar System about the center of the Galaxy is approximately 251 km/s (156 mi/s).[129] At this speed, it takes around 1,190 years for the Solar System to travel a distance of 1 light-year, or 7 days to travel 1 AU.[130]



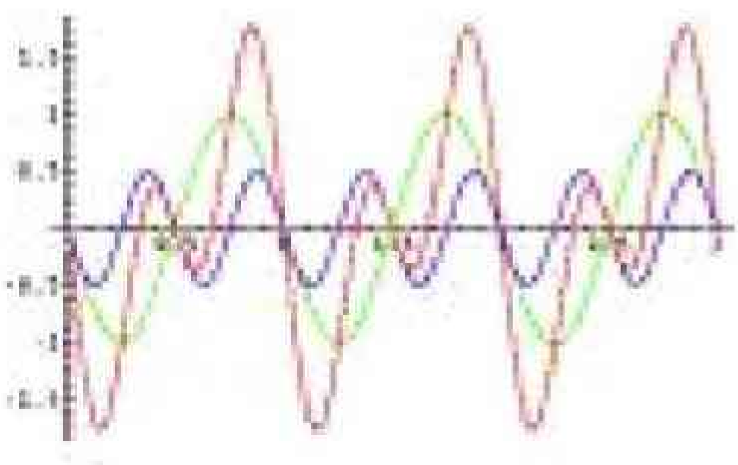
সৌরজগত একবার উপরে উঠছে আর একবার নামছে -

এখানে সূর্য নিচু হওয়ার থেকে উঁচু হওয়ায় হাদিসে সহজ ভাষায় বলা হচ্ছে - উদয় হচ্ছে এবং উঁচু হয়ে সিজদা থেকে উঠছে

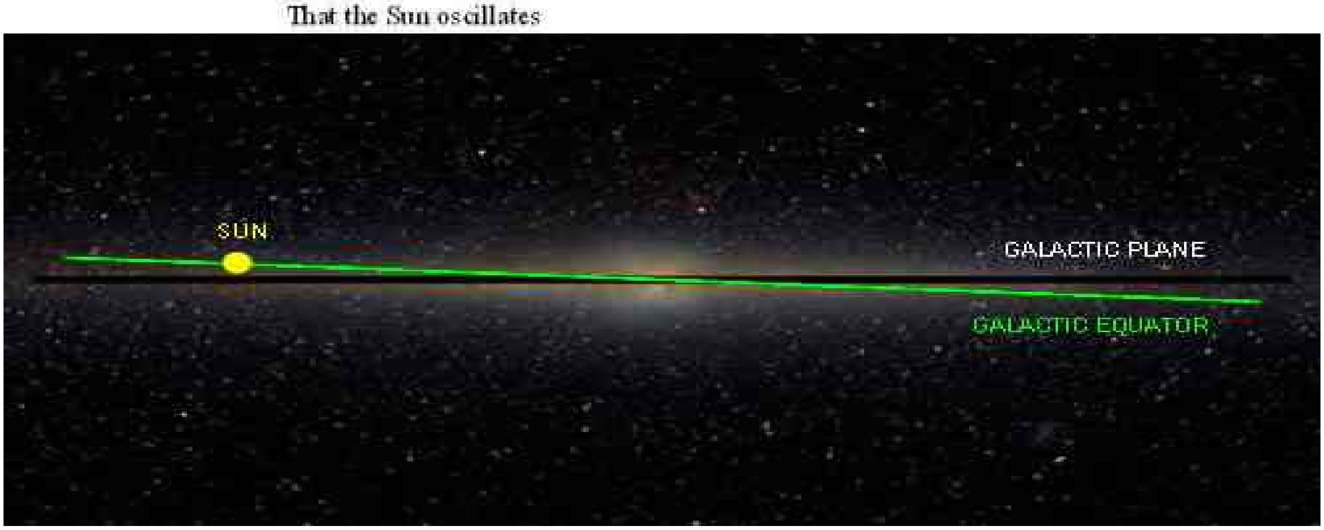
সূর্য নিচু হয়ে যাওয়ায় - এটাকেই হাদিসে সহজ ভাষায় বলা হচ্ছে অস্ত যাওয়া এবং নিম্নগামী হয়ে সিজদা করা -

সহিহ বুখারীর - ভলিউম ৬, অধ্যায় ৬০, নং – ৩২৭
"এটার (সূর্যের) নির্দিষ্ট পথ হচ্ছে আল্লাহর আরশের নিচে" - সমগ্র বিশ্বের উপরেই হচ্ছে আরশ - আর এটা কোনমতেই পৃথিবীর ক্ষেত্রে হতে পারে না।উপরের ছবি দেখেই সব ক্লিয়ার হয়ে যাওয়া উচিত।

উপরের ছবি দুটো নেয়া হয়েছে - http://scienceblogs.com/startswithabang/2010/06/03/whats-going-to-happen-when-the/ - এখান থেকে।[23]



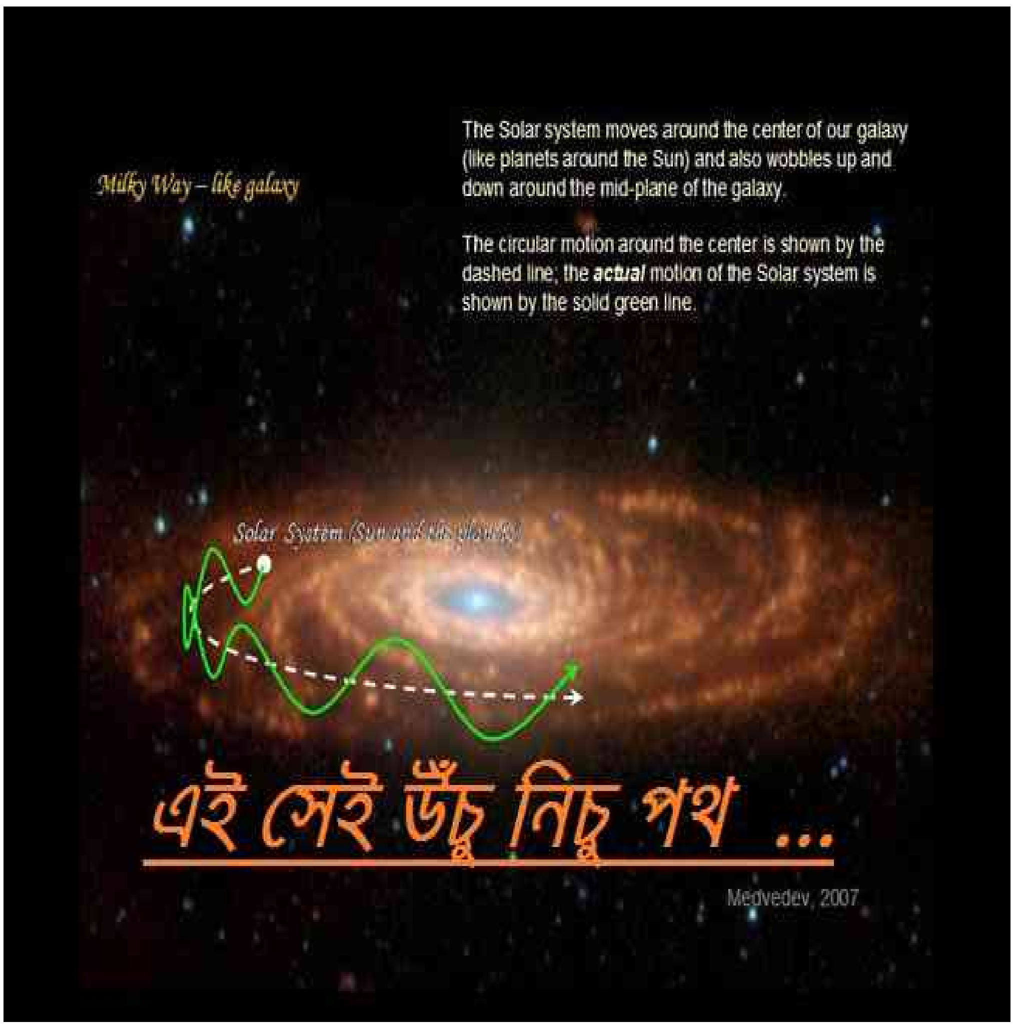
That the Sun oscillates



[23] এই ফাঁকে একটা মজার তথ্য দিয়ে দেই এই ছবিটা তৈরি হয়েছিলো বুঝাতে কেন পৃথিবী !বর্তমানে আমরা নিম্নগামী হতে চলেছি - /২১১২ তারিখে ধ্বংস হবে না– ছবিতে দেখানো হচ্ছে ! পৃথিবী সহ আমাদের সৌরজগত এখনও নিম্নগামী অবস্থায় আছে – আর কয়েক হাজার বছরেও গ্যালাক্টিক প্ল্যান এর কাছে যাবার সম্ভাবনা কম।২০১২ সালে কেন পৃথিবী ধ্বংস হবে না – এটা নিয়ে আলোচনা করার সময় এই ছবিটা আমার চোখে পড়েছিল। গ্যালাক্টিক প্ল্যান সম্পর্কে জানতে -*en.wikipedia.org/wiki/Galactic_plane*







এই পর্যন্ত – আমাদের সৌরজগত সহ সূর্য তার সম্পূর্ণ জীবদ্দশায় প্রায় ২০ থেকে ২৫ বার আবর্তন করে ফেলেছে ছায়াপথকে কেন্দ্র করে -

সহজ হিসেব – ২.৭*২০ অথবা ২৫ = ৫৪ বার কিংবা ৬৮ বার পুরোপুরি নত (down) হয়ে যাকে হাদিসে সিজদায় পড়া এবং অস্ত যাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে গ্যালাক্টিক প্ল্যানের নিচে নেমেছে এবং একবার করে উপরে(up) উঠেছে যাকে উদয় হওয়া এবং সিজদা থেকে উঠার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

হাদিসে যেটাকে উল্লেখ করা হয়েছে –

"তিনি বললেন, এটা যায় (ভ্রমণ করে অর্থাৎ যেতে যেতে) আরশের নিচে পৌঁছে সিজদা করে (অর্থাৎ নিজেকে নিচু করে দেয়) এবং পুনরায় উদিত হওয়ার (অর্থাৎ উঠবার জন্য) অনুমতি চায় এবং তাকে অনুমতি দেয়া হয়।"

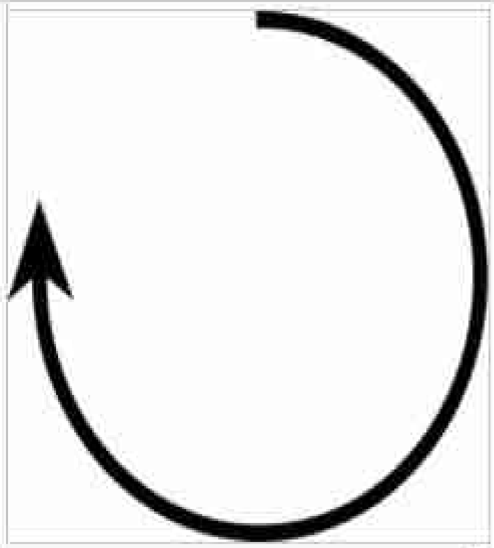
অনুমতি ব্যাপারটা কি – এটা হচ্ছে , সমগ্র সৃষ্টি জগতই হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণাধীন।আল্লাহ্‌র ইচ্ছে ছাড়া গাছের একটা পাতাও নড়ে না।সেরকম সূর্যও প্রতিবার গ্যালাক্টিক প্ল্যানের উপরে উঠতে এবং নিচে নামতেও অনুমতির প্রয়োজন হয়।কারণ , স্রস্টার ইচ্ছের বাইরে কিছুই হয় না – স্রস্টার ইচ্ছে অর্থাৎ অনুমতি আছে দেখেই – সূর্য তার পথে একবার উঠছে আর একবার নামছে।যেদিন ইচ্ছে করবে না – সেদিন অনুমতিও দেয়া হবে না।এই হচ্ছে অনুমতির ব্যাপার।

এরপরে আসে আরেকটা প্রশ্ন – হাদিসে রয়েছে –

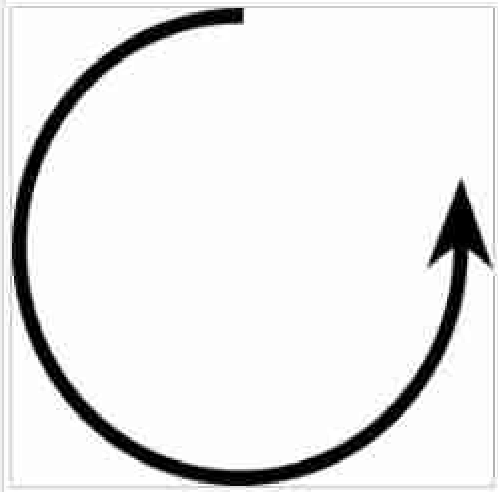
এবং অচিরেই (এমন এক সময় আসবে) যখন সে প্রায় সেজদা নত হবে কিন্তু তা গৃহীত হবে না এবংনিজস্ব পথে যাত্রা করার অনুমতি চাইবে; কিন্তু আর অনুমতি মিলবে না, (বরং) তাকে নির্দেশ দেয়া হবে, সেই পথেই ফিরে যেতে - যে পথে সে এসেছে। এবং তখন সে পশ্চিম দিকে উদিত হবে।

সেই সময়টা হচ্ছে মহাপ্রলয়ের সময়।একদিন আল্লাহর ইচ্ছে হবে – সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস করে দেওয়ার।এক্ষেত্রে – ধ্বংস করে দিতে হলে – আমাদের সৌরমণ্ডল যদি আগের মতই তার স্বাভাবিক পথে চলে – তাহলে ধ্বংস হবে কিভাবে।সেদিন – পুরো সৌর মণ্ডলের সব নিয়ম কানুন ভেঙ্গে পড়বে।সূর্য যে গ্যালাক্টিক নর্থ পোল থেকে দেখা ক্লকওয়াইজ[24] (ঘড়ির কাঁটার দিকে) পথে ছায়াপথকে কেন্দ্র করে ঘুরে – সেটা উল্টো হয়ে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইস (ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে) - হবে , তখন স্বভাবতই যা যা নিয়ম চলছে সেটা উলটো হয়ে যাবে।এখানে যেহেতু , উপরের অংশে আমাদের দেখা সূর্যাস্ত কিংবা সূর্যোদয় – নয় , সেই হিসেবে – এই পশ্চিম দিকে উদয় হওয়াও আমাদের দেখা সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্ত হবে না।এক্ষেত্রে কি হবে , সেটা মহান আল্লাহই জানেন।কারণ , মহাপ্রলয়ের সময় সব মহাজাগতিক নিয়ম কানুন একে একে ভেঙ্গে দেওয়া হবে।সূর্যের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটবে।

[24] http://en.wikipedia.org/wiki/Sun



The clockwise direction



The anticlockwise or counterclockwise direction

এজন্যেই এই কথা বলা হয়েছে – পূর্বে যেহেতু উদয়ের আর অস্তের কথা বলতে সাধারণ উদয় অস্তের কথা বলা হয়নি– সেহেতু এখানেও সেটা বলার চেষ্টা করা হয়নি – এখানে বলা হয়েছে – নিয়ম কানুন গুলো উল্টে যাবে। অর্থাৎ , সূর্যের গতিপথ বদলে উল্টো পথে যাবে।আর মহাপ্রলয়ের দিন কি হবে– সেটা বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব না – কারণ বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে – যেইসব নিয়ম কানুনের উপরে , সেই নিয়ম কানুনই যদি উল্টে দেয়া হয়– তাহলে সেখানে বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত দিতে অপারগ।

সহজ প্রশ্ন কেন এতো সিম্পল ভাষায় কথাগুলো বলা হল -

রাদারফোর্ডের সেই মহান উক্তি –

- An alleged scientific discovery has no merit unless it can be explained to a barmaid.
- যদি কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা তত্ত্ব পানশালার একজন পরিচারিকাকেও বুঝানো না যায়– তাহলে সেটার কোন মূল্যই নেই।[25]

এই খ্যাতনামা বিজ্ঞানী থেকে শুরু করে সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীরাই জটিল বিষয়বস্তুকে পরিষ্কার করতে খুব সহজ সহজ উপমা দিতেন। সেই সময়টা ছিল – ১৫০০ সাল পূর্বে।আরবে হাতে গোণা মাত্র ১৭/১৮ জন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন।আবু যর নিজেও একজন খুব শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন না – তাকে এই কথাটা সহজ ভাবে বুঝানোর জন্যে – রসূল সা: এই সূর্যোদয় – সূর্যাস্ত এবং সেজদা দেয়া এবং সেজদা থেকে উঠা উপমার ব্যবহার করেছেন।

এবং সাথে সাথে আরশের কথা বলে – এটাও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে – আমি এখানে উপমা অর্থে ব্যবহার করছি – কারণ , সবাই ঠিকই বুঝবে – সূর্য অস্ত অর্থাৎ নিম্নগামী হওয়ার সময় – যদি বলা হয় – এটা পোঁছে যাচ্ছে – পৃথিবী থেকে অনেক অনেক উপরে – সেটা স্বভাবতই আমাদের দেখা সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্তকে বোঝাবে না।আরশ কি সবাই এটা জানে– কিন্তু , জনৈক মুক্তমনারা হাদিস এর "হ" ও না পড়ায় – তারা জানেইনা আরশ কি ? তাই , তাদের এতো বিভ্রান্তি-। আশা করি– এখন ব্যাপারটা বুঝার কথা।

আর সূর্যাস্তের সময় হাদিসটা ব্যাখ্যা করবার অর্থ – হচ্ছে সেই সময়টাই একমাত্র সময় যখন আমাদের মনে প্রশ্নের উদয় হয় – আসলে সূর্যের গতিপথটা কিরকম।আবু যরেরও প্রশ্নের উদয় হওয়ায়– সে নবীকে এই সম্পর্ক অর্থাৎ সূর্যের গতিপথ সম্পর্কে একটা কুরআনের আয়াত এর ব্যাখ্যা জানতে চায় – (যেটা বেমালুম চেপে গিয়েছে নাস্তিকরা!) - তখন মুহাম্মদ সা: সহজ ভাষায় এই আয়াতের ব্যাখ্যা করলেন। যেটা নিয়ে উপরে বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করা হল।

এক্ষেত্রে সূর্যাস্ত শুধুই প্রশ্ন উদয়ের মাধ্যম – যেমন হয়েছিলো – নিউটনের আপেল[26] পড়া দেখে।নিউটন এর আপেল পড়া দেখেই – তাঁর মাথায় প্রশ্নের উদয় হয় – কেন পড়লো । সেই ধারাবাহিকতায় আবিষ্কার করেন – যুগান্তকারী মাধ্যাকর্ষণ বল। অথচ , সামান্য আপেল ছিলও তাঁর প্রশ্ন উদয়ের মাধ্যম।তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন– যেহেতু আপেলটি উপরে গিয়ে নিচে পড়েছে – সেহেতু এখানে কোন একটা বল রয়েছে।যেটা পরে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিরূপে বর্ণনা করা হয়।এখন , আপনি বারেবারে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সাথে কি আপেল কে মিলিয়ে ফেলেন – যদি না মিলিয়ে ফেলেন , তাহলে আবু যর এর এই সূর্যাস্ত দেখে প্রশ্ন উদয় হওয়াকে –সূর্যাস্ত কিংবা সূর্যোদয়ের সাথে কিভাবে মিলিয়ে ফেলেন?

সহজ বর্ণনার সাথে , বিজ্ঞানী থেকে শুরু করে সকলেই পরিচিত –

Albert Einstein — 'Put your hand on a hot stove for a minute, and it seems like an hour. Sit with a *pretty* girl for an hour, and it seems like a minute. .[27]

---

[25] http://en.wikiquote.org/wiki/Ernest_Rutherford
[26] মাথায় আপেল পড়া নয় যতদূর জানা যায় – তিনি জানালায় বসে থাকার সময় এটি দেখেছিলেন।
[27] http://www.goodreads.com/quotes/370132-put-your-hand-on-a-hot-stove-for-a-minute

"তিনি থিওরি অফ রিলেটিভিটি বুঝাতে গিয়ে– সাধারণদের বলতেন – এটা হচ্ছে ধরো যেমন তোমার হাত গরম চুলার উপরে এক মিনিট রাখো , মনে হবে এক ঘণ্টা সময় পেরিয়ে গেছে । আবার একটা সুন্দরি মেয়ের পাশে একঘণ্টা সময় কাটালেও মনে হবে মাত্র এক মিনিট পার হয়েছে"

দেখুন সিমপ্লিফিকেশনের কি ভয়াবহ রূপ– এতো জটিল একটা বিষয়কে গ্রহের সেরা বিজ্ঞানী একটা নন্সেস উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন – অথচ কিছুই হয় নি।

ভাগ্যিস , আমাদের রসূল সা: এই ধরনের অতি সহজ সিমপ্লিফাইড কোন উদাহরণ ইউজ করেননি।তিনি খুব সহজ একটা উদাহরণ , ব্যবহার করলেন । যা এখন সহজেই আমাদের মত– সাধারণ মানুষও বুঝে গেলাম।সূর্যাস্ত এবং সূর্যাস্ত যে এখানে শুধুই উপমা।হাদিস হচ্ছে – কুরআনের সহজ সরল ব্যাখ্যা।

এখানেও বাস্তবিক তেমনটাই ঘটেছে।

দিনের আলোর মত এখানে পরিষ্কার যে এখানে সাধারণ সূর্যোদয় কিংবা , সূর্যাস্তের কথা মোটেই বলা হয় নি।বরং এখানে বলা হয়েছে – সেই মহাসত্যের কথা যা আল-কুরআন বর্ণনা করেছে।

যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে। (১৭:৩৬)

যে বিষয়ে আপনার কিংবা আমার জ্ঞান নেই– সেটা বিশ্বাস করে কখনই ভুল পথে পরিচালিত হতে কুরআন মানা করছে।কুরআন সর্বাত্মক ভাবে পড়াশোনাকে উৎসাহিত করেছে।যারা এই হাদিস কে ভুল ভুল বলে শোরগোল করতেন– আমার ধারণা , তাদের অনেকেই জানতেন না - গ্যালাক্টিক প্ল্যান , সোলার এপেক্স , সূর্যের উপর , নিচ হয়ে চলা গতিপথ–- যাকে খুব সহজেই সিজদার সাথে তুলনা করা যায়।এ সবই জেনে কিংবা না জেনে– নিজ মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে এতদিন হাদিসটি ব্যাখ্যা করেছেন – আশা করি এখন ক্লিয়ার।

আসুন , সত্যের পথে।

কুরআনেই এ সম্পর্কে বলা হয়েছে -

এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনা-বলী প্রদর্শন করাব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ কোরআন সত্য। আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্য-দাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়?

(সূরা ফুসিলাত- ৫৩)

আমাদের নিদর্শনগুলি দেখেই বুঝতে হবে– কুরআন সত্য নাকি মিথ্যা।আর নিদর্শনগুলি বের করার জন্যে কুরআনে রয়েছে – বলেছে

নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদের্শনাবলী রয়েছে। (সূরা আল হিজর – ৭৫)

কুরআন বলে দিয়েছে

এটা চিন্তাশীলদের জন্যে চিন্তার উপকরণ রয়েছে– আপনি আয়াত , হাদিস দেখেই জলবৎ তরলং অর্থ বের করতে পারেন না। এর জন্যে আপনাকে চিন্তা করতে হবে , গবেষণা করতে হবে।

আমাদের কিছুই রেডিমেড বলে দেয়া হয় নি– কুরআনে ...

আমরা গবেষণা করেই এগুলো বের করতে পারি–

পয়েন্ট পয়েন্ট খেলাঃ

পয়েন্ট ১ – একশো বছর আগেও আমরা জানতাম– সূর্য স্থির – কিন্তু কুরআন বলছে , সূর্য স্থির নয়– এটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

পয়েন্ট ২ – আপনি কি কোন দিন – উইকিতে একবারও সূর্য নিয়ে সার্চ দিয়েছিলেন?একবারও কি নিজের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে নিয়ে– হাদিসটা সম্পর্কে আল্টিমেট সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?

পয়েন্ট ৩ – আপনি কি জানতেন - "In addition the Sun oscillates up and down relative to the galactic plane[28] approximately 2.7 times per orbit." **- এই কথাটা– যেটা সারা উইকিতে বারেবারে আছে?**

পয়েন্ট ৪ – আপনি কি জানতেন– সূর্যের এই উঁচু , নিচু হওয়া ? (মিথ্যা উত্তর দিবেন না– দিলে নিজের সাথে নিজেই প্রতারনা করবেন!)

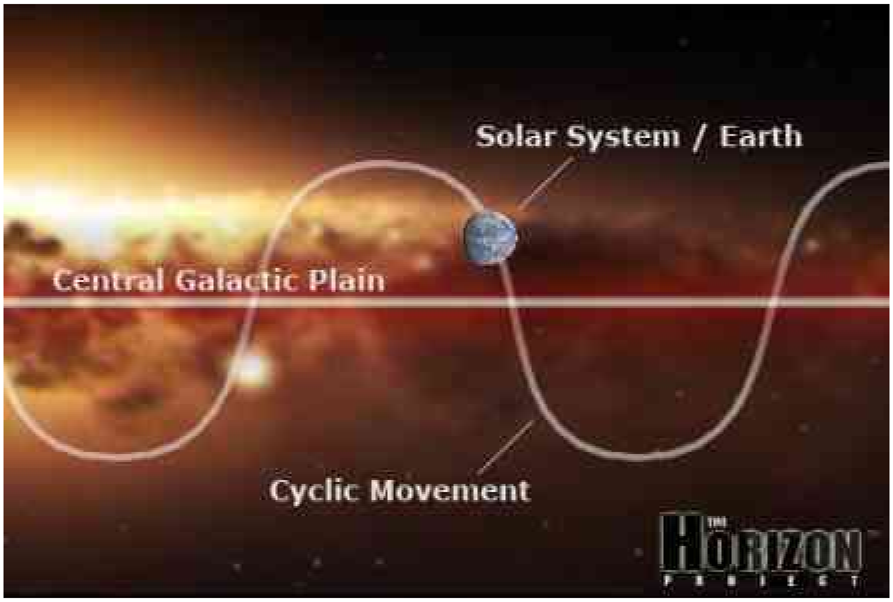
পয়েন্ট ৫ – সব কিছু ভুলে যান– ধরুন , ১৫০০ সালে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন , মুহাম্মদ সাঃ এর অবস্থানে আর একজন অজ্ঞ লোককে আপনি বলতে চাইছেন– সূর্যের এই উঁচু , নিচু গতিপথ নিয়ে (যা আপনি জানতেন)– আপনি কিভাবে ওই লোকটির কাছে ব্যাখ্যা করবেন (যেখানে শব্দভাণ্ডার এতো কম) ?

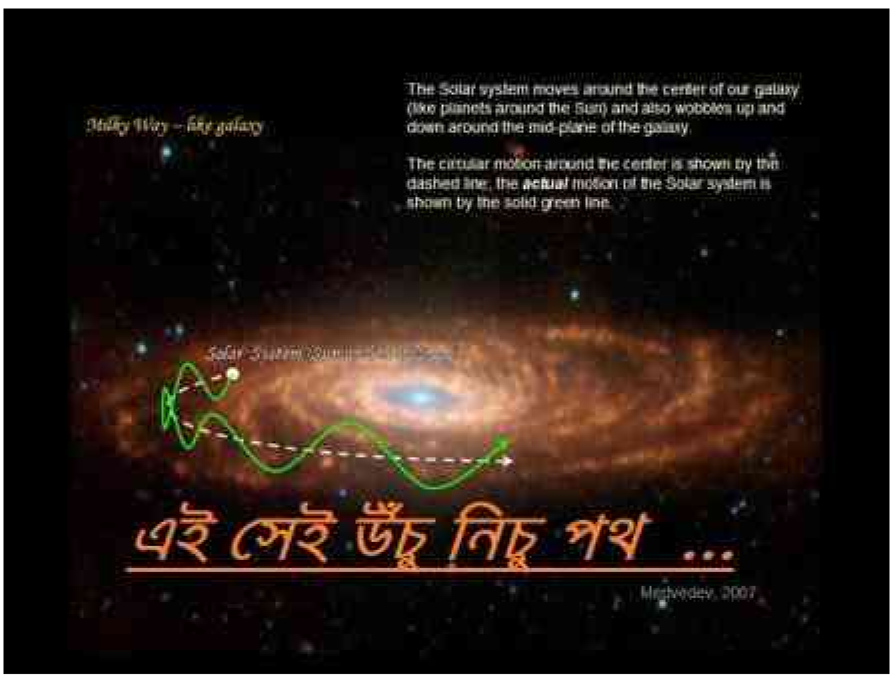
---

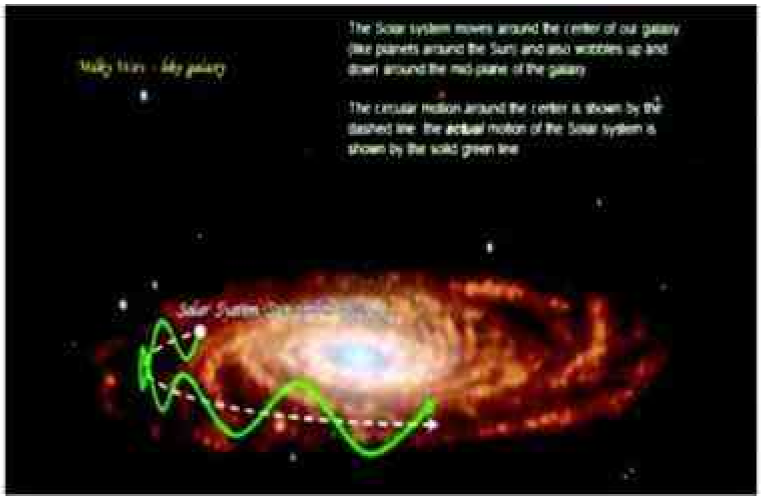
[28] *en.wikipedia.org/wiki/Galactic_plane*

পয়েন্ট ৬ – আপনি সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের কথা দিয়ে বুঝানোর আগে বলে নিতেন , আমি যেই সূর্যোদয় কিংবা যেই সূর্যাস্তের কথা বলবো– সেটা আমাদের দেখা এই সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্ত নয়- এটা বলে দিতেন না? (১ নং পয়েন্টে দেখুন সেটাই বলে দেয়া হয়েছে !)

পয়েন্ট ৭ – ধরুন – ১৫০০ বছর আগে আপনি এই ছবিটা ব্যাখ্যা করছেন- কিভাবে করবেন ?







পয়েন্ট ৮ – উপরের ছবিগুলোকে কি এই ব্যাখ্যার সাথে মিলানো যায় না- খুব সহজেই মিলানো যায়– আপনি কেন মানছেন না – তাহলে কি এটাকে গোঁয়ার্তুমি বলা চলে?

পয়েন্ট ৯ – ১৫০০ বছরের আগেকার সেই সময়ে এর চেয়ে কি আর কোন সহজ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব– উত্তর আলটিমেটলি না!

পয়েন্ট ১০ – প্রথমের উদয় অস্ত যদি সাধারন , উদয় অস্ত না হয় , তাহলে শেষের পশ্চিম দিকে উদয় কিভাবে সাধারন উদয় হয়!

পয়েন্ট ১১ – এতো কিছুর পরও কেন ঈমান আনবেন না ? এটা কি একটা মিরাকল নয় ?

(বি দ্রঃ কাজাকিস্তানে জন্ম নেয়া ইমাম বুখারী রা: এর বুখারী হাদিস সঙ্কলন মুহাম্মদ সা: এর মৃত্যুর প্রায় ২০০ বছর পর সঙ্কলিত হয়েছিলো। এতো সময় পর যখন হাদিস সঙ্কলন হয়েছিলো – তখন কোন লেখ্য রূপ ছিলও না।একে অপরে মুখে করে শতবছর পেরিয়েছিলও।সে হিসেবে – কিছু সূক্ষ্ম অর্থ পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে – এটাই স্বাভাবিক। কারণ , আল্লাহ , কুরআন অবিকৃত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন – হাদিস নয়।সেক্ষেত্রে সহীহ হাদিসের সাথে অনেক জাল হাদিসও ঢুকে গেছে।আমাদের বাছাই করে নিতে হবে।বিজ্ঞানের কথাগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কথার উপর নির্ভরশীল দেখে– হাদিসের শব্দ পরিবর্তন হয়ে গেলে ব্যাখ্যা করা কঠিন।শত বছর ধরে মুখে মুখে চলায় সূক্ষ্ম পরিবর্তন হওয়াই স্বাভাবিক।এছাড়া– শরীয়তের চারটা উৎস হচ্ছে – কুরআন , হাদিস , ইজমা ও কিয়াস। এদের গুরুত্ব ক্রমিকা অনুসারে।যেসকল হাদিস (নিশ্চিতভাবেই বিকৃত) – কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক - সেগুলো বাতিল – কারণ , হাদিসের চেয়ে কুরআনের অগ্রাধিকার বেশী।তবে এক্ষেত্রে , এই হাদিসটি আমার জানামতে – সহিহ । কুরআনের সাথেও এর কোন সংঘর্ষ দেখা যায় না।তবে - কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক হাদিসগুলিকে (বিকৃত) আমাদের পরিহার করে চলা উচিত।)

_______________ সমাপ্ত ___________________

শেষ

এরপরেও কিছু কথা থাকে –

কেউ কেউ মনে করতে পারেন – সূরা ইয়াসিন এর ৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে – সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরে।পুরো কুরআনে সেই কথার সামান্যতম ইঙ্গিতও নেই – যেখানে বলা হচ্ছে – সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরে।উল্টো বলা হয়েছে – পৃথিবী নিজেই ঘূর্ণায়মান।

যাতে এ নিয়ে কোন বিভ্রান্তি না হয় সেজন্যে – এই আয়াতের পরের আয়াতেই অর্থাৎ সূরা ইয়াসীন এর ৪০ নং আয়াতে - আল্লাহ বলে দিয়েছেন – যে পৃথিবী নিজেই সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান।এখানে স্বল্পায়তনে উল্লেখ করছি না–

এটি নিয়ে বিস্তারিত লিখা রয়েছে – এখানে – প্রথম অধ্যায়ে ফিরে যান।

(এই সেই আয়াত - সূরা ইয়াসীনের ৪০ নং আয়াত যা উপরিক্ত সূর্যের গতিপথের আয়াতের ১ আয়াত পড়েই উল্লেখিত -

সূর্যের নিজের সাধ্য নেই চন্দ্রকে ধরারআর রাতেরও নেই দিনকে অতিক্রম করার। আর সবকটিই কক্ষপথে ভাসছে। (৩৬:৪০) – সূরা ইয়াসীনের ৪০ নং আয়াত যা উপরিক্ত আয়াতের ১ আয়াত পড়েই উল্লেখিত -

সূর্য চন্দ্র ঘূর্ণায়মান বলার পাশাপাশি রাত্রি এবং দিন কক্ষপথে বিচরণ করার কথা বলেই এখানে পৃথিবীর ঘূর্ণায়মানতার কথা বলা হয়েছে।)

ভালো করে বুঝতে প্রথম অধ্যায় আবার পড়ুন।

এখন <u>আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করাব</u> পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ কোরআন সত্য। আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়? (সূরা-ফুসিলাত- ৫৩)

যেকোন ভুল ভ্রান্তি থাকলে আল্লাহ্‌ ক্ষমা কর..Allah knows the very best.

কোন ভুল ত্রুটি থাকলে – জানাতে ভুলবেন না – পরবর্তী সংস্করণে ঠিক করে দেয়া হবে।আপনার পরামর্শ পাঠাতে পারেন– ফেইসবুকে কিংবা ইমেইলে।

লেখকঃএকজন অতি সাধারণ অপ্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ছাত্র এফ জেড করিম।

ইমেইলঃ fzkarimbd@gmail.com

ব্লগ: www.facebook.com/fzkarimbd

ব্লগ – www.shodalap.com/fz-karim

২০১৩ , অক্টোবর – ৩১

সমাপ্ত